

(শ্রীঅরবিন্দ যশ্দির)

(বহিঃক।)

(১১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪২)

৭৫৬.৩

১০০২/২৫



শ্রীঅরবিন্দ পাঠশালার

১৫, বহিঃ চাটাজি ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

১। চিত্তাবলি ও হস্তাবলি	শ্রীঅরবিন্দ	১
২। মহামানবের সাধারণত্বের	সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
৩। শ্রীমা পদ্ম	ডাঃ কে. আর. শ্রীনিবাস আর্যভট্ট	১১
৪। বাসবদত্তা	শ্রীঅরবিন্দ	২০
৫। ঐশ্বর্যবীৰ উপনিষদ	শ্রীঅনিলীকান্ত সেন	৩২
৬। বাসবের সৎ কথঃ	শ্রীমা	৪৩

বক্তিকার নিয়মাবলি.

২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯শে এপ্রিল, ১৮শে আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। দৈনিক টীকা ও টোকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক চেষ্টা যায়। টীকা ও চিহ্নিত সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা-লংখার ঠিকানায়ে প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের টীকা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট,
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পাণ্ডিত্য

মূল্য—১২ টাকা

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট, কলিকাতা—১২

ব্রতক—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পল্লভারী



২১শে ফেব্রুয়ারী

১৯৬১

অতিমানস ও মানুষী চেতনার মধ্যে যখন সংযোগ স্থাপন হয়েছে তখন চৈতাস্যতাই স্বর্কোপেক্ষ। তৎপর হয়ে তাতে সাড়া দেয়—মনের প্রাণের বা দেহের চেয়ে বৈশী তৎপর সে। অধিকন্তু তার সাড়া শুদ্ধতর—মন প্রাণ ও দেহ যে ভাবে অতিমানস প্রভাব গ্রহণ করে তার মধ্যে অন্ত তিনিস সব তার। মিশিয়ে দিতে পারে, তার সত্যকে বিকৃত করে দিতে পারে। চৈতাস্যতার সাড়া বিকৃত, এ রকম কোন মিজল সে হতে দেয় না।

অতিমানস রূপান্তর ঘটতে পারে তখনই যখন চৈতাস্যতাকে অবতারা অতিমানসলজ্জির প্রদান আলব্বন করে ধরা হয়েছে

ঐশ্বরবিশ্ব

চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি

পূর্বসূচক

ঐশ্বর্যবিশ্ব

কর্ম

সব শেষ নয়, যখন মানুষ-শ্রীতে ব্রহ্ম চরেচে বিকল ও ব্যর্থ । সব শেষ তখনই যখন
মাতাপুত্র্য তার চোখা নিদর্শন দিয়েচে ।

*

যে চায় উদ্ধার অথবা পলায় সব অধিকার করতে, তাকে অকৃত্রিম পরীক্ষা-নিরীক্ষা
পার হয়ে যেতে পারে । কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষ চার পরীক্ষাকে উৎকোচ দিয়ে চলে যেতে ।

*

যতক্ষণ হোমান চাত খোলা, ততক্ষণ চাত চাষিরে বৃদ্ধ করে যাও, হোমান কর্মে,
হোমান মস্তিষ্ক, বহু রকম যন্ত্র হোমান আত্ম সব আশ্রয় করে । তুমি হোমান গঠন অঙ্কন
শুধনিত ? হোমান কর্মে চোপে রক্ত কমা হয়েছে ? বৃদ্ধ কব তবে হোমান সর্বব্যাপী অস্ত্রাচার
আশ্রয়ে, হোমান সর্বাঙ্গী সঙ্কটপন্থির আশ্রয়ে আর যখন হোমান বৃত্তা চলে, তখনও
বৃদ্ধ করে চল তখনও থেকে হোমান নবো মনে এসেছিল যে সর্বব্যাপী পক্ষি তার আশ্রয়ে ।

*

উদার গমনে বা পর্বতশিখরে যে উপবী, তুমি মনে কর সে চল চতুর্দিক বা সিক্ত
কেউ ? কিন্তু তুমি কি জান ? সে হবত তার ইচ্ছাপন্থির প্রচণ্ড প্রবাহ দিয়ে ভগ্ন তবে
চলেছে কিবা তার অস্ত্রাচার পক্ষিপুত্রগণ তাকে পরিবর্তিত করেছে ।

*

বৃদ্ধপুত্র্য পর্বতশিখরে বসে অতর্কিতে বা বেধেন, বীর কর্মীরা, প্রচারকেরা আবি-
র্ভূত হয়ে স্থল ভগ্নে তাকে ঘোষণা করে, সম্পাদন করে ।

*

বিগসফিট সম্প্রদায়ের ভুল চল বাহ্যপ্রকরণে, বুল ভবে মর । কর্মী-বিপ্লব যদি ঘটে
যাবে, তবে তার কারণ চল ভাবে হিবানীর নবো বসে স্বীকৃতি এক যশু দেখেছিল
তখনকে সানাই-স্রোতস্রোতস্রোত ।

*

*

পাশ্চাত্য নীরবত্বান ভিত্তি পেকেই তৈরী হয়ে দেখা দেয় সব বাস্তব ও সব ক্রিয়া।

*

সত্যসাগরের গভীরে নাই কোন চাকলা, কিন্তু উপরে রয়েছে তার গর্ভনের উন্নতি বহুত্বনি, তার অভিন্নে তার উগ্রগতি। মুক্ত অস্তরও এই তান প্রচণ্ড কর্তাবির মধ্যে। অস্তরাত্ম্য কর্তৃ করে না, শুধু অস্তর থেকে আপন নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাড়িয়ে চড়িয়ে দেয় কর্তের প্রাণন।

*

ভগবানের সৈনিক তুমি, বীরকন্যা তুমি, তোমার আশার মুখ কি? লজ্জা কি, বেদনা কি? তোমার জীবন হল এক নটিনা, তোমার কর্তৃ হল নৈবেদ্য, নিরুৎসাহ হল দিব্যানিচ্ছা, পবিত্র হল পরম জয়।

*

তোমার অশ্রুতন অস্ত্র এখনো পাপের ও ধূঃপের আঘাত অশ্রুতন করে? কিন্তু উজ্জ্বল তাম্বের গোচরে বা অগোচরে, তোমার অস্ত্রপুরুষ আদীন রাতনহিনার, দিব্য, মুক্ত, সর্বজয়ী। বিশ্বাস রেখো অস্ত্রনে বিশ্বজননী তাঁর ক্ষাণ্ড পূর্ণ করে যাবেন, তোমার সত্যের পাপির অস্ত্রটিও করে তুলবেন মুক্ত অস্ত্র ও উচ্চ।

*

অস্ত্রের যদি তোমার জয় থাকে বিকৃত, যদি শীর্ণ কালক্রম করে তোমার কিছু উন্নতি না হয়ে থাকে, যদি তোমার সানন্দা কীর্ণ হয়ে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে, তবে সর্বদা স্নেহে রাখবে আনন্দের বরত আনন্দের প্রভু পাশ্চাত্যগণ। "আমি তোমাকে সর্বা পাপ হতে মুক্ত করব, শোক করবে না।

*

ওহুতা রয়েছে তোমার অস্ত্রস্বায়—কর্তৃ কোথায় উচ্চি বা অচ্চি?

*

হে মৃত্যু, চরুবেশী বহু তুমি আনন্দের, তবোপের শ্রুতি—যখন তুমি কন্যা খুলে ধরবে, ইতস্তত করবে না আনন্দের সংবাদ দিতে পুষ্পাঙ্গেই—কারণ আবহা ত তার লৌহজনংকারে ভীত হবার লোক নই।

*

মৃত্যু কখন কখন হয়ে ওঠে বেন বেতরিত চাকর; কিন্তু যখন সে এই পাপির বসন পরিভাগ করে গ্রহণ করে উজ্জ্বলতার ভূষণ, তখন তার সকল শ্রেণ-বেলা ও বেয়াদবি কর্তৃ।

*

কে তোমাকে নিচত করবে, অপর আত্মা ? কে তোমায় নিপুণীত করলে, ও সন্দান
উপধান ?

*

এ কথা স্মরণ কোরো বর্ষণ তোমার বহিষ্কৃত অবশ্য ও দুর্বলতার সত্তে বিভ্রান্তি করতে
অগ্রসর হয়, “আমি ত্যাগেব, আমি ক্রম, আমি নিভ্র, আমি অগ্নি, চিরন্তন অপরাহেব, আমি
‘মূর্খা’ গিতা প্রচ্ছন্নত”।

*

তোমার যন্ত্রের যে চিরবোঝনের অতীত্পা ও উদ্ভাস, কখন তা থেকে সংকোচে সরে
বাঁড়বে না, কিন্তু দেখো সে সব তরঙ্গের উপর ত্বণের মত ভেসে যেও না।

*

বিশ্বমেবত্যাকে তোমায় অস্তরের বহন করে চলেতে হবে, তামের প্রচণ্ড অবতরণে পা
চিনে না কিম্বা তামের গুরুত্বের ভেঙ্গে পড়বে না।

*

সামর্থ্য ও তানন্দে নান্ব ক্রান্ত, তাই বৃঃ ও দুর্বলতাকে পূর্ণা নাম দিয়েছে, জানে
স্বাস্ত তাই অতানকে সাবুতা অধ্যা দিয়েছে ; প্রুনে স্বাস্ত, নির্দমত্যকে বলতে প্রুজার চ্যোতি।

*

সহাগুণ অনেক বকনের আছে। আমি এক ভর্যাতকে তার পীড়কের কাছে গান
পেতে চিত্ত দেখেছি। আমি দেখেছি দুর্বল সেত পেয়ে এক বনীতান আত্মত্বরী স্বয়ংস্ব
তাকে যেবে চলেতে আর নেচারী শাস্তভাবে একান্তভাবে তাকিরে হয়েছে তার আক্রমণকারীর
দিকে ; আর আমি দেখেছি তেদী ভগবান সপ্তেবে বর্ষণ করছেন সিনতহাসা, যাত্রা তাকে
সিলাবর্ষণে চর্চরিত করতে তামের উপর। প্রুপনটি হাস্যকর, বিতীয়াটি গোচনীয, তুতীয়াটি
দিন্য অদলান, পূণ্যকৃতি।

*

তোমাকে যে আঘাত করে, তাকে কমা কমা তোমার মহর, কিন্তু মহং নয় অমোঘ উপর
আঘাত কমা কমা। তবুও কমা কমাবে এসে, কিন্তু প্রয়োজন হলে প্রতিবিধান করবে
এ ক্ষেত্রেও।

*

এশিয়াবাসীরা বনন লোকহত্যা করে, তা হয় পরবদকৃতি, আর ইউরোপীয়েরা বনন
সে কাছ করে তখন তামর দানরিক দাবী। পার্থক্যটি অনুধাবন কর, ধ্যান নাও ভাগতিক
বর্ধনীতির উপর।

*

যাত্রা তামের শর্যভাবে বশে জোবে সনে ওঠে, তামের নভবে রেখো। সহরই

সেখানে যে সোমকে তারা তীব্রভাবে তিব্ধত করিতে দিক সেই সোমই নিচেরা করে, বা সেখেনও সেখেন না।

*

"মানুষের মধ্যে সত্যকার ভণ্ডা খুব কমই"। দিক বটে, কিন্তু কুটনীতি এবং আত্ম-প্রবক্তা সেখানে অনেকখানি—সেখানেই আছে তিনরকম প্রকারভেদ, প্রথম চল সচেতন, দ্বিতীয়টি অবচেতন আর তৃতীয়টি অর্ধচেতন, এই তৃতীয়টি সবচেয়ে বিপজ্জনক।

*

মানুষের বাচ্য ধর্মভাব দেখে প্রবলিত হযোগ না, কিংবা তাদের প্রকট বা প্রচ্ছন্ন পাশ কণ্ঠ দেখে ক্রুদ্ধ হইতে উঠে না। এ সবই হল মানুষের রূপান্তর-সাধনার পথে প্রয়োজনীয় আবর্তন- পরিবর্তন।

*

ভণ্ডের কুটিলতা দেখে মূখ ফিরিয়ে চলে যেও না। ভণ্ডা হল যেন বিমুক্ত, তবে আত্ম, মাপ একেবেকে চলিতে সে তার যে নিয়তি একটা খোলস পরিবর্তন ও পরমোৎকর্ষ সেই দিকে। সে অপেক্ষা করে, এ হল একটা ব্যক্তি-ধেনা, এই চেয়ত্না থেকে ভগবান উদ্ভবন হয়ে দিগ্বী হয়ে উঠে আসবেন।

*

মুখোমুখি দেখে পাচাংপাং হও কেন? এইসব ধৃণা বিকৃত বীতংগ বাচ্য প্রতিভাস সকলের পিছনে পাড়িয়ে গাঙ্গড়েন গ্রীকক, তোমার মূহ জোম দেখে, তোমার মূহতর ধৃণা বা আচ্ছিন্না দেখে, তোমার মূহতন উত্তি দেখে।

*

যখন তুমি লক্ষ্য করছ আর একজনের উপর হয়েতে তোমার ধৃণা, তখন তাতলে নিজের অস্থানে পুষ্টিপাত কর, মার দেখে তোমার হাস্যকর মূহতা।

*

ধৃণা দ্বিতর্ক যোগ দেবে না, তবে মতের বিনিময় স্বচ্ছন্দে করতে পার। যদি বিতর্ক করতেই চাস, তবে বিপাকের কাছে থেকেও নিখতে চেষ্টা কর। কারণ, মূহের কাছে থেকেও তুমি অনেক জ্ঞান লাভ করতে পার—যদি তুমি শোন, বাচ্য-শ্রবণ কি তাতিক নন দিগে নয়, পবন যন্ত্রস্তার আলোকের সহারে।

*

সকল ভিনিষট্ বধুরূপে পরিণত কর, এই হল দিব্যজীবনের বিধান।*

* Thoughts and Aphorisms থেকে। অনুবাদক—ঐশ্বর্যবিশ্ব ৬৭

মহামানবের সাগরতীরে

(ঐশ্বরিক অঙ্গশব্দে)

সমঃ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪)

আমাদের দেশের ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস থেকে একটা তিনিস শব্দ চোখে পড়ে। সেটা হচ্ছে এই যে এর বহুসংকে কোনো গাঢ়পাথর নেই। বোম্বেতোলাবোর মাসিন তলায় তার কোনো দৈনিক প্রকাশ বুঝে না পাওয়া গেলেও ঐশ্বরিক তার নবুন আছে যদিও কালের। এত দিন ধরে যে তিনিসটা চলে এসেছে তার যে সবটাই খানাপ্রাণ এমন কথা বলা শক্ত। বড় হোঁচর এতদূর অবধি বলা যায় কোনো দিন হয়তো এর কোনো উপযোগিতা ছিল, এখন আর নেই।

কথানি একটু তলিয়ে দেখা যাক।

আত্মকালিকার মানুষ বলে আমরা চাই জানা। মানুষে মানুষে কোনো পক্ষম তফাত থাকবে এটা যেন তার কিছুতেই বরদাশ্র চয় না। তাই থেকে এসেছে ডেনক্রাসিস আধুনিক ইউরোপীয় সংস্করণ, সোশ্যালিজন কন্যামিহ্নের মূত্রপাত ওইখানেই। আত্মকালিকার মানুষ হোঁচর গলায় বলতে শিখেছে : রাজ্যরাজ্যের অবস্থা কেয়ার করি না, পোপ-টোপ ওদর কুসংস্কার, ভগবানই যা কে। ধরের বাইরে যেনম, ধরের ভেতরেও তেননি একটা ওলটপালটের ধুন। ছেলে বলে বাপনাকে মানবো না, ওরনশাইলের সাহস নেই বেত উচু করেন। "পতি পরম ওর" জাতীয় আদিবকালের মহাবাকা শোভা পায় ওধু বিবের চিরপীঠে। এ্যামেরিকার নতুন আবিষ্কার 'বিতনিক'দের কথা নাই তুলনুন।

তার মানেই কিন্তু এই নয় যে আমরা দত্তি দত্তি বাস করছি কোন্ এক সত্যাপথে। দত্তিকারের সমস্ত কোথায় ? ডেনক্রাসীর নামে রাজত্ব করছে এক বিবটি ব্রোক্রাসীর দল, ববি ঠাকুরের ভাষার বাদের নিবাস হচ্ছে অবলা পাড়ায়, সে পাড়ায় চুকতে গেলে নোটা রকব টিকিট লাগে। সেখানে প্রত্যেকটি বাড়ীর গায়ে মার্কানারা, গায়ে হ্রাপ সেমে বুঝে নিতে হবে কার কত দর। কে কোন্ পণ্ডিত্তিতে বসবে সে সব আগে থাকতে ঠিক করা আছে, সেখানে পান থেকে চুনটি বসলেই মহাবারী কাও, তখন পরা পেয়ালা এসে কান ধোরে তুলে সেবে কেউ যদি ওপরওনার দীটে বসে বা জোরে কথা কর। এসের ভাষা-বিচারের তুলনার আদ্যমের সাবেককালের হোঁচরু'রি কোথায় লাগে।

রাজার রাজ্য খেতে বসে, কিন্তু তার যাবতীয় এসে বসেছেন প্রাইম মিনিষ্টার, প্রেসিডেন্ট, ডিউটীভের পল। তাঁদের প্রতাপ যেমন দোর্দণ্ড, দীকতমক মানবাতিরও তার তুলনায় বড় কন নয়। তাঁরা থাকেন রাজপ্রাসাদে, মেদাং প্রাণের ভয় না থাকলে নিজেদের শেপাল এসোসেন চাড়া দেশবনধে বান না, তাঁদের গারে পাছে কোনো বকন যাচড় নাগে তার মনো পুনিগ বেচরাসের কি অগাতি। মুখে অবশ্য বোমো বেড়ান সভ্যসমিতিতে, যানরা ভোনাগেরই একজন, ভোনাগের দাসানুলাস। কেউ যদি বলে, তাহোলে সিংহাসনটা না হয় অন্য কাউকে দাও, তখন কি রাগ! তা কেনন করে হয়?

যার এক যাবতীয় আধুনিক যুগের মানা চরন হান অধিকার কোরেচে। সেটা ছোচেচ টাকা পরবার ব্যাপারে। মানুষ অবশ্য বচদিন থেকেই টাকা চিনেচে। এমন কি যারা ভারতবর্ষের নতন “কোপীনবহু; বলু ভাণ্যবহু;” ইত্যাদি বোলগল ঝাড়তে সভ্যতার তাদের মধ্যেও টাকার সাজসজ্জা পরাবনই বেশ একরকম চড়া ছিল। মনে আছে ঝেথলে দানস্তুতির চড়াছড়ি, ভূগাতে টাকা পয়সা চালিয়ে ফেললে কি দুঃখি, বাড়ীতে পর্যায় চুকতে পাবে না এমন ব্যবস্থা। উপনিষদের যুগেও টাকার মূল্য করে নি। জনকরাজ দ্বায়্যরটি গরুর শিঙ বেঁধে সিনেদ সোনা দিবে, রাজবল্লভ এক কথায় বলে বসলেদ শিবাবর্গকে, নিয়ে চল গরুভলোকে। অথুতবীর হুড়ীগাড়ী আর হবর্নকুস্তরা শশীকন্যা ত্রো ছিল তখনকার দিনের সাধারণ উপলোকন। যুদ্ধের যানলে তেখতে পাট টাকার কুনীর বড় বড় শ্রেণীরা পরলোকের প্রত্যাশায় সিদ্ধার্থকে প্রতিদিন বাড়ীতে ডেকে রাজভোগ খাওয়াচেচ, গুরুকে ধুণী করবার জন্যে গোটা আমবাগান বুড়ে লিচেচ সোনার বোদর দিবে। আর পরের যুগে ত্রো কথাই নেই। মূচ্চকটিকার পরিগ্র চাকুস্ত টাকার যা গুণগান কোরেচে পড়লে মনে হয় বুরি এটা আধুনিক যুগের আমেরিকান নানিক। যানাদের দেশে টাকাপরবার চড়াছড়ি বলেই ত্রো দাত সবুদন ত্রো নদী পার হয়ে মলে মলে এল এতরকমের বিশেষায় পল।

তবুও কিন্তু একটা তফাত আছে। সাবেককালের বড়লোকেরা সাধুগানী শিখেছিল কিন্তু তাই বলে মনুষ্য চালারনি। তেমন তেমন দরকার বুঝলে এক কথায় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে গেলরা পরবার সাজসজ্জা রাখতো। আধুনিক সমতার যুগে এটা আর হয় না। আলকাল সেখানে বড়লোকের রাজস সেখানে মায়াদায় হান নেই, আছে শুধু কাড়াকাড়ি, ডহতা বা হুবিচারের কেউ ধার ধারে না, চেলে শুধু স্বার্থ এবং মোভ। ক্যাপিটালিষ্ট সভ্যতার মূলমন্ত্র হোলো বেচ্ছাচার। “যত্নে বর্নিত্ততো জয়;” নয়, যে হর ভরী সেট যান্ত্রিক। বড় লোকেরা সেখানে সবচেয়ে সাধা, টাকা থাকলেই জাতে গড়া যার। গরীব মানে শূন্য। ভারতবর্ষের বর্নব্যবস্থা একটা অন্য ধরণের ছিল।

ভারতভাষ্যের গোড়ার কথা ছিল বিশেষ অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে পরন এক শাশুড়ী সমতার অনুশন্ধান, তা সে বহুপ্রকারে বাণেই হোক বা দার্শনিকের চিন্তাধারাতেই হুটে উঠুক। আমাদের সমাজব্যবস্থার পেছনেও ছিল এই এক কথা। মানুষে মানুষে যে অগাধ প্রভেদ

বর্তমান এ কথা আমাদের শাশ্বতকালীন মূল ভাল করেই জানতেন। তাঁরা এটাও বুঝেছিলেন যে আমরা সবাই এক অতএব সবাই সমান, কোনো বন্ধন দুইভেদ ব্রাহ্মণের শ্রবণ নেই, সবাইকে এক উঁচুতে ফেললেই মর্ত্যলোক স্বর্গলোক হোয়ে উঠবে পাঁচ দশ পনের বড়রের মধ্যে, এ কথা বুঝা। এ ধরণের অতি-আধুনিক পরিকল্পনা তাঁদের সাধারণ জ্ঞান পারানি। তাঁদের ধারণা ছিল একটু অন্য রকম। তাঁরা চেয়েছিলেন সবাইয়ের এমন একটা ব্যবস্থা যেখানে প্রত্যেক মানুষ নিজের নিজের “স্বভাব” এবং “স্বধর্ম” অনুযায়ী চলতে পারে, এমনভাবে জীবন যাপন করতে পারে যাতে তার সন্তোষের ভেতরের মানুষটা খুঁটে ওঠে, যেখানে সে অন্য সবাইয়ের সঙ্গে যথার্থই এক সেই সম্মান সম্মান পায়। সাবানের মানে সবাইকে পিটিয়ে এক করা নয়।

“স্বভাব” “স্বধর্ম” এগুলো কোনো মহাভারতের সাবানের কথা, গীতাকারের উক্তি। তারও বহুবর্ণ সাথে বৈদিক বহুভা। কবি দেখেছিলেন সবাইয়ের এক অপকল্প রূপ, বিরাট পুরুষের পরীক্ষাচ্যুত ছিল তার প্রতীক। ব্রাহ্মণ কত্রির বৈশ্য পুত্র সবাইকে তাঁরা দেখে-ছিলেন সেই বিরাটপুরুষের অঙ্গ হিসেবে। কে মাথা, কে পা এ নিয়ে পরের মধ্যে যদিও বা তর্কাতর্কি হোয়ে থাকে, সেদের স্বধর্ম কাছে এর মানে ছিল অন্য। পুত্র বৈশ্য না থাকলে সবাই অচল, তারা না থাকলে মানুষ থাকে কি? তাই তাদের স্বান পায়েন বিকে। কত্রির সবাইকে রক্ষা করে তার বাচল দিয়ে আর ব্রাহ্মণ তার বিশ্লামুক্তির দৌলতে, তাই তারা বিরাট পুরুষের বাহু এবং শীর্ষস্থানীয়। তখনকার স্বধর্ম যদি আধুনিক অভিধান ব্যবহার করতে জানতেন তাহলেই হয়তো বলতেন বর্ণগত সমাজব্যবস্থার মূলকথা হচ্ছে কাকাকর্ষের ভাগবতবা, ইংরিজি ইকনমিস্টের ভাষায় বাক বল ভিত্তিমান অঙ্গ দেবার। যে কোনো বড় কাক তার কোবে করতে গেলে নিজের নিজের স্বধর্ম ভাগ করে নিতে হয়। বৈদিক সবাইও তাই করা হয়েছিল। এতে যে দেশের বিশেষ কতি হয় তা মনে করা অন্যায়।

বেদ উপনিষদের পরবর্তী যুগে, মানুষের দৃষ্টিপন্থি স্বধর্ম স্বধর্ম হোয়ে আসছে, জ্ঞানীরা ভাবতে বিচলেন স্বধর্ম মায়াযো, তখন মূত্রপাত স্বধর্মের। বিরাটপুরুষের চবি একটু নান মোয়ে এসেছে, অখণ্ড কার্ধ্যভেদে স্বধর্মবিভাগ সবাইয়ে কায়েন রাখা দরকার। কি উপায়ে তা সম্ভব? তাঁরা বলতেন, স্বধর্মই হোচ্ছে সবাইয়ের স্বাধা। স্বধর্ম কি? না বা সবাইব্যবস্থাকে ধরে রাখতে পারে। কিন্তু তাই বলে সবাইয়ের স্বধর্ম এক নয়, হোতে পারে না, কারণ মানুষের স্বভাব বিভিন্ন। স্বভাব অনুযায়ী স্বধর্ম। অতএব ঠিক করা যাব্ কোন্ স্বধর্মের কি স্বভাব, কি তার নিজস্ব স্বধর্ম। এই থেকে উৎপত্তি ব্রাহ্মণ কত্রির ইত্যাদির নৈতিক বৈশিষ্ট্য, কে কি করবে তার লক্ষ্য লক্ষ্য স্বধর্ম, তার মনুনা পাই মহাভারতের পাঠ্য পাঠ্য। এখানেও যে একটা বড় স্বকণের ভুল ছিল তা তো মনে হয় না। সবাই স্বধর্ম-পালনে অভ্যস্ত ছিল ভদ্রবিন ডায়েরের বিশেষ কোম পুণ্ডিত হরমি। অবনতির মূত্রপাত সেদিন থেকে স্বধর্ম শাস্ত্র ছেপে বসলে স্বধর্মের ওপর, স্বভাবের স্বধর্ম স্বজাতি হয়ে উঠলো সবাইয়ের মন কথা।

বর্ষ কপাটীর প্রতিবন্দ্য ঠ:রিখীতে অনেক সময়ে যে ওয়া হয় "ডিউটি" অর্থাৎ নৌকিক বা সামরিক কৰ্ত্তব্য। সম্পূর্ণ সিঁড়ুল না হলেও নানেকটা বানিকট। ঠিক। যত্নত: বর্ষ-ব্যবহার ব্যাপারে যোগদয় ও নানেকটা চলতে পারে। কারণ আমাদের প্রাচীন সমাজ এবং আধুনিক চিন্তাধারার মধ্যে একটা বড় ব্রকনের প্রভেদ এইখানে। আত্মকালকার মানুষ চেনে নিজেস্ব স্বার্থকে বড় বেশী, তার চেটা নিজেস্ব "ন্যায়" পাওনা কড়ার গণ্ডার আদার করে নেওয়া। কেউ বলি সেখানে কোনরকম স্বার্থিক সেবার চেটা করে অমন খুন-খামাশি মেখে যায়, বুদ্ধ বাধে। প্রাচীন কালেও বুদ্ধ ছিল, আমাদের আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষও বাদ পড়েনি। কিন্তু, অতন্ত: বতদিন অবধি ভারত নিজেস্ব প্রাচীন সভ্যতা দরায়নি ততদিন পর্য্যন্ত বুদ্ধবিশ্বাসের পেছনেও থাকতো একটা বর্ষের হোঁচাচ। যুদ্ধের নিয়মকানুনে জে বটেই, যুদ্ধের উদ্দেশ্যেও থাকতো বর্ষরক্ষার প্রচেষ্টা। এর কারণ কি? কারণ এই যে স্বার্থ বতই না বড় হোক, কৰ্ত্তব্য ছিল তার চেয়ে ওপরে। কত্রিরের কৰ্ত্তব্য বেশে শাস্ত্রিকতা করা, অতএব আত্মস্বার্থকে খংস করা তার কৰ্ত্তব্য। তার জন্যে যদি যুদ্ধে নামতে হয় তাতেও কোন আপত্তি নেই, কারণ যে বুদ্ধ বর্ষযুদ্ধ। অন্যায়ের প্রতিষ্ঠার সাক্ষার বর্ষ। তার জন্যে যদি কৃত্তকেত্রের আরোচন করতে হয় তাও স্বীকার, কৃত্তকেত্র হয়ে ওঠে তখন বর্ষকেত্র।

ওষু কত্রিয়েস বেলা নয়, ব্রাহ্মণ বৈশা পুত্র, প্রত্যেকেরই নিজস্ব বর্ষ ছিল, নিজের নিজের কৰ্ত্তব্যপালন তাদের কাছ থেকে সমাজ আশা করতো। ব্রাহ্মণের যে চাকার সবকার ছিল না এমন নয়। কিন্তু তাই বলে সে কোনদিন ধর্মীষ ছাত্রকে বিদ্যালয়নে বসিত করেনি। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাদায়িত্ব ছিল ব্রাহ্মণের হাতে। কিন্তু টিউশান কী যোগ্যতেন বেশীত-ভাণ হলে সাক্ষারভাষা। শিক্ষার্থী ওর বাড়ীতে বাস করে ওরপর্দীর কাছে বিস্তার সাহায্য কোরে স্তিত এটা ঠিক, কিন্তু সেটা ওর পরমা স্বাভাব্য হনো নয়, ছাত্রের ডিসিঁড়নের জন্যে। শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল, কিন্তু শিক্ষাটা সেওয়া হোতো বিদ্যালয়িকার প্রায়ত্তে নয়, সমাবর্তনের সময়। আর তাও সেওয়া হোতো সম্পূর্ণ পিছের স্বভাব অনুযায়ী। এ নিয়ম আধুনিক যুগে আবার চালাবার চেটা করলে ক'টা মুল কলেক চলবে বলা পড়।

বৈশ্যের কৰ্ত্তব্য ছিল গোপালন, কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য, হাতে কলনের কার। চাকা রোজগার তাদের প্রধান পেশা তাদের মধ্যে চাকার ওপর টান ছিল কন, এমন কথা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু সেখানেও ছিল বর্ষ। লাভ করবার জন্যেই ব্যবসা করতে গায, কিন্তু লাভের পরিমাণ বেন অসঙ্গত না হয়। চাকা না জ্বাতে পারলে ক্যাপিটাল বাড়বে কি করে? কিন্তু সেখানেও অন্যের কথা ভাবতে হবে। রোজগারের নির্জগিত অংশ দিতে হবে রাজ্যকে কর বা বলি হিসাবে, তা না হোলে রাজস্ব রাখা যায়। ব্যাকী চাকা থেকে যতন্ত: কিছুটা ধরত করতে হবে অপরের কাছে—উপনিষদের যুগে ইষ্টাপুষ্টি অর্থাৎ যোগযজ্ঞ এবং কৃপ-ধনন ছিল একটা বড় রকম পরোপকার। পরবর্তী কালে এলো চৈত্যা নিখাণ, নবির স্থাপন।

আর সর্বোপরি ছিল ধর্মের বিধান, শ্রুতির বাণী—ন বিদ্বেন উপধীয়া ননুবাঃ—চাক।
 নিয়ে মানুষের মন ভরে না।

বিজ্ঞানটির পক্ষে যেমন, শূদ্রের জন্যেও সেই এক ব্যবস্থা। শুদ্রের প্রধান কাজই হোলো
 পত্রের সেবা। এখানে কঠিবাটাই যেন বড় রকম করে দেখান হোয়েচে। তার মানে এই নয়
 যে শূদ্রের জীবনে সারু ছাড়া আর কিছু ছিল না। তাকে বেদ পড়তে দেওয়া হোতো না,
 বাগবন্ধে তার পাত পড়তো না, এটা ঠিক। তবুও কিছুরের কাছে উপদেশ চাইতে কোনো
 দলুজা ছিল না, পরের যুগের শঙ্করাচার্য্য চণ্ডালকে গুরু বলে মেনে গিলেন, বধ্যযুগে
 শূদ্রবংশজাত সাধকের অভাব হয়নি। এমন কথা বনবো না যে প্রাচীন ভারত শূদ্রদের
 ওপর অবিচার করনি। বেশ বড় রকম অবিচার হোয়েছিল, তার শাশুত প্রমাণ রয়েছে
 অশ্বশৌর্য দল। তবে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আগেকার দিনে সনথু জাতির ঘট্যাংশ
 অশ্বশুশা ছিল না, শূদ্রের সংখ্যা ছিল নগণ্য।

প্রাচীন ভারত যেদিন ধর্মের বলনে বেচছাচারকে সিংহাসনে বসান, সেইদিন থেকে তার
 অধোগতি। ঠিক কোন্ দিন তা জানা নেই, তবে মনে হয় নগধের নন্দরাজবংশ থেকে এর
 সূত্রপাত। শূদ্রপুত্র মহাপ্রমুদশ যেদিন পরগরানের বড় কত্রিবংশে শ্বংস করে অর্ধাঘবর্জের
 অধীশুর হয়ে বসলেন সেদিন ভারতের এক দুর্দিন। তার পর এলেন মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত।
 চন্দ্রগুপ্ত দাসীকন্যা মৃদার ছেলে ছিলেন কি না এ নিয়ে পণ্ডিতবহলে তর্ক আছে, কিন্তু তাঁর
 সাম্রাজ্যের কর্ণধার কুটিলমতি চামকা যে স্বভাবে ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তার প্রমাণ স্পষ্ট। রাজ্য
 অশৌক দাক পিছিয়ে যেন বেড়ালেন বাটে যে আমি প্রায় বাচনাং পাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, মন
 দিয়েছি ধর্মবিজ্ঞানে। ইতিমধ্যে কলিত জয় করতে গিয়ে কত সনথু নিরীচ মানুষের প্রাণ-
 বধ হয়েছে তার হিসেবও কিন্তু হয়ে গেছে তাঁর শিলালিপিতে। কৌটিল্যের মর্ষণান্ত্রে কে-সব
 সামান্য কারণে বড় রকম সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে জাতিধর্মনিবিশেষে—তা খে-কও
 অনুমান করা যায় প্রাচীন ভারত ধর্মের আদর্শ ভুলতে আরম্ভ করেছে, নব্যব্যবস্থায় ধুন
 ধরছে।

অশৌকের বর্ধলিপি পাথরেই রয়ে গেল। হাজার বারশো বছর ধরে বিজিগ্ধাষ
 রাজার দল সেখটাকে প্রায় ভাষাখার করে দিল তাদের অজ্ঞানতার স্বাক্ষরকারে। ব্রাহ্মণ পুণ্ডিতকার
 বড় বড় মনান লাগিয়ে রানালের গায়ের জোরের বাহাদুরী গাইতে বসলো। মহাকবিরা
 কাব্য লিখলেন যুদ্ধের উপাদানে। স্বাধীন রাজত্ব কোথায় গেল ভেঙ্গে, দেশ হলো পরাধীন।
 কত্রির যেমন রাজধর্ম ভুলতে বসেছিল সন্দে সন্দে ব্রাহ্মধর্মও তখন থেকে অধঃপতন
 আরম্ভ। তার জন্যে পারী বোবদয় খানিকটা বুদ্ধের অনুশাসন। ভট্ট কুমারিন এবং
 আচার্য্য শঙ্করের আগের যুগটাকে বৌদ্ধযুগ বললে অতুক্তি হবে না। বৌদ্ধযুগের পণ্ডিতরা
 ব্রাহ্মণের স্থান বেশ একটু নীচে নাবিয়ে দিয়েছিলেন। পৃথ্যবিত্ত গুপ থেকে আরম্ভ করে
 গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত কয়েকজন হিন্দু রাজা তবনও খুব ঘটী করে অশ্বশৌর্য বজ্জের

আয়োজন করতেন বটে, তার প্রমাণ আছে ইতিহাসে। অল্পকৃত্য রামধন প্রাপ্ত লিপি-
নামার নিচেতনের পরিচয়ও দিচ্ছেন “কত্রিরপনামান মহাবক্ষণ” বলে। তা সত্ত্বেও কিন্তু
বোধহয় অন্যরূপে বলা যায় সেই সময় ব্রাহ্মণের বর্ণাশ্রম কুণ্ড হচ্চে বৌদ্ধত্বকদের লাপটে,
দেশের লোক বৈদিক যোগবদ্ধ ভুলতে আরম্ভ করেছে, ব্রাহ্মণ আর গুরুনশাই নেই। সে যুগের
স্বত্বিগ্রন্থ নিশ্চিতকরনে বিধান দিচ্ছে “আপংকালে”, অর্থাৎ কি না সরকার পড়লে বা স্ববিধে
পেলেই ব্রাহ্মণ নিজেই পেণা ছেড়ে অন্য জাতের মতন চামবাস বা চাকরী করতে পারে, ডাঙে
পাত্তকার আপত্তি করবেন না। ব্রাহ্মণের এমন দুরবস্থা না হলে সখ্যন শতাব্দীর হর্ষবর্ধন
চৈনিক হিউয়েনসাংকে নিজের রাজসরবারে সর্বেচ্ছা আসন দিতে সাহস করেন? নালন্দার
মতন বৌদ্ধপ্রধান বিদ্যাশীঠেরই কা এতটা উদ্যুতি কেমন করে সম্ভব হয় ব্রাহ্মণ যদি স্বধর্মচ্যুত
না হতো?

লক্ষণে শব্দর সানানুচ জাতীয় গোঁড়া হিন্দুই হল এবং উদ্যোগে মননমান কাজী
উলেনায়া নিলে ব্রাহ্মধর্মে আসার ঠেলে তুললো সনাতনের পার্শ্বস্থানে। তাতে কিন্তু বর্ণা-
শ্রমবর্ণ ব্রহ্ম পেল না। ব্রাহ্মণের টিকি পৈতের বহর একটু বাড়লো বটে, কিন্তু তার সঙ্গে
এল এক দিবাটি মায়াব্রিত্ত। রাজপুতানার বাইরে ততদিনে কত্রিরের প্রত্যাপ খেছে শান্ত
হয়ে। আগে যারা ছিল বৈশ্য, দেশের অনুশাস্তা কৃষকের হল, তারা হয়ে খেল সব শূত্র,
একরকম প্রাণ অশুণ্য জাতীয়। ব্রাহ্মণ হয়ে বসল সনাতনের একচ্ছত্র সনাত। ততদিনে
সে কৌল খুলে বলে পাত্ৰাধার তৈল কি তৈলাধার পাত্ৰ এই নিয়ে তর্ক লাগিয়েছে, নাসির
পড়ে তার খা ঘেঁষে বসে এমন কারুর সাধা নেই।

কলির ব্রাহ্মণ কিন্তু মত এক ভুল করে বসেছিল। সে কোনদিন ভাবতে শিখলো
না যে সনাতনের পাণ্ডী একচাকার চলে না, তার চারটে চাকটাই সমান মহাবুত হওয়া সম্ভব।
তাঁই জগদ্বাদেশের বন খেল পেয়ে, ভারত আর উঠলো না। আশবদানের বা গিরে
বাঁচাবার হলো এনেল বিবাহী, গুরু গোবিন্দ সিং, এলো ইংরেজ বণিক। আবির্ভাব
হোল শ্রীচৈতন্য রামকৃষ্ণের শ্রীঅরবিন্দের।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমা প্রসঙ্গ*

ডক্টর কে. আর. শ্রীনিবাস আরেঙ্গার

(১)

অজ্ঞাতকুলশীল পণ্ডিতেরাও আর্থের প্রকাশ আর যুরোপে বজ্রাক্ত দুঃস্থের সূচনা—যে দুঃস্থ পরে বিশ্বব্যাপী রূপ লাভ করল—প্রায় একসঙ্গে। ১৯১৪ সালের ২৮শে জুন হাবস্‌-বুগের সিংহাসনের উত্তরাধিকারি ও তার স্বীকে নিহত করল সার্বিক দেশের ২০ বছরের একটি যুবক। ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে যুরোপে পররাষ্ট্র দপ্তর তুলিতে বাস্তবতার খড় উঠল এবং পাস্তি বনাম যুদ্ধ নিয়ে ক্রমবৃদ্ধিগারে আপত্তিপূর্ণ কিন্তু ক্রমবৃদ্ধিগারে আশাভরক তর্কবিতর্ক চলছিল। ২৮শে জুলাই অষ্ট্রা সার্বিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, এটা আগষ্ট চার্গানী করল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং ৪ঠা আগষ্ট ব্রিটেন চার্গানীর বিরুদ্ধে। প্রথম মহাযুদ্ধ হল গুরু চার্গানী, অষ্ট্রা, সার্বিক, ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের প্রত্যেককে প্রায় প্রথম থেকেই কোন না কোন পক্ষে যোগ দিল।

পেয়ে সভ্য মানুষ কি এক পরস্পর আঘাতাতী সংঘে পরিণত হতে বসল? নিম্নলিখিত কানীগুলি শ্রীমার অস্থির মণ্ডিত করে নিঃসৃত হ'ল

“ভগবান! চিরস্থল অধীশ্বর! শক্তিরাজির সংঘর্ষ মানুষকে কোল কোল চালিয়ে নিয়েছে তারা অপকল্প আত্মনিদান করে চলেছে, নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছে বজ্রাক্ত পূর্ণাভিত্তি মধ্যে।

ভগবান, চিরস্থল অধীশ্বর এ ঘেন বৃথা না যায়...। (১)

দু'দিন পনেই শ্রীমা নিম্নে জানালেন যে “পৃথিবীর মহাসঙ্কটকাল উপস্থিত” (২) এবং ৮ই আগষ্ট আবার লিখলেন, “পৃথিবীর উপর স্বর্গের নত সেনে পড়েছে বিভৎস শক্তি সব— অজ্ঞান ভায়া, উগ্র বলবান, অন্ধ”। (৩) শ্রীমা “বুদ্ধরত অন্ধকার পৃথিবী” থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন না এবং ২১শে আগষ্ট শ্রীমার হৃদয়ের অস্থিরতা থেকে উৎসাহিত হ'ল আর এক প্রাণবী “ভগবান, ভগবান, সবই পৃথিবী পৃথিবী, শোকবদ, স্বপ্নাশ্রয়

* On the Mother—Chapters VIII-XX & XXII

† Prayers and Meditations—P. 167

‡ Prayers and Meditations—P. 169

§ Prayers and Meditations P. 170

নুর্নুপ্রায়... এ বেলায়ানি বৃণা যেন তার উপর না এসে থাকে... অন্ধকারের এই গহ্বরতল হতে, পৃথিবী তার সনদ্রসভা দিয়ে ত্রোনার ভাবে, ভূমি তাকে দেখে বাতাস আলো এই জগো ; তার যে নিঃশ্বাস বহু হয়ে যায় ভূমি কি আসবে না তার রক্তার জন্যে" : (১) অর্ধেক যন্ত্রণা আর অর্ধেক প্রাণনা মিশ্রিত সেই একটী জীব আর্তকণ্ঠে যার যার তাঁর বর্ষ ভেদ করে ওঠে এবং এ কণ্ঠে সভ্যতাই যেন বিশ্বমানবেরই আর্তকণ্ঠ, যে বিশ্বমানব আর ভাগ্যের বিচারালয়ে আসাবীর কাঠগড়ার দাঁড়িয়ে, যার অধিপতীক অশেষ ও অবর্ণনীয়

"ভগবান : পৃথিবী আর্ত, শোকগ্রস্ত, এ জগৎ বিশ্বখলার বাসগৃহ হয়ে উঠেছে ।

অন্ধকার এত গাঢ় যে এক ভূমি তাকে অপসারিত করতে পার ।

এস প্রকাশ কর নিজেকে, জোয়ার কর্ষ সংসিদ্ধ হোক ।" (২)

"পৃথিবীর উপর অন্ধকার নেনে এল গাঢ় চরে, পুচ্চও হয়ে, বিজলী হয়ে... হুল জগতে শুধু দুঃখ ভীতি শ্বাস এবং জোয়ার শ্রবের আলো তার সব দীপ্তি নিয়ে শোকের আবরণ-তলে ভুবে গেল..." (৩)

অপরদিকে তখনও আশা, স্বপ্ন ও উৎসাহের বৃক্ষ প্রান্ত-সীতব কণ্ঠে শোনা যাচ্ছিল—
বলি ও তা ছিন প্রপদে অতি কীণ, ক্রবণ তাতে কুটে উঠল বিশ্বাসের পূর্ণ ভরসা, চরন বিজয়ের নিশ্চয়তা । ৩১শে আগষ্ট যুদ্ধের প্রথম রাতের শেষ দিনে শ্রীনা লিখলেন

"এই যে ভীষণ অবনততা, এই যে লক্ষণ শ্বাস, এইই যথেষ্ট লক্ষ্য করা যেতে পারে চলেছে বিপুল এক প্রয়াস, তার প্রয়োজন পৃথিবীতে নতুন বীজ নোপনের জন্যে ; যে বীজ শোভন শীঘ্র সব তুলে পড়ায়ে, লগতে এনে দেবে সবজাতিরূপে শস্যসত্তার (৪) পাঁচদিন পরে উদ্ধৃষ্ট হতে এল এক পুনর্নির্দেশের ডাক

"পাঁড়া ও, বিপদের সমুদ্রে ।... পাঁড়া ও দ্বির দৃষ্টি নিয়ে বিপদের সমুদ্রে, মহাশক্তি সাক্ষাতে তা যাবে নিশিবে ।" (৫) এ যুদ্ধের পিছনে নির্দিষ্ট রকমে হতাহত কোন পুরু বচসা । এ বহুসংসার অর্থ এও হতে পারে যে তা নৈতিক নিশ্চয়তা ও অন্ধশ্বাস উভয়ের চর বা স্বর্ণের পথে পাপকালক : তাই বা প্রয়োজন তা হল নির্ভরে যুদ্ধ করে বাওতা এবং "চাই বিজয়, স্বর্ধস্বপ্ন করে" । (৬)

ক্রবণ বিজাতি, উত্তেজনা, নৈরাশ্যের বেধ থেকে উদ্ভিত হল মুক্তিবৃত্তি ও অচল জ্ঞানের সূর্য । "সেতু বহুর নত একদিকে পাশ্চাত্য সভা—যা কখনও প্রকাশ পায় না, আর একদিকে

১ Prayers and Meditations—P. 177

২ Prayers and Meditations—P. 180

৩ Prayers and Meditations—P. 185

৪ Prayers and Meditations—Pp. 182-183

৫ Prayers and Meditations P. 186

৬ Prayers and Meditations P. 187

যা প্রকাশ পেয়েছে এটী বুয়েল মধ্যে... যা হওয়া উচিত আর যা হয়েছে এ বুয়েল মধ্যে সংযোগসূত্র।” (১) মানুষ এতটা আর কি ? প্রত্যেক ব্যক্তি চল আসলে সে যা যা যা তার হয়ে ওঠা উচিত—মান ও কালের যতীত যে সম্ভব তাকে উত্তরের মধ্যে, অতঃপে যে সব ও সভ্য তাকে রূপে প্রকাশের প্রয়াস। “বহু জগতের আপেক্ষিকতা”—এর অস্তিত্বের মৈত্ৰ্যভাব ও বানিশ্রুতির সত্তে মানুষ মিথিলা ভাবে জড়িয়ে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। কিন্তু তেমনি মানব আসলে মানুষ চল প্রকৃত পরম সত্যের উত্তরাধিকারী, তাই মায়নসমূহত ভাবেই সে চল অস্তুরে বিধাত্তিগ্ৰ ভড়ু ভগৎ এবং অস্তুরাধিক আত্মসমর্থ আধ্যাত্তিক ভগতের মধ্যে সংযোগসূত্র। গ্রীনা চলেন এক অপূর্ণ মধ্যে, তাঁর বাণী মানুষের দাবতীর দাতনা, ও আশুতাকে আশিসদন করে এবং যখন তিনি তাঁর প্রার্থনা উচ্চারণ করেন তখন দাসা পুণিবী সেই প্রার্থনারই প্রতিশ্রুতি করে এবং বিনীত আবেগনে সাধুচে যোগদান করে.

“এই আর্ড পুণিবীকে যিরে ধর তোমার কল্পনাধুর বাহপানে, তোমার অসীম প্রেমের কল্যাণকর দারায় পরিপূত কর তাকে।

আমি তোমার কল্পনার দূর বাহপান।

আমার প্রসাবিত বৃকে তোমার সীমাহীন প্রেম। আর্ড পুণিবীকে যিরে রূপে বাহ-মুগল, উপর রূপের ‘পরে তাকে আসরে চেপে ধরে ধীরে নেন আসে পরম আশীষের চূষন এই স্বচ্ছন্দে কণাচিন উপর—সাপ্তানাদারী নিরানবকারী মারের চূষন।” (২)

“তাদের হৃৎক তাঙ্গল কষ্ট এই বাচ্য সভ্য অনুভব করছিল, ভগবান। কবে হুন হবে অজ্ঞান ? কবে চল মানে সেদনা ? ভগবান ! এই কর যাতে বিশ্বেশ প্রত্যেক উপাঙ্গনাটি তার মূল সভ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে, সুপ্র না হয়ে রূপান্তর লাভ করে। অন্ধ অঃকারের যে অবগুষ্ঠন তোমাকে নেকে রাখে, অপসৃত হোক তা, তোমার আলো ছড়িয়ে প্রকাশ হও তুমি পূর্ণ-রূপে, তবে সে প্রকাশ ঘটবে অশ ও চেতনার মধ্যে, একটা ক্রমোন্নতির দারায়।” (৩)

(২)

মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা, শ্রুতি বাহবিকই মহাকালের ‘এপারে’ ও তাঁরে এটী ত্রিলাই পরম্পর সম্বন্ধ চরিত্রের ভূমিকা অভিনয় করা আমাদের ভবিষ্যৎ এবং এদের অনুষ্ঠানে আমাদের ক্রমোন্নতিপথ পাণ্ডিত্যবান-মহাকাব্যের দার সম্বন্ধন। কখনও অজ্ঞানচতুভাবে অপূর্ণ-ভাবে, কখনও সচেতনভাবে, সন্ধনভাবে, কিন্তু সর্বদা অযায্যত ও অকৃত্রিমভাবে—এইভাবেই সাধারণ মানুষ বিশ্বস্তনের সঙ্গীকর অভিব্যানে যোগ দেয়। মুক্তিভিত্তিকে বিভক্ত করা, যম্মীকে পবিত্র করা, সুবুখ্যাকে পূতবদ্ধ করা, সিদ্ধান্তিকে হরাগিত করা—এই হ’ল পূর্ণ-যোগের কর্মসূচী :

১ Prayers and Meditations P. 182

২ Prayers and Meditations P. 172

৩ Prayers and Meditations P. 202

‘‘সকল ভক্ত আকাশের মধ্যে তাদের জীবনীপঞ্জি হবে ওয়া, সকল রূপের মধ্যে এই জীবনীপঞ্জিকে তৃপ্তপনিত করে, ব্যবহার করে যে চিত্রাশক্তি তা হবে ওয়া, আর চিত্রাশক্তির নানাবিধ উপাদান সম্বন্ধে পুসারিত করে, অনুমূলন করে, প্রথর করে এবং মণ্ডিত করে ধরে যে প্রেম-শক্তি তাই হবে ওয়া—আর এইভাবেই বাস্তব-জীবনের মধ্যে অগণ্যভাবে একীভূত হবে গিরে পূর্ণপঞ্জিতে তার রূপান্তর সাধনে অবতীর্ণ হওয়া।

অন্যদিকে, তা হ’ল আবার, পরমতত্ত্বের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণের ফলে, পরমলভ্যের জ্ঞানলাভ, আর যে পাশ্চাত্য ইচ্ছাশক্তি তাকে প্রকাশ করে তার জ্ঞানলাভ; এবং এই একাধিকতার জন্যে জাগরতপঞ্জির অনুগত সেবক ও অজ্ঞান বন্ধ হয়ে ওয়া, আর মূলতত্ত্বের মাঝে সজ্ঞান একাধিকতা, এই উভয় একাধিকতাকে সংযুক্ত করে ধরা ভক্তরাঃ পরিশেষে মূলতত্ত্বের সত্যার্থ অনুসারে জীবন মধ্যে সচেতনভাবে রূপরূপকে বনকে প্রাণকে চালাই করা, গঠন করা।

এই বকনোই ত বাস্তবপূর্ণ সত্তা পরম সত্তা আর বাস্তব বিশ্বের মধ্যে সচেতন বধ্যতা হয়ে উঠতে পারে, প্রকৃতির যোগসাধনায় যে ধীর অনিশ্চিত গতি তার মধ্যে অবতীর্ণ হয়ে, তাকে দ্বিষ্টে পারে দ্বিঃ যোগসাধনায় কিম্ব পুণঃ গতি।’’ (১)

বিবর্তনের গতিকে সঠিক দিকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেওয়া—‘‘প্রকৃতিকে প্রায় যেন নিরানুসৃতী করে তোলা—এবং অপ্রকৃতিকে আরও ক্ষীণ করে তোলাই হ’ল মহান যোগীন্দ্রের, গৃহীতের মত। তাঁদেরই মধ্যে পাশ্চাত্য পার্থিব জীবনের ঐশ্বর্য নিয়ে ধরা দেয় এবং যেহেতু তাঁরা মূখ্যতঃ আনন্দের মধ্যে ও বাস্তবের বিরুদ্ধে, তত প্রকৃতিকে অতিপাণ্ডুতে বিবর্তনের যে অপূর্ণ নটক চলেছে তাতে তাঁরা ধীর অংশ অভিনয় করিতে সমর্থ।

শ্রীমা একপ হুয়া যোগী এবং সর্বসমুদ্রা মনোহা হয়ে মূর্তি তপোভব সার্থক অনুভব করেন এবং সেই সম্বন্ধে ও কোলাহলের মন থেকে তুলে ধরেন পাণ্ডি ও সৌম্যের পূর্ণকৃত্য। আর্য মহানকে যেমন তেমন সমগ্র পৃথিবীকে তিনি কোলে নেন, ঠিক সে ‘‘পাঁড়িত পিও যেন, তাকে নিরানর কন্যে ছেলে, পূর্ণন বলেই তার উপর পড়েছে বিশেষ মেহ’’ (২)—সেচ্ছার ও সাধুহে শ্রীমা পাশ্চাত্যের তাকে সাজা দিয়েছেন এবং অকর্ষক ও চিত্রাপ্রুত না থেকে কার্যাকরী ও নিষ্কিনন বস্ত্র নিজেই রূপান্তরিত করলেন। যোগীরা অনাশ্রব কখনাবিলম্বী এই সাধারণ জ্ঞান বাধা যোগীন্দ্রের অনন্য জীবন-কাহিনী দ্বিষ্টে যুগে যুগে বারে বারে বিখ্যা প্রসারিত হ’য়েছে। ডাঃ ইষ্টে চোখে আঁচুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ‘‘মহান যোগীন্দ্রের সকলেরই পক্ষে কর্তৃত্বপরতা ও প্রভাব এবং জীবের কর্তৃকুলতা বহুকেহেই অতৃতপূর্বভাবে পরিলক্ষিত হয়। উপদ্রবঃ ‘‘পুষ্টিদানকে প্রায়শ জাকা হত যতিভাবক ও যতি হতে; ‘‘সেন্ট বার্ডার্ড’’ সংগঠক হিসাবে চমৎকার কৃশদত্তা দেখিয়েছেন; ‘‘সেন্ট হেরোলা’’ বহু কন-

১ Prayers and Meditations P. 234

২ Prayers and Meditations P. 203

ভেনেটের প্রতিষ্ঠাতা ও শাসক হিসাবে তাঁর প্রশংসনীয় বৈশ্বিক ক্ষুদ্রিক ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। ...সাধারণত যোগীরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী নন কিন্তু আমার মনে হয় যে বৈশ্বিক জীবনে কখনো চুকতে সমর্থ হলে সেখানে তাঁরা বড় একটা ব্যর্থতার পৃষ্ঠাপ্তি দেখান না।” (১) তা হলে এ কোন নাটকীয় আশ্চর্যের বিষয় নয় যে গ্রীসার পিতৃ প্রত্যয় নিয়ে এবং যুদ্ধে সানন্দে যোগদানের মনোভাব নিয়ে পূর্ণোদ্যমে সেই মহা-কর্মের সমুদায়ী হতে প্রস্তুত। এ শুভ কল্যাণ, কিন্তু এ থেকে সমাপ্ত হতে পারে এক অর্ধপূর্ণ কর্মের দ্বারা-পরম্পরা দ্বারা প্রসার তিনি দিবা দুই দিবে দেখতে পেরেন।

“একটা আংশিক সৌন্দর্য সংগ্রহ বা হল পৃথিবীমাথা বিপুল সংগ্রাহকের প্রতিভা, তাঁর ভিতর দিয়ে তিনি আমার সানন্দ্য, আমার শুৎপত্তা, আমার শাসন পরীক্ষা কর; দেখতে চাও সত্যসত্যই আমি তোমার সেবক হতে পারি কিনা। যদি যুদ্ধের ফল দেখার যে তোমার বিশ্ব-প্রাণন কর্মের মত হবার উপযুক্ত আমি, তাহলে কর্মের কেন্দ্র তিনি আমো প্রসারিত করবে।” (২)

পরের দিনেই—১৯১৫ জানুয়ারী ১৯১৫ তারিখে—গ্রীসার তাঁর আশার অপটিক আভাস শিল্পে আমো আনন্দিকতা স্পষ্ট জাযায়

“প্রেমের বিরুদ্ধে বিবেচন, ন্যায়ের বিরুদ্ধে অমায়ের, তোমার বিধানের কাছে আয়তনবর্ণন বিরুদ্ধে বিদ্রোহের এই যে দুঃসাহসিক সংগ্রহ তাঁর মধ্যে আমি যেন এক মহত্বের শাস্তির জন্য আনন্দজাতিক উপযুক্ত করে তুলতে পারি—যখন মানুষ মানুষের আত্মকলম সব পেয়ে থাকে, যখন মানুষী প্রাণন সমগ্রভাবে নিমুক্ত হতে পারে তোমার ইচ্ছাকৃত জীবন স্তম্ভের সমগ্রতর করে তোলাবলি জন্য, তোমার ন্যায়ের জীবনিকালের জন্য।” (৩)

পূর্ণযোগী জীতলাদের মত মনগড়া সূত্রের, ঘটনারূপে প্রাণন, আচর্য্য ব্যবহারের ব্যতিক্রম প্রাণ বা সীতিন দ্বারা বন্ধ হয়ে থাকতে অবশ্যই অস্বীকার করবেন। দুঃখের বিষয় “আমরা যা ভাবিনা কেন, যা বলিনা কেন, সত্য চিরকালই তাঁর ব্যতিরেকে থেকে যায়।” (৪) চরম ধারণা, সুক্ষ্মতম কল্পনা, মহত্তম আবেদন ব্যর্থতার এবং নীরসভাবে উচ্চারণিত হলে সেবে “এক সময়ে তাদের বহুত্বের যৌবন বসন্ত জারিয়ে বসে” এবং আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে বৃন্যাদীন হয়ে পড়ে। পূর্ণযোগী অসীত অভ্যাসের ও ধর্মবিশ্বাসী প্রচলিত প্রাণন এবং সাবশেষ জট অভিজ্ঞন করে গড়বে এখানে যান। তাঁরই প্রাণবল্য্য দূর্বীর যিনি শত বকনের ব্যাধি বাড়িয়ে চলে যেতে পারেন, আদর্শের দিকে ঈশ্বরভাবে আগ্রহ হতে পারেন, সশেষ যোগ্য না হলে ও নাথকপে কোথাও বিশ্বাসহবে বর্ণ না থেকে আনন্দ-ভোরণ সব আকস্মিক

১ Christian Mysticism Pp. XI-XII

২ Prayers and Meditations Pp. 222-23

৩ Prayers and Meditations Pp. 223-24

৪ Prayers and Meditations P. 215

যাক্রমণে ভয় করে খুলে ফেলেন। মানুষী নাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলা যায় যে এ চল যতদূর কঠিন ও বিপর্যজনক দুঃসাহসিক কাজ। কিন্তু এ কাজ করতেই হবে, উদ্বেগে নিম্নোক্ত বাণী যাত্রা স্বত্বকিত হয়ে শ্রীমা কন্থেনই এ কাজ এবং লক্ষ্যে না পৌঁছান পর্যন্ত অবিচলিতও থাকবেন :

“সাধারণ মানুষের মধ্যে সাধারণ মানুষ হয়ে কাজ করে চল তুমি : এই বিশ্বপ্রকাশের মধ্যে তাদের চেয়ে অতিরিক্ত কিছুই নাই, এই শিকা লাভ কর তোমার জীবনধারায়, তাদের জীবনধারার সঙ্গে সমগ্রভাবে নিজেদের মিলিয়ে ধর। কারণ তারা বহুত্ব জানে, বহুত্ব হয়ে আছে, সে-সব ছাড়িয়ে তোমার মধ্যে তুমি বহুত্ব করছ চির-ভাবের, অসিক্ষিত অধিশিখা—তাদের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে ধরে এই শিকাকেই তুমি নিয়ে আসবে তাদের মধ্যে। তুমি যদি বিচ্যুত কর আসো, তবে তা উপভোগ করার প্রয়োজন আছে কি তোমার? আমার প্রেম যদি বিতরণ করে চল তুমি, তবে প্রয়োজন আছে কি তোমার অন্তরে তুমি অনুভব করবে তার স্পন্দন? তাদের সকলের জন্যে তুমি হবে আনতে নিহিত আনন্দের বাচক, তবে কি প্রয়োজন তোমার তাকে সর্গভোভাবে আশ্বাসন করার?” (১)

(১)

‘রেভা জা শ্রী সাত্ত্ব’ আর্থের ফার্সী সংস্করণ। ১৯১৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশ বহুত্বের পর্যাপ্ত এ পত্রিকাটি গ্রীষ্মকাল মন অনেক ধানি হুড়ে বসেছিল। যাত্রা সাতটি সংস্করণ প্রকাশ হ’লে না হ’লেই বহুত্বের সপ্তদশকাল সম্পাদকদের পত্রিকাটি বখিত রাখতে রাখা কন। কিন্তু আর্থ যারও সাত্ত্ব ছয় বৎসর খুবই নিয়মিতভাবে প্রকাশ হ’লে নাশাল এবং কেবল ১৯২১ সালে তার প্রকাশ বহু হয়ে গেল।

সম্পাদকীয় ও সহায়কারী লিখিত থেকে অবশেষে মুক্ত হয়ে শ্রীমা ‘কানো নাক’ জাহাজে পত্রিচরী পত্রিগ্রাণ করলেন এবং জ্ঞান অধিনুখে যাত্রা করলেন। তখনও পর্যাপ্ত শ্রীমা জানতেন না যে তিনি এতে খুবী না হুঃখিত। বহির্দীন পন্যাতার পর্যাবসিত হয়েছিল ও তিনি যেন একটি অন্ধকার ভূত্বের মধ্যে প্রকৃষ্ট হয়েছেন। পত্রিচরী সহরে এমন একটা কিছু ছিল যা তিনি পড়েনে ফেলে চলে এসেছেন। সত্যই কি পত্রিচরীর সব স্মৃতিস্মৃতি মুছে গেল? তা অসম্ভব : কোথায় থাকে নিরে যাচ্ছে, এ ধনধারী কী, কোন প্রচণ্ড অজ্ঞানতা ধনীভূত হয়ে আছে তাঁর মননে? জাহাজে ওয়া মার্চ ১৯১৫ সালে তাঁর এই যাত্রাপ্রান্ত চক্কর মানসিক অবস্থাকে বর্ণনা করার সঠিক ভাষা পেলেন :

“কঠোর নিঃশব্দতা যার নিরন্তর তীক্ষ্ণ অনুভব যেন একটা অন্ধকারের নরকের মধ্যে আমাকে পোছা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।...ভগবান, আমি কি করেছি যার জন্যে এমন জীবন রাত্রির মধ্যে আমাকে ফেলে দিয়েছে।” (২) পরের দিন আমার নিশনেন :

1 Prayers and Meditations Pp. 221-22

2 Prayers and Meditations P. 225

“সেই একই কর্তোন নিঃসন্তা...ভগবান, তুমি আমার গাফিলত যত্নকারে ডুবিয়ে রাখছ...তবে কি তুমি আমার নির্বাচিত করেছ তোমার মশায়েরী হয়ে নবাবের দুশিপাকের মধ্যে নেমে আমার সন্তো।” (১)

শ্রীমা অনুভব করলেন যেম তিনি “আজার ঠিক সম্পূর্ণ বিপরীত যে সব বাবদ্য তারই নিকট” (২) যেম ভুট্টা মগ্নদের হয়ে চলেছেন এবং সবিস্ময়ে ভাবলেন ঈশবনে তাঁর কেন এরূপ পরিবর্তন ঘটল, এ কি আজার ভবসাক্ষ্য-রাতি অভিজ্ঞতায়ের শিক্ষা ? কেন তাঁর এমন আধ্যাত্মিক নিঃসন্তার অভিজ্ঞতা, কেনই বা এ মুনাতা, এ বাতলা, সনগ্র আবারের অসল আড়ইতা ?

এ সব অবস্থা যবায়ী মাত্র—শ্রীমা সনগ্র মানুষ ও প্রকৃতির জুটিকা অভিনয় করলেন এবং এই বেপারোয়া ভাল নিয়ে উঠলেন যাতে সেই পরবক্তমানর মনকুল ও নিকটতম পথে এসে লাড়া দিতে পারেন। শ্রীমার সনগ্রা অবিলম্বে ফিরে এল এবং তাঁর সেই ঘের্গোর দ্বির কেন্দ্র ও প্রচণ্ড উপসান্ধার পুরানো পথ খুঁজে পেলেন। তিনি কর্ণেব মধ্যে নিজেদের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করলেন এবং উষিগুতা ও ভীতিকে দিলেন নির্বাদন

“ভগৎ থেকে পন্যোন নয়—মলিনতার কদম্বাতার তার শেষ অবদি স্বভেদ বচন করে চলতে হবে—ভগবানের সত্যর থেকে স্বকিত হলেও মুকপাত না হবে। রাত্রির কোলের মধ্যে থাকতে হবে, চলতে হবে, দিক-বস্ত্র বিনা, আলো বিনা, আত্মর দিশারী বিনা।” (৩)

নিবিড় আধার রাতি নিজেই নিজেদের নিঃশেষিত করে ফেলতে। মূদর উষার আগমনী দেখা দিয়েছে এ হল প্রাণ-স্পন্দন চক্কর পূর্বেকার নিঃশব্দ মূহূর্ত এ নাটি বটে, কিন্তু এমন নাটি বা বাত্ম, চিরকাল যা বর্ধে থাকতে পারে। (৪) পূর্বাফালে ধরন কোটি-কুণ্ডর অবির্ভাব হয়, তখনই কুয়াসা বিদূরিত হয়, আলো ও প্রাণের প্রাচুর্য্য হয়, যদি সে-প্রাণ একই বেশ তীক্ষ্ণ ও বিভ্রান্ত

“স্বর্ণ চরা হয়েচে নিঃশব্দে—কোন জিনিষের কোন বাত্মল কনগ্রা গাট থাকে আর আমার কাছ থেকে সবিস্ময়ে নেয়। কিন্তু পৃথিবীর চর এখনও বাকী তার কাছ চলেছে বটে, তবে ঘূর্ণোদগেব তিতর বিরে—আর চর হলেও তা এখনো হবে আপেক্ষিক মাত্র।” (৫)

অবশেষে শ্রীমা প্যারিলে ফিরে গেলেন : কিন্তু বিশ্বর্ষদ-অভিমানের যে চরম বিভ্রম সে সবচেয়ে আর কোন মতোই রয়েল না। তাই তিনি ২রা নভেম্বর ১৯২৫ সালে পুণ প্রত্যাহার সঙ্গে বললেন যে :

১ Prayers and Meditations Pp. 226-27

২ Prayers and Meditations P. 227

৩ Prayers and Meditations P. 229

৪ Prayers and Meditations P. 232

৫ Prayers and Meditations P. 236

‘‘হাস্তি সব হয়ে উঠেছে সোপান শ্রেণী, অঙ্ক অনুসরণ হয়ে উঠেছে বিচল সিঁড়ি।
তোমার মন্দির পরাক্রমকে বাণ্ডিত করে পরিণত করে; অঙ্ককার সব অতর্পণ কবল, তোমার
শ্রোতৃবল জ্যোতির সমুদ্রে।’’

তুমিই ছিল প্রেমণা ও নকা, তুমিই কবী ও কর্ণ।’’ (১)

আধ্যাত্মিক আনন্দে ভোয়ারের দিক পরিপ্লাবী বেগ দেখা দিল এবং ১৯১৫ সালের
২৬শে নভেম্বর গ্রীষ্ম এক পর্বত অনির্ব্যাহার আনন্দের অতিভ্রান্তা লাভ করলেন

‘‘চেতনা সম্পূর্ণ ভুবেন্দ্রি ভগবানের ধ্যানে...মূল দেখে, প্রথমে তার নিরন্তর অঙ্ক-
গুলি, পরে সনগ্রভাবে, একটা পূণ্য ল্পশনে শিরশিত; ক্রমে ভড়তন অনুভবেরও সকল
ব্যক্তিগত সীমানা নগ্নে পড়ল। সত্তা বৃত্ত হতে বৃহত্তর হয়ে উঠল, ধাপে ধাপে সুনিয়মিত-
ভাবে, নকল ছাপাল ভেঙ্গে দিয়ে, সকল বাধা কাটিয়ে, যাতে সে ধারণ করতে পারে, প্রকাশ
করতে পারে, প্রসারে তীব্রতায় নিরন্তর বর্ধমান এক মহাবল, এক মহাশক্তি। এ বেন
কেতের মাদতীর কোষ ক্রমে সঙ্গীত হয়ে চলেছে, শেষে সবস্ত পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে।
আকাশের প্রসারে হসমতগভাবে এই যে পৃথিবীর ওল ভুবে চলেছে, জাগ্রত চেতনার সেই
বেন ত্রাট হয়ে উঠেছে—তবে চেতনা জানে তার পাখিই মহাকাশের দোহ এ বকন চলেছে
সঙ্গে, কিন্তু বিশ্বপুরুষের আশ্রয়ন-নকল হয়ে, তারই কাছে নিজেদের দিয়ে দিয়েছে, ছোড়ে দিয়েছে
প্রশান্ত আনন্দে বিভ্রান্ত হয়ে। তখন চেতনার অনুভব হল, তার সেই বিশেষ দোহের মধ্যে
বিশে গিয়েছে, এক হয়ে গিয়েছে চেতনা ত্রাট হয়ে উঠেছে বিশেষ চেতনা, তার নিচল
সনগ্রহতা নিয়ে অদ্যে তার আপনার অতর্পিত সচল সব অনন্ত-বৈচিত্র্য নিয়ে। বিশেষ
চেতনা আবার তুমি ভগবানের দিকে তীব্র আশ্রুতা আর পূর্ণ সমর্পণ নিয়ে যেমন সে
নিষ্কলক জ্যোতির প্রভানওনে প্রচলন পুরুষ বচনীয় এক সর্পের উপল পড়িয়ে, সর্পটির সেই
পৃথিবীকে ছড়িয়ে ধরেছে অনন্তভাবে। আর সে-পুরুষ তাঁর সমাতনী বিজয়ভক্তিতে সর্প-
টিকে ও সর্প হতে নিঃসৃত বিশ্বকে ধুগপৎ ধবনে রেখেছেন এবং সঙ্গী করছেন। সনগ্র
বিজয়ী বলি নিরেট তিনি সর্পটির উপর ধড়িয়ে রয়েছেন—সে অতর্পিত বিশ্বগ্রাসী সর্পটিকে
প্রতিহত করে রেখেছে যেমন, আবার তেমনি নিরন্তর পুনর্জীবিত করে চলেছে। চেতনা
তখন সেই পুরুষই হয়ে উঠল, যেমন তার রূপ আবার বদলে গেল, বিশে বিশে গেল এমন
একটা ভিনিসের মধ্যে যার নিছক রূপ নাই, যাতে রয়েছে সকল রূপ, অব্যয় অক্ষয় ভিনিস
একটা, উঠানাত্র সাক্ষীস্বরূপ। আর সে যে দেখে, জই আছে। তারপর রূপের শেষ-চিহ্ন
লোপ পেয়ে গেল, চেতনা পর্য্যন্ত ভুবে নুড়ে গেল অনির্ব্যচনীয়েব অবাচ্যের মধ্যে।’’(২)

(৪)

একদিকে স্বর্গ ও অন্য দিকে নিঃস্বর্গ কর্ণ, একদিকে ব্যক্তিগত উন্মত্তি লাভনের জন্য

১ Prayers and Meditations P. ৩৩৭

২ Prayers and Meditations Pp. ২৪১-৪২

কৰ্ম ও আর একদিকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বজ্ররূপে কৰ্ম-সমর্পণ—যথোপযোজ্যে কি এক বিপুল বিহার ও উৎসব ভূমি, কতলা গোলাবিল ও আপোষ-রস, নিরুদ্ভিগ্ধতার কত না বজ্রগান ও পাঙ্কশালা । কিন্তু এ সবকে কোন সম্ভব যেন না থাকে : পরেই হোক আর আগেই হোক স্বার্থপূর্ণ কৰ্ম আরনিরোধী এবং শুধু সেই কৰ্মই কৰ্ম যা হবে “সহজ ও সরল, যার উদ্দেশ্য তামার করুণা বিকিনণ”। (১) কৰ্মের মূল-সূত্রটি সৌন্দর্যের নীলা ও আনন্দ বিচ্ছুরণ বাধ দিয়ে নয় । পুরুষোত্তম কেবল সত্য নন, সূক্ষ্ম এবং আনন্দও বটে । ১৯১৭ সালের ২৭শে মার্চ নিত্যনিবন্ধিত ধ্যানের মধ্যে এক অপূৰ্ব “সংলাপ আকারে স্বামী” পেলেন শ্রীমা । ভক্ত ও তপসাল ধাঁড়িয়ে বুঝান্বী ; দীর্ঘস্থায়ী সর্বশেষ কৃপায়া অপসারিত চল, আকাশ হল উজ্জ্বল, বেঘনুজ এবং সূর্য্যদেব তাঁর পূর্ণ মাধ্যমিক দীপ্তি নিয়ে উদ্ভাসিত হলেন এবং সম্ভরণ ও ভবিষ্যদ্বাণী সব তুষ্টি ও সম্ভাব্য আশার পরিপূর্ণ চল : “তুমি হবে কাঠুরে, ইচ্ছনের অন্য কাঠের খাঁটি বাঁধনে বলে ।

“তুমি হবে চংসাল, পাখা বেলে উড়ে চলবে, তার বুজাঙল চলার ষ্ট্রী সব গুচ্ছ করে সেবে, আর পালকের খেত আভার জলর সব তপ্ত করে তুলবে ।

“তুমি সকলকেই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তাদের পরম সার্থকতার অভিমুখে।” (২)

প্রসন্নতা ও স্বাচ্ছন্দ্য চল তাঁরই, নিহাভক্তের পূর্ব্বেকার বিশ্বাসের বৃহৎ তাঁকই, প্রতিবেশনশীল জাপান শ্রীমানকে যে অর্ঘ্য দিয়েছিল সেই সন্মিচ্ছার মূল্যবান আভরণ সেও তাঁর। আত্ম-সমাহিত ধ্যানে চিত্ত দিয়ে—যা এখন স্বভাবের মত মূলাগত হয়ে ধাঁড়িয়েছে—শ্রীমা অসীমকে ক্ষুদ্র আলুকাধা মধ্যে উপলব্ধি করলেন, বৃহৎ হের ক্ষুদ্র পায়ে চিরস্থলকে সংগৃহীত করলেন

“আমি স্পেগেড পেলান একটা চেঁচী ফুলের সঙ্গে আমি একান্ত হয়ে গিয়েছি । তাবপর এ ফুলটির ভিতর দিয়ে যাবতীয় চেঁচী ফুলের সঙ্গে মিলিত হয়ে গেলান । তাবপর চেঁচানার আরো খতীর নেমে গিয়ে, একটা নীলাভ শঙ্কিত শ্রোতে চলে, আমি হয়ে উঠলান একবারে চেঁচী পাড়ানি, আকাশের দিকে আমার বাহুরই মত পাখা সব পুষ্পাধার দিয়ে প্রসারিত । ...মানুষের দেহ আমি গাভের দেহে কি প্রভেদ ? কোনই প্রভেদ নেই বড়ত—যে চেতনা উভয়কে অনুপ্রাণিত করে তা এক অভিনু ।” (৩)

“আকাকুরা” সহরের বিরাট পর্ব্বত ও তাদের অসীম শান্তির পরিবেশে, তাদের মনোবন নীরবতা ও অর্থও সৌন্দর্যের সঙ্গে অপূৰ্ব একান্ততার শ্রীমার জন্ম স্পন্দিত এবং এইরূপে তিনি “তোমার সঙ্গে যথিচ্ছনু একান্ততার অর্থও আনন্দ” অনুভব করেন । সূর্য্য-কিরণের বাহে নীকর-সম্প্রদায়ের মত, উৎকৃষ্ট নিষ্ঠুর মত, তিনি হাসেন, কান্দেন এবং তাঁর পরবেশুর ও শ্রমিকের মাখে অন্তঃকালের জন্য একান্ততার আবহ ।

১ Prayers and Meditations P. 271

৩ Prayers and Meditations P. 277

4 Prayers and Meditations Pp. 281-82

বাসবদত্তা

[অরবাব]

ঐশ্বর্যবিশ্ব

চতুর্থ অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাসবদত্তার গৃহ।

২২শ, বাসবদত্তা

বৎস । তোমার চাত্ত
ত্বাশেষ কৌশলটি এখনো বশ্ত করতে পাবেনি ।
তবু স্পর্শ নয়,
স্পর্শ কববার ধন্যপাট্ট
যক্ষকুট বাণা-আবাক ডেকে তোলে,
এট রকম ।

বাসবদত্তা । আমি টিক করতে পারছি না ;
সোমাব চাত্ত বিলোদী হয়েছো ।

বৎস । তাকে বাধা কত্তাব তাহলে আমি ।
(নিজের হাতে বাসবদত্তার হাত গ্রহণ)
তুনি তো ত্রিসজ্ঞার করলে না ।

বাসবদত্তা । ত্রিসজ্ঞার করে করে আমি কত্তাব ;
আর বে ছেলেকে শান্তি দিলে যজ্ঞা পায়
তাকে শাসন করি কী ভাবে ?
আর এ আবার হাত বৈ তো নয় ।
এ কী কত্তাব ?
(হাত করে বৎস তরক নিঃসর করে আতর্পণ করছে)

বৎস । যা তোমার দৃষ্টি আনাকে আদেশ দিবেছে,
যা দিনের পর দিন আকাঙ্ক্ষা করেছে আনার হৃদয়
ক্ষুধার্ত বেন্দনায় ।

বাসবদত্তা । এত পাগল ! ছেড়ে দেবে না একুনি ?

বৎস । তোমার অন্তরের ইচ্ছা পূর্ণ না করে নয় ।
(বাসবদত্তাকে কোরে উপরে তাকান)

বাসবদত্তা । কী ইচ্ছা ? কোনো আদেশ দেই নি আমি ।
কী ইচ্ছা ? বৎস !
বৎস ! আমি কোনো আদেশ দেই নি ।
এসব ভালো নয় ।

(বাসবদত্তাকে কোর করে কিষ্কর কূতর উপরে তাকান) বৎসের কানে
দুইয়ে গড়ন বাসবদত্তার শব্দ ।)

বৎস । ওগো আমার ইঙ্গিত্য, যে আনন্দ ডাকছে উত্তরকে
তাকে আস আনরা প্রত্যাখ্যান করি কেন ?
হৃৎকের সঙ্গে যুদ্ধে নোনা না,
বরং লাগ আনাকে
সেই বধুর মানবী সৌভাগ্য ।
আনাকে যা মান করে তুলবে
সর্বস্বত্বশত্রু সর্বস্বত্বলোকের ছুঁতন দেবতার সঙ্গে,
তোমার ওই ওপাশে ফেরান পালের উপর ।
আমার রাণী, খেয়ালী স্নাত্তী আমার, বৃথা তোমার চেয়ে
আমার কাছ থেকে সরিয়ে রাখা
এতদিনের ব্যক্তি
তোমার ওষ্ঠাধরবনি ।

বাসবদত্তা । বৎস ! বৎস !
(বিজের হৃৎকর কাছ তুলে বাসবদত্তার ওঠে তুলন)

বৎস । ও কী বধু তোমার কূর্বে ।

- আনন্দ, আনন্দ আমার আশ্রয় নবুত ।
এতদিনে সুখ পান করনাম স্বর্গে,
এবার ঘটুক যা থাকে অদৃষ্টে ।
(নিম্নেই হাড়িরে নিবে, একটু ছুঁই হাড়িরে পানঃ পানঃ বাসবদত্তা)
- বাসবদত্তা । ওইখানেই হাড়িরে থাক ।
কাছে এস না আমার ।
- বৎস । ভেবেছিলাম যুগযুগান্তের পথে এতটাই যথেষ্ট হবে ;
কিন্তু তা ভো নয় ।
- বাসবদত্তা । আমার কাছ থেকে যাও,
যাও যে নিজের ঘরে ।
- বৎস । এতট কি অপ্রসঙ্গ করনাম ?
তাহলে যাব আমি ।
(অত্যাশ্রয় ভাব)
- বাসবদত্তা । বৎস, আমি রাখ করিনি ;
যেওনা ।
কস, তোমাকে তিরস্কার করব ।
এ কি চিন্তা—আমার উপরভার অপব্যবহার,
প্রশ্রবকে তুল ভাবে গ্রহণ করা ?
না, আমি রাখ করিনি ;
তুমি কালক বই ভো নয় ।
তোমাকে আমি ভালোবাসতে দিয়েছি
বেহেতু তুমি বলেছিলে তুমি অনন্যোপায় ।
এটি যার কখনো করবে না,
এরকমে নয় ।
- বৎস । তবে শিখিয়ে দাও কোন রকমে ।
- বাসবদত্তা । (দ্বিগত হানির সাথে)

এমন নাড়োড়পাক্ষা বাপা আর জেন্নে দেখিনি ।

তোমার জন্য কিছু শান্তি

ভেবেচিন্তে বের করছি তব ।

(৭৭সের কাছে এল হঠাৎ, তারপর দুকে ঠক্কির ধরে ফাটল তল : কল্ল তখন)

৭৭স ।

ও, এই যদি হয় শান্তি

তবে আমার সোম করব আমি ।

(বাসবদত্তা ৭৭সের বক্ষসমূহ হাট্টে আবার তাকে তুষ ফেল, তারপর বিকে : ৭৭স
কোথ গিয়ে লজ্জিত হেসে দিল)

বাসবদত্তা ।

নাও আমার কাছ থেকে ।

যাবে না ?

মহানিকা :

৭৭স ।

তোমার ছপরের বিবন্ধ

তোমাকে সাহায্য দেবার জন্য

মহানিকা এখানে নেই ।

কিন্তু আমি নিজেই যাচ্ছি ;

তোমার ইচ্ছা তাই ।

বাসবদত্তা ।

আমাকে ছেড়ে যাবে ?

৭৭স ।

কখনো না !

এমনি করে আমার বুকের মধ্যে স্থান নাও তুমি

বাসবদত্তা ।

বাসবদত্তা ।

আঃ, কি সুখ !

৭৭স, একমাত্র এ মধুর নাম পৃথিবীতে

আমি নীরব কালের কানে কানে বলে এসেছি,

নাও আমাকে আসল,

চিরকাল থাকতে নাও তোমার আলিঙ্গনে বাঁধা ।

সাজা বিশ্বের সৌন্দর্যের শীর্ষ এবে ।

৭৭স ।

দুঃখযুগান্ত হবে যদি আমার এমনভাবে থাকতে পারতাম

আর যদি এ আশ্রয়ের ডারে
অকস্মেৎ হয়ে না পড়ত কালশ্রোত,
বাসবদত্তা !

বাসবদত্তা । তোমাকে চিরকাল ভালোবেসেছি,
এমন কি, যখন তুমি জানতাম না তখন পর্যন্ত ।
আমাদের মধ্যে অলক্ষ্য প্রেমই কি তোমাকে
জোর করে এখানে টেনে আনেনি,
বৎস ?

বৎস । এখন আমি তোমার ওষ্ঠাধর গরিরে নেবে না ত ?

বাসবদত্তা । কোনো বস্তুই নয় ।

বৎস । ইঁদা, এবার থেকে
তুমি হও আমার সমপিত রাণী,
আমি সিংহাসনারূঢ় তোমার দাস ।
আমাকে ততখানি অধিকার দাও ।
যাতে তোমার দূর্ধার নৃষ্টের কাছে চির-অবনত থাকতে পারি,
নিবেদন করতে পারি আমার শ্রদ্ধার্থ
তোমার নধুনয় একচ্ছত্র আশ্রয় কাছে ।
এইভাবে, এইভাবে গ্রহণ কর আমাকে ।

বাসবদত্তা । রাজ্য আমার, গ্রহণ করলাম তোমার সেবা,
তোমার অর্থ এবং তোমার প্রেম ।
প্রতিদানে যদি আমাকেই মুক্তদত্তে
তোমার উপর চেলে দিই
যথেষ্ট হবে কি ডাঙে ?
যেমন আমার সারা জীবন কানায় কানায় পূর্ণ করে যাবে তুমি ?

বৎস । নিত্যকালে সকাল দুপুর সন্ধ্যার মধ্যে বিনিমেয় দাও ।
আনন্দিক দিনের নিয়ে তৃপ্ত

সাধারণ নরনারীর মধ্যে আনন্দের দ্বন্দ্ব না ;
কর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়েও আনন্দের দ্বন্দ্ব
অধিকতর আনন্দ আনন্দের জন্য

দুটি প্রীতিসম্বন্ধ দেখে বিভক্ত
একই উল্লস আনন্দ ।

আমার সকল কর্মের কত্রী হবে তুমি,
আর যে-কাজ আমাকে ডেকে নিয়ে যাবে
তোমার ছায়ামূর্তির আশ্রয় থেকে দূরে
সেখানেও তোমার মধুর স্মৃতির প্রভাবে
তোমার দ্বারা তুমি বেন সম্পন্ন হও ।

বাসবন্দ্য । তোমার হৃদয় যদি আমার প্রতি বিনুত হয়ে...

বৎস । আমার হৃদয় কখনো নয় ।

বাসবন্দ্য । তোমার চোখ যদি আমার প্রতি বিনুত হয়
বৎসরাত...

বৎস । না কিছু ভুল্লত তুমি যদি আমি দেখি সহজ আনন্দে
তাহলে তাতে সোধ ধরে না—
কারণ সে আনন্দের অংশ হবে তোমারও ।

বাসবন্দ্য । সেখানে আমি দেখব তবে তোমারই সৌন্দর্য ।

বৎস । আজ মধুযামিনীতে,
প্রিয়া আমার, প্রিয়তমা আমার,
আমরা কি কাটাব না বুকে বুক রেখে ?

বাসবন্দ্য । না, বৎসরাত, না ।

বৎস । তোমার অন্তর কি বলে উঠছে না, 'ব্যা' ?
পরিণয়-বন্ধনে বাঁধা নই আমরা ?

প্রিয়া, স্বর্গের বহিঃপ্রাণে বসে হেলায় আনন্দের সময় নষ্ট করব ?
সমস্ত দেবলোক নাখিয়ে আনব না কি এই শুভক্ষণে ?

বাসবদত্তা । অমৃতভণ্ড ! মন্থনিকা !

বৎস । মধুনরী, ত্রোনার চোখের আবেশন
আমাকে বলছে সবলে ত্রোনার ধর করে নিজে ।
(মন্থনিকা চুপেই বৎস বাসবদত্তাকে ছেড়ে দিল)

মন্থনিকা । রাজকন্যা ।

বাসবদত্তা । মন্থনিকা ! কেন এলে তুমি ?

মন্থনিকা । ডাকলে না ?

বাসবদত্তা । তুলে গিয়েছি । ও হ্যাঁ, মনে পড়ল ।
বৎসকে বশীশূহে নিয়ে যাবান জন্য ।
(বীহু বসায়) যেসেছ কি কপালে ত্রোনার চামুক !
সব ত্রোনাব শেষ ।

মন্থনিকা । তার পরিণাম বেশী নয় ।
আমুন দেবী হয়ে যাচ্ছে ,
রাজকন্যার পরিচারিকারা সদনবলে এল বনে ।
পিছনে আর অনিচ্ছাভরা দৃষ্টিপাত না করে
চলে আহুন ।
(বৎসের দুই মণিকর করে তাকে বাড়িতে নিয়ে গেল সে)

বাসবদত্তা । আমার ভিতরে অলে উঠেছে এক আগুন
ধ্বনিও হয়েছে এক আর্তরব ।
সব কান্নার বাঁধ আমার বন্যায় ভেসে গিয়েছে,
এখন অসহ্য ফেনিল ডেউ আঁধি ।
ওগো আমার কান্না,
ত্রোনার আকৃতি তার শেষস্বপ্নের জন্য

তার প্রতি অস্ত্র নিজের অস্ত্রের স্পর্শ দিয়ে অনুভবের জন্য
 আর নিজের অস্ত্রবাহা দিয়ে তার বহনর উন্মুখ আঁটার
 বিলীন হবার জন্য,
 আজ তারা রাত্রি তুমি কি নীরব থাকতে পার না ?
 চাঁদের আলোককে ছায়ে বেড়াব আমি ;
 বোধহয় বিশাল বৌন রজনী সেবে আনাকে শান্তি,
 মুন এখন নিরর্থক ।
 আঃ, তার দুটি হাতের আশ্রয় !
 সে দুটি হাত আনাকে ঘিরে,
 আর বিশ্বচরাচর অবলুপ্ত !

তৃতীয় দৃশ্য

হাফের গায়ে লুপ্ত-বেড়া।

১৭ম লম্বার বিকিট ; মল্লিকা।

- মল্লিকা । এখন টনি মুনস্ত
 আর এই ভো মনর আনার শিকারকে এখানে প্রবুদ্ধ করে আমবার ।
 কই ! রাতকুমারী ! বাসবদত্তা ।
- বাসবদত্তা । (গম্ভীর কণ্ঠে) আনাকে ডাকছ ?
- মল্লিকা । হ্যাঁ, সোৎসর্গ থেকে একেবারে চাঁদের কাছে
 আসবার জন্য ।
 তাকে এপর্বন্ত কখনো মুনস্ত দেখনি ভো তুমি ।
- বাসবদত্তা । মুনোচ্ছে !
- মল্লিকা । তাঁর কুঞ্চিত কেশদাম দুটিরে ধরেছে
 সোনালী বাচ-শিখানের উপর,

যেননা টানের উপর বেশ ।
দেখবে না ?

বাসবদত্তা । সাদস পাই না ।
আচ্ছা, এখান থেকেই দাঁড়িয়ে দেখব ।

মতুলিকা । তা হবে না ।
হর বিহার হও,
নরত ভিতরে এস ।

বাসবদত্তা । উৎপীড়কের ভূমিকা মিচ্ছ কেন ?
এখানে দাঁড়িয়ে থেকেই দেখব আবি ।

মতুলিকা । (গংগা তাক করিতে ঝেঁলে দিবে) যাও ভিতরে ।

বাসবদত্তা । মতুলিকা :

মতুলিকা । ছুপ, সাগিও না ওঁকে !
(গংগার পাশে বাসবদত্তাকে টেনে বিধে)
কেমন, ফুলের নন উনি ?
(গিছির এল সে, একটুকু পথে নিঃশব্দ ঘাইরে দিবে বহুলা বহু করে বিল)

বাসবদত্তা । হাঁ, এখন অনুভব করছি আমার মায়ের ফুলের
যখন তিনি মধ্যরাতে নিদ্রাহীন চোখে
আমার পাশে আনতনতকে বসে কাটাতে !
অনুভব জনের পর তখন থেকে
এও কখনো পায় নি মায়ের ভালোবাসা,
ভগ্নীর ভালোবাসা ।
ওগো শ্রিয়ন্তবের নিষ্প্রিত অস্তঃপুঙ্খ,
শোনো আমার প্রভিজ্ঞা
হস্তদিন তোমার বাসবদত্তার প্রাণ থাকবে
ততদিন কখনো তোমার অক্লান্ত থাকবে না
জ্বরের কোনো আকটিকা,

কোবল ঘরের কোন দাণ,
 একাধারে ভোমান সবই চর আমি
 স্ত্রী, মাতা, ভগ্নী, পুত্রা, সচচরী, পাছবী, রানী, নবী, নরী ।
 দাম্পত্যকলহে অহং আমার জুসরকে
 নিষেধ করবে না,
 কানঘোড়ে কিষ্ক। অত্যাগে নিশ্চিত হবে না
 আমার প্রেমের আঙন ।
 ভিতরে আমার গক্তি আছে
 ভানোবাসার দেবমূলত গক্তি ।

(মায় কেশের একটু গুচ্ছ খসেই মূলের উপরে পড়ে হঠাৎ ভাঙিয়ে দিল)

বন্দ্য : বাসবদত্তা ! তুমি এসেছ আমার কাছে ।

বাসবদত্তা : আমি নই !
 নতুলিকা তৈলে এনেছে আনাকে ।
 কই, কোথায় সে ?
 চরভাণী !

(সে ছুটে গিয়ে কেশের বহুতা ঘাট্টে থেকে বন্ধ)

নতুলিকা !
 এ কী রকম রসিকতা ?
 ভীষণ বাণ করব আমি ।
 ধোনো ।

নতুলিকা : (ঘাট্টে থেকে, বজীর করে) খিল খাঁচি ।

বাসবদত্তা : লোহাই, লক্ষ্যটী নতুলিকা ।

নতুলিকা : আমার সেনা-পাওনা বিটটিছি ।
 সুখী হও,
 আর চলনাম আমি ।

বাসবদত্তা : বেগম, বেগম, নতুলিকা ।

- ৪২১। (বাদবদন্তার কাছ এসে)
ও চলে থিরেতে,
থনা থনা দুর্কার্থি তার—
আনাকে আচ্ছন্ননীতে বেধেছ যে স্থনী কারাগারে
সেখানে তুনিও বন্দী।
স্বামী, তোমার নিষেধ শ্রোয়ের মধ্যে তুনিও বন্দী।
তবে স্বর্গের দরজা পাশ হয়ে
পালোতে চাও কেন?
- বাদবদন্তা। না, আচ্ছন্ননীতে নয়।
ঐশ্বর্য্য ধর।
পিতাকে ভিজ্ঞাস্য করব
তিনি আনাকে স্বী হিসাবে অর্পণ করবেন
তোমার হাতে।
- ৪২২। ভেবেছ কি
ভিক্ষাপাত্র হাতে পরিহৃত ব্রাহ্মণের নভে
তোমার পিতার কাছ থেকে
তোমাকে আমি দান গ্রহণ করব?
বান পুরুষদের সন্তানরা বিবাহের এ পন্থা জানে না,
তিনিচরী রাজপুত্রদের ঔরসজাত যাত্রা
তাদেরও বিবাহ-রীতি এরকম নয়।
স্বর্গকে পুরোহিত রেখে,
দল্লের সঙ্কটকে বহুরূপে জেনে
পরিণব-বহ্নন রচিত তাদের;
কিহা সমস্ত শত্রুযুদ্ধের মধ্যে থেকে
সংগতি সবেও বাধাদানরত ব্যক্তিকে
আকাঙ্ক্ষিত বাহুবলের জোরে ছিনিয়ে আনে জাতি।
আমি তোমার পাণিগ্রহণ করব এই ব্রকমেই, বাদবদন্তা;
এই ব্রকমেই তোমাকে নিরে যাব বাহুবলে
শত্রুর গৃহ এবং নগরীর বাহিরে,
বিপক্ষ তোষণ সব ভেঙ্গে ভেসে করে।

এক সুদীর্ঘ চুথনে আবদ্ধ করে দেব তোমার গঠাধর,
 বুধা ত্রাসের আপত্তি ।
 তাকলে তোমার হৃদয়কে এখন স্বয়ং বলতে দাও আনন্দের বার্তা
 গুণে বাসবদত্তা !

বাসবদত্তা । আমাকে নিবে যা ধুলী তোমার কর,
 আমি যে তোমারই ।

[ক্রমশঃ]

তৈত্তিরীয় উপনিষদ

ব্রহ্মানন্দ বসী

[ঐশ্বর্যবিশেষ শিক্ষা প্রদানার্থে অধ্যাপক ও বিদ্বতি]

ঐশ্বর্যবিশেষ কান্ত সেন

প্রথম অনুবাক

৩। তিনি যেন আমারে পূজনকে (১) সমভাবে বলা করেন, সমভাবে আমারে গৃহণ করেন। (আমারে সব পুষ্টি, অস্তিত্ব যেন তিনিই পনিচালিত করেন)। সমভাবে যেন আমার বীৰ্য লাভ করতে পারি। আমারে অধীত বিদ্যা যেন ত্রেতাযুগ (ঐশ্বর্য ও বক্তৃত্ব উদ্ভাগিত) হয়। আমার যেন কোন ঘেঁষা পোষণ না করি। ঐ শাস্তি, শাস্তি, শাস্তি।

৪। দুইদিন পরোপকারে লাভ করেন। এ বিষয়ে বলা হয়েছে, দুই সত্য-জ্ঞান-মনস্তত্ত্বরূপ। সত্যের জন্য ওদ্যতে নিহিত, জীবের অস্তিত্বের পন্থা আকাশে, তিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি সব কামানন্দ ভোগ করেন, সর্বত্র ব্রহ্মের সঙ্গে মিতা বাস করেন। (২)

এই সেই আত্মা, যা থেকে আকাশ স্রষ্ট হয়। আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে ওষধি, ওষধি থেকে মনু, মনু থেকে পুরুষ। এই যে মানব ব্যক্তি সে অনেকের বলে গঠিত। (৩) (ওষধি দেখিয়ে বলাছেন) এই-ই হ্রাস নির, এই হ্রাস সন্ধিগ দিক, এই বান দিক, এই হ্রাস আত্মা, (ব্রহ্মজাগ, জগত)। এই হ্রাস নিম্ন-জাগ (পৃষ্ঠ)। হ্রাস উপর সে প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে—

দ্বিতীয় অনুবাক

“মনু থেকেই হ্রাস হ্রাস পৃথিবীকে আশ্রয় করে বর্তমান আছে যত প্রকার বা জাতীয় জীব সে সবই। জন্মের পরে প্রাণ ধারণ করে অনেকের দ্বারা, পরিশেষে অনেকেই প্রত্য-বর্তন করে। কারণ, মনুই হল সব সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে অগ্রভাত। তাই তাকে বলা হয় সর্বেশ্বর, সবার ত্রেতা বা পৃষ্ঠের আশ্রয়।” অনুরূপী ব্রহ্মকে যে জানে সে অবশ্যই সর্বভাবে অনেকের উপর প্রভু প্রাপ্ত হয়। মনুই সৃষ্টপদার্থের মধ্যে অগ্রভাত। তাই তাকে সর্বেশ্বর বলা হয়। মনু থেকে প্রাণীরা জাত হয়, জাত হয়ে সব জীব অনেকের দ্বারা বধিত হয়, সবাই মনু ভক্ষণ করে আবার মনুই সব সৃষ্টপদার্থ গ্রাস করে। (৪) তাই তাকে মনু বলা হয়।

এই অনুন্নয় আত্মার অন্তরে আছে আর এক আত্মা, সে প্রাণবয়। তার দ্বারা এই অনুন্নয় সত্তা পূর্ণ। (৫) এই প্রাণবয় সত্তার আকারও পুরুষের ন্ত। অনুন্নয় সত্তার আকারের অনুরূপ করে তার আকার গঠিত : মধ্যপ্রাণ তার শির, (সর্ববেদব্যাপী) বায়ু তার দক্ষিণ পার্শ্ব, (নিম্নগামী) অপান বামপার্শ্ব, আকাশ তার আত্মা, পৃথিবী তার নিম্নভাগ, তার উপর সে প্রতিষ্ঠিত। (৬) এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে—

তৃতীয় অঙ্কশ্লোক

“সেবতার্য প্রাণকে অনুগমন করে (অর্থাৎ প্রাণের অধীনে) বাস করেন, নিশ্বাস নেন ; সব মানুষ ও পশুও তাই করে। কারণ, প্রাণই সব সৃষ্ট জীবের আত্মা, সেই জন্য তাকে সর্বাঙ্গ (বা বিশ্বায়, নিশ্বাস প্রাণবয়) বলা হয়।” প্রাণরূপী ব্রহ্মকে যে জানে সে অবশ্যই সর্ব আত্ম প্রাপ্ত হয় (বা সর্বতোভাবে আত্ম উপর প্রভু লাভ করে)। প্রাণই সর্বজ্ঞের আত্মা, সেই জন্য প্রাণকে সর্বাঙ্গ বলা হয়। আর এই প্রাণবয় আত্মাই হল পূর্বোক্ত শারীর সত্তার আত্মা।

এই প্রাণবয় আত্মার অন্তরে আছে আর এক আত্মা, সে মনোমান। তার দ্বারা এই প্রাণবয় আত্মা পূর্ণ। এই মনোমান আত্মার আকারও পুরুষের ন্ত, প্রাণবয় সত্তার আকারের অনুরূপ করে তার আকার গঠিত : মনুঃ তার শির, ঋক্ নহ তার দক্ষিণ পার্শ্ব, সানধান তার অপর পার্শ্ব, উপ আত্মা হল ভাগবত প্রত্যাক্ষেণ, অপর ও অস্তিত্ব স্বহিতের ন্ত (বা অপর-বেদোক্ত ন্ত) তার নিম্নভাগ, তার উপর সে প্রতিষ্ঠিত। (৭) এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে—

চতুর্থ অঙ্কশ্লোক

“ব্রহ্মের যে মানস লাভ করতে অক্ষর হয়ে ব্যাক্য নিবর্তিত হয়, মন ও বিকল হয়ে ফিরে আসে, সেই আনন্দকে যে জানে সে কখনও ভীত হয় না।” আর এই মনোমান আত্মাই স্বেদে পূর্বোক্ত প্রাণবয় সত্তার আত্মা।

আবার এই মনোমান আত্মার অন্তরে আছে আর এক আত্মা, সে বিজ্ঞানবয়। এই বিজ্ঞানবয় আত্মার দ্বারা মনোমান আত্মা পূর্ণ। এই বিজ্ঞানবয় আত্মার আকারও পুরুষের ন্ত, মনোমান সত্তার আকারের অনুরূপ করে তার আকার গঠিত : শ্রুত তার মস্তক, ঋত দক্ষিণ-পার্শ্ব, সত্তা অপর পার্শ্ব, যোগ তার আত্মা, নহ; তার নিম্নভাগ, তার উপর সে প্রতিষ্ঠিত। (৮) সে বিষয়ে এই শ্লোক আছে—

পঞ্চম অঙ্কশ্লোক

“বিজ্ঞান ব্রহ্মোৎসবের ব্যাপকতা সাধন করে, কর্তব্যোৎসবেও ব্যাপকতা আনে। সব

সেবতান। বিজ্ঞানকে যুক্তরূপে এবং বিশ্বে প্রাধান্যত জ্ঞাপে উপাসনা করেন। বিজ্ঞানজগৎ বুদ্ধকে যে জানে আল সে জান থেকে যে বিচ্যুত না হয়, সে এই লেহ ধারণ করেই সব পাশ থেকে মুক্ত হয় এবং সকল কান্যবস্ত উপভোগ করে।” (৯) আর এই বিজ্ঞানবর আত্মাই লেহে পূর্বোক্ত মনোনিয়ম সত্যের আত্ম।

আবার এই বিজ্ঞানবর আত্মার অন্তরে আছে আর এক আত্মা, সে মানসনয়। তাঁর দ্বারা এই বিজ্ঞানবর আত্মা পূর্ণ। তাঁর আকারও পুরুষের মত, বিজ্ঞানবর আত্মার অনুরূপ করে তাঁর আকার গঠিত : প্রিয় বা প্রেম তাঁর মস্তক, হৃদয় তাঁর হৃদয় পাশ্ব, সত্যোপ অপর পাশ্ব, আনন্দ তাঁর আত্মা, বুদ্ধ তাঁর নিম্নভাগ আর উপর সে প্রতিষ্ঠিত। (১০) এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে—

ষষ্ঠ অধ্যবাক

“বুদ্ধকে অসৎ, তেতি বা নাস্তি বলে যে জানে সে ‘অসৎ’, শাস্তি-অতিরিক্তীন, হয়। আর, বুদ্ধ মাতেন এইভাবে জানে যে, তাঁরপর তাকে সবাই মাধু মনে’ বা নাস্তির ভাবনে সত্যানুরূপ বসে, পরনের সঙ্গে একাত্ম বলে জানে।” আর এই আনন্দবর আত্মাই এ লেহে পূর্বোক্ত বিজ্ঞানবর সত্যের আত্ম।

তাঁরপর প্রশ্ন ওঠে বুদ্ধজ্ঞান আর লাভ হয়নি, পরলোকে গমন করবার পর তাব আরও অগ্রগতি হয় কি? অথবা পক্ষে, বুদ্ধজ্ঞান ব্যক্তির পরলোকে গমন করবার পর কান্যভোগ লাভ হয় কি?

সেই পরম আত্মা কান্য (১২) করলেন, “আমি বস্তু হয়, প্রজ্ঞাফলি করব।” তিনি উপাস্য করলেন, (চেতনার শক্তিকে একাগ্র করলেন) (১৩) এবং সেই উপাঃশক্তিতে এই সব সৃষ্টি করলেন, এই যা কিছু আছে সবই। এমন সৃষ্টি করে তিনি তাতে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে তিনি হলেন সৎ ও ত্যাং (এখানে বা বিদ্যমান আছে এবং এখানে বা কিছু থাকবার সত্যাবস্থা আছে), যাব স্তিমিষ্টি মানরূপ আছে এবং নামরূপে আর সত্যোপ দেওয়া যায় না, যাব লেহ আছে এবং যাব কোন অধিষ্ঠান নাই, বিশেষ জ্ঞান এবং অজ্ঞান, সত্য ও মিথ্যা। হী, তিনিই হলেন সব সত্য, এই এখানে যা কিছু আছে, সবই। সত্যতাঃ তাঁকে সত্য আখ্যা দেওয়া হয়। এদিকের এই শ্লোক আছে

সপ্তম অধ্যবাক

- “আগে এই বিশ্বের অস্তিত্ব ছিল না, অব্যক্ত ছিল, তা থেকেই বাস্তব অস্তিত্ব তাত হয়েছে। জা’ আত্মা নিজেই নিজেই সৃষ্টি করল (আর কেউ করেনি)। সেইজন্য তাকে ‘স্বকৃত’ বলা হয়।”

হী, সত্যই তা শোভন ও সুহৃৎভাবে করা হয়েছে। তার কারণ, তিনি সবব্রহ্মপ (সব অস্তিত্বের পশ্চাতে অবস্থিত নিত্য আনন্দ)। জীব যখন সে রাসের দ্বাশ পায় তখনই বিশ্ব আনন্দের বলে মনে হয়। কারণ, নিখুঁত-পুখুঁত বেবার কষ্ট কে করত যদি তার অস্তরে জ্বরাকারে এই আনন্দ না থাকত ? আনন্দের উৎসই হলেন তিনি। যখনই জীব এই অদ্বন্দ্ব অপরীক্ষিত অনির্বচনীয় নিরাধার নিত্য বস্তুতে নিতীকভাবে লুপ্ত আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন সে সব ভয় অতিক্রম করে। যখনই জীব তাঁর মধ্যে সারানো নাত্রও প্রবেশ করে, তখনই তার ভয় উপশিত হয়। ঠা, এই নকর যখনহীন জ্ঞাতার পক্ষে সেই শ্রুত ভয়ের কারণ হন। এনিম্নরে এই শ্লোক আছে—

অষ্টম অনুবাক

“তাঁর ভয়েই বায়ু প্রসারিত হয়, তাঁর ভয়ে সূর্য উদ্ভিত হয়। তাঁর ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চন দেবতা, বৃদ্ধা, স্বর্গার্যে শ্রুতী হয়।”

সে আনন্দের বিচার চল এই :

যর, একজন মনুষ্যপুরুষ আছে, চরিত্রবান্, তরুণ বয়স, অধ্যয়ননিষ্ঠ, তরু শিষ্ট প্রকৃতি, মেহে মনে যত্ন, বলিষ্ঠ। তার অধিকারে যদি বিত্তপূর্ণ সবগ্র পুণ্ডরী আসে, তাহলে সেই হল মানুষের আনন্দের এক পূর্ণমাত্রা। তার শতগুণ হল যে মানুষ কর্ণের দ্বারা শব্দবলোক অর্জন করেছে তার আনন্দের পূর্ণ এক মাত্রা। আর সে আনন্দ পায় কানদ্বারা কনুযনুজ বোধে। মনুষ্যগন্ধর্বেণ আনন্দের শতগুণ হল দেবগন্ধর্বেণ আনন্দের এক পূর্ণ মাত্রা। আর, সে আনন্দ পায় অকানহত বোধে। দেবগন্ধর্বেণ আনন্দের শতগুণ হল চিরকাল স্বর্গলোকবাসী পিতৃ-গণের আনন্দের এক পূর্ণ মাত্রা। আর সে আনন্দ পায় অকানহত বোধে। চিরস্বর্গলোকবাসী পিতৃগণের আনন্দের শতগুণ হল স্বর্গলোক জাত দেবতাগণের আনন্দের এক পূর্ণ মাত্রা। আর সে আনন্দ পায় অকানহত বোধে। স্বর্গলোকজাত দেবতাদের আনন্দের শতগুণ হল শুভ কর্ণের দ্বারা যারা দেবদ অর্জন করেছে তাদের আনন্দের এক পূর্ণ মাত্রা। আর, সে আনন্দ পায় অকানহত বোধে। কর্মদেবগণের আনন্দের শতগুণ হল (প্রধান) দেবতাদের আনন্দের এক পূর্ণ মাত্রা। আর, অকানহত বোধে সে আনন্দ পায়। এই দেবতাদের আনন্দের শতগুণ হল ইন্দ্রের আনন্দের এক পূর্ণ মাত্রা। আর সে আনন্দ পায় অকানহত বোধে। ইন্দ্রের আনন্দের শতগুণ হল বৃহস্পতির আনন্দের এক পূর্ণ মাত্রা। সে আনন্দও হয় অকানহত বোধে। বৃহস্পতির আনন্দের শতগুণ হল প্রজাপতির আনন্দের এক মাত্রা। সে আনন্দও হয় অকানহত বোধে। প্রজাপতির আনন্দের শতগুণ হল ব্রহ্মের আনন্দের মাত্রা। সে আনন্দও হয় অকানহত বোধে।

এখানে মানুষের মধ্যে যে পুরুষ, আর ওই সূর্য্যের মধ্যে যে পুরুষ, সে একই। এ তর

যে জানে সে এই লোক খেলে প্রাণের ক'রে, এই অনুরথ আত্মাতে থমন করে, এই প্রাণের
আত্মাতে থমন করে, এই মনোময় আত্মাতে থমন করে, এই বিজ্ঞানময় আত্মাতে থমন করে,
এই আনন্দময় আত্মাতে থমন করে । (১৪) এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে—

নবম অধ্যায়

“বুদ্ধের সে আনন্দ না পেয়ে বাক্য ফিরে আসে, মনকে সঙ্গে নিয়ে, সেই বুদ্ধের আনন্দ
যে জানে সে কোন বস্তু থেকে ভয় পায় না ।” তার এ অনুভূতি হয় না যে, “কেন সাধু কর্তৃ
করিণি, কেন পাপ কবলান” । কারণ যে বুদ্ধকে এভাবে জানে সে পাপপুণ্য কি তা জানে,
তার আত্মাকে পাপপুণ্য উভয়ই হল অগাধ । হাঁ, বুদ্ধকে যে এভাবে জানে সে পাপপুণ্যের
বন্ধন জানে, এবং পাপপুণ্য দুই-ই তার আত্মাকে প্রীতি ও পুষ্টি করে । এই হল বেদের গুচুবিদ্যা ।

পাণ্ডিপাঠে—তিনি আনন্দের দুজনকে সনভাবে বন্ধা করুন, সনভাবে প্রদান করুন,
সনভাবে যেন আনন্দের বীজ লাভ করি । আনন্দের অধীত বিদ্যা যেন হেতুভাব হয় । আনন্দ
যেন যেষ পোষণ না করি । ও পাণ্ডি, পাণ্ডি, পাণ্ডি ।

মন্তব্য

১। গুরুশিষ্য দুজনকে । সব বিদ্যাতেই গুরু যিনি বিদ্যাদান করেন এবং শিষ্য যে
গ্রহণ করে তাদের মধ্যে যতদূরশিষ্টা প্রয়োজন, আর যখনই শিক্ষা ও সাধনাতে তাদের নিবিড়
অন্তরঙ্গতা প্রয়োজন । তাই প্রাণনা উভয়ের জন্য ।

২। এই অনুচ্ছেদে সবারে গ্রীষ্মবিশ্ব বলাচ্ছেন, (‘উপনিষৎ প্রসঙ্গে গ্রীষ্মবিশ্ব’ পুস্তকে)—

বুদ্ধ কি ? অস্থিরতা নশা যা সমস্ত, যাকে অবলম্বন করেই আর সবার অস্থির, অনিভ্যের
পশ্চাতে যা নিত্য, সাধনামোদ পশ্চাতে সব বিকাশের আশ্রয় যে অগাধ দিব সত্য সেই অজ্ঞাতই
বুদ্ধ । আনন্দের সাধনামোদ : নিভ্যের যা বনে করি, বিচার বিশ্লেষণের কলে বিশ্বকে যা
বনে হয় এবং কর্তব্য সীমা ও সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য যা ভাবি, তার চেয়ে বেশী কিছু আছে, সেই
পরামর্শ, সেই সর্বময় । তাকে জেনে, সেই জানে বিশ্বকে জানাই হল পরামর্শকে জানা ।
কারণ সেই হল সবার উদ্ভব ও উপাদান আর তাঁর কাছে নিভ্যকে সম্পূর্ণ নিবেদন করেই হয়
সবার সার্থকতা । সে অজ্ঞাতকে জানা যায়, আর তাকে জানলে সে জানেন কলে জ্ঞাতের
সত্তার বিলয় হয় না, সাধিত হয় সত্তার পূর্ণতা ও সার্থকতা । সীমার দ্বারা তিনি নিভ্যকে
নিষ্কপিত করেন বলেই আনন্দের তাকে জানতে পারি, আর সে জানেন বন্ধন হল পণ্ডি, নিভ্যের
সত্তাকে রূপান্তরিত করবার নির্ভয় ; আর আনন্দের সত্তার উৎকর্ষ হল বর্তমান সীমাবদ্ধ
যা ত্র্যম্বক ও উদ্দেশ্য তার চরম সার্থকতা, তবে তাঁর চিরন্তন প্রেরণ আনন্দেও ।

এখন আনন্দের অজ্ঞানে মাস করি,—নিজেদের প্রকৃত সত্তাকে জানি না, বিশেষভাবে জানি না, তাই বিশৃঙ্খলভাবে মাসনা যত্নান। তবে সে অজ্ঞান সত্তার বিকৃতি নাত্র,—খণ্ডিত প্রতিবিম্ব, একবারে ভিত্তিহীন নয়। সর্দীর বাহাদুরের ও নিম্নতর জীবনের সম্বন্ধই আনন্দের বাধা। মনস্তত্ত্ব জীবনের জন্য ছাড়া মনস্তত্ত্বের জ্ঞান, অস্তরের জ্ঞান, পরাংপরের জ্ঞান। সেই জ্ঞানের আনন্দকে ব্রহ্ম বিদ্যা বলে। আত্মের স্বরূপ-সত্তার রূপায়ণ বলে বাহ্য-পর্যায়কে দেখেন, অন্তর্যায়ের দৃষ্টি নিয়ে সর্দীরকে দেখেন। সুতরাং তার সত্তা হয় প্রকাশ্য, অন্তর্যায়, জীবনে তিনি হল আত্মকাম। আবার ব্রহ্মের জ্ঞানে মনস্তত্ত্বের নীতি চেতনা ও আনন্দের সত্তাবোধের দ্বারা উন্মুক্ত হয়, সেজান অবিদ্যাত হলে সত্তা হলে সে সত্তাবোধ সিদ্ধ হয়। আনন্দের বহুতর সত্তা হল নীতি-চেতনা-আনন্দের পরাকাষ্ঠা আর ব্রহ্মবিদ্যা তা নাত্র করেন। 'ব্রহ্মবিদ্যা আনন্দের পরঃ'।

পরম সত্তা সত্তার অতীত কৈবল্যাবস্থা নয়, বিচিত্ররূপে তিনি নিজেদের অভিব্যক্তি করেন। পরাংপরই অনন্ত পুরুষ। সর্বময় বিরাট সে আনন্দের অস্তিত্ব। পরাচেতনা তিনি নাত্র করেন সত্তাতেও তিনি অনন্ত হল, নিজেদের মধ্যে তিনি বিশৃঙ্খল মাসনা করেন। তাই বলা হল, তিনি সত্তা-জ্ঞান অনন্ত-স্বরূপ। তাকে জানতে হল প্রকাশ্য-সত্তা। তার কন্যা, বাস্তব জীবনে উৎকর্ষিত সত্তার উপলব্ধির দ্বারা সকল কামনার পরিপূর্ণতা, এবং আত্মসং-সিদ্ধির আনন্দে ব্রহ্মের সাত্ত্বিক বা সাত্ত্বিক নাত্র। তার বাধা হল জ্ঞানের তত্ত্ব, সে প্রজ্ঞার দ্বারা তিনি সর্বলোকের সর্বভূতের মধ্যে নিজেদের জানেন, 'সত্তা ব্রহ্মবিদ্যা নিপতিত'। সত্তার আনন্দেই ব্রহ্মের কামাবস্থা মধ্যে আনন্দের যা চাই সে সত্তার সত্তারূপ সম্পূর্ণরূপে নাত্র করবার আনন্দ। সে আনন্দের জন্য কি প্রয়োজন তা জানবার কথায় এবং বিজ্ঞ ও পূর্ণরূপে সে আনন্দ নেবার অনন্ত সার্বভৌম একমাত্র পথই পরম প্রজ্ঞারই আছে।

Paul Deussen বলে করেন 'অনন্ত' আনন্দের সত্তার চিত্রাঙ্কন প্রাচীনকালের স্মৃতি-প্রবাহ, 'আনন্দ' বলে। বোধ্য দ্বারা তিনি অনন্ত সত্তার সাত্ত্বিক ব্রহ্মের পানে নি। কারণ, মানুষের মন সত্তার সাত্ত্বিক রূপে চিত্রাঙ্কন বিজ্ঞ আনন্দের দ্বারা করিতে পারে না। কিন্তু "ভূতের স্বপ্ন", হাশোখের অতি পরিচিত কথা। আর শ্রীঅবিনাশ ও বনেন্দ্র, "চিন্তার সত্তার পরাকাষ্ঠা হল-তারি নিরন্তর আনন্দ-সত্তা। এখানে উচ্চতা আর বিশেষের সাত্ত্বিক একই। নিরন্তরতা আনন্দের পরাকাষ্ঠা—সমস্তের মাঝেই আছে সত্তা-সত্তা ও আনন্দের বাধা।" (দ্বিতীয় জীবন, প্রথম ও, একাদশ অধ্যায়, অনির্বাক্যের অনুবাদ—পৃ ১০৯)।

দ্বিতীয় জীবন উল্লেখ সব উপনিষদেই আছে, গীতাতেও আছে। এ বিষয়ে শ্রীঅবিনাশ বলেছেন সাত্ত্বিকতাতে (৭ম পর্ব ৩য় সর্গ)

O human copy and disguise of God
Who seekest the deity thou keepest hid

Follow the world's winding highway to its Source.
There in the silence few have ever reached,
Thou shalt see the Fire burning on the bare stone
And the deep cavern of thy secret Soul.

১। জড়ের আকারে শক্তির রূপধারণের কথা 'দিব্য জীবনের' প্রথম ৮ঃ প্রীঅরবিন্দ বলেছেন. "প্রাচীন ভারতের জড়বিজ্ঞানীরা জড়শক্তির আদিপর্বে দেখেছিলেন আকাশ-রূপে, মহাবায়ু সেই শক্তির শুদ্ধ সম্ভারস্বরূপ হইল যার স্বরূপ ; কল্পন তার বিশেষ গুণ, আবার চৈতন্য বা কোটো শব্দের আকারে। কিন্তু শুধু আকাশের কল্পনে রূপস্বষ্টী সম্ভব নয়, তার জন্য শক্তি-সমূহের নির্বাণ প্রয়োজ্য চাই একটা প্রতিমিত, যাতে তার বৃক ভাগবে আকর্ষণ-বিকর্ষণের সংকোচ।...এমনি করে জড়শক্তি আকাশভূত হতে পরিণত হইল যে ভূতে, প্রাচীনরা তাকে বলতেন বায়ুভূত, শক্তির সঙ্গে শক্তির সম্প্রযোগ তার বিশেষ গুণ।...এবার চাই রূপস্বষ্টীর একটা আকার। আশাশক্তি তাই ত্রৈলোক্যভূত হয়ে পৌঁছল আত্ম-বিপরিণামের তৃতীয় পর্বে—আনন্দের কাছে তার বিশিষ্ট রূপ ফুল আনোকে, তাপে, পারিকাপকিতে।... চতুর্থপর্ব এক আকর্ষণ-বিকর্ষণের একটা স্থানীয়ত মাত্রা নিয়ে তরলিত বিচ্ছুরণের আকারে, 'অণু' নামের মাঝে যার উপরিত রেখেছেন প্রাচীনরা। যবার শেষে পঞ্চম পর্বে অপের সংসক্তি থেকে দেখা গিল পৃথিবীভূত বা কাঠিন্যধর্ম। এমনি করে পঞ্চভূতে সমাপ্ত হইল শক্তি-বিপরিণামের সীমাগণ।" (অনির্বাণের অনুবাদ—পৃ ৯৫)

অণুই বিশেষ প্রথম জড়। ঐতর্যের উপনিষদে আছে, লোক ও লোকপাল স্বষ্টির পরই হইল অণু স্বষ্টী। 'সাবিত্রী'তেও প্রীঅরবিন্দ জড়কে বলেছেন, First born of created things.

'অণু' বল্য এসেছে আভ্যাত্মিক অণু হাভু থেকে।

'এমনি' শব্দের আকরিক অর্থ, যাতে ওষু বা তেজ আহিত হয়, তাপেকে হয়েছে শস্যাদি, পৃষ্ঠির উপাধান। 'The Green stuff of the Universe' পরেছেন প্রীঅরবিন্দ। পোন বা দিব্য আনন্দের রস তাতেই নিহিত আছে।

বায়ু মহানবর সত্তা হলেও জড় বিশেষ প্রথম পৃষ্ঠিতে অণুর বা জড় রূপকেই একবার সত্যস্ব বলে মনে করে, তার উপাধনাতে জড় অগভের উপর প্রভুত্বলাভ হয় ; পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানীর সাক্ষ্য তার নিদর্শন।

৫। বিশেষ সবই চিন্তাসত্তার অভিযুক্তি। বেহ-প্রাণ-মনের অস্ত্রান লোক ও চিন্তাবয়েরই রাজত্ব, তবে চিন্তা সেখানে নানরূপে আচ্ছাদিত। পৃষ্ঠিকে অতর্নুখী করে এখানে হাণু শুদ্ধ সত্তাকে কেনেছেন আবারের শেষের অনেক সাক্ষ্য বহুজীবনব্যাপী প্রয়ানের ফলে। কিন্তু জ্ঞান-শক্তি-আনন্দের সক্রিয় অভিযুক্তিতে অংশ গ্রহণ করা স্বচিন্তা কদাচিৎ সম্ভব হয়েছে, তাও আংশিক ভাবে। এ উপনিষদে সেই সাধনার নির্দেশ সেওটা হয়েছে।

এই তড় লোকের উপরে আছে প্রাণ-মন-বিজ্ঞান-আনন্দের লোক। প্রত্যেক ভগতে পুরুষ প্রকৃতির, জাত্য আত্মা ও জ্ঞেয় বিশ্বশক্তির, যথো চিন্ময় মস্তিষ্ক ব্যাধিত সম্বন্ধের দ্বারা নিরুপস্থিত হয় আলোকের মূলতত্ত্ব ও বিন্যাস-বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক লোকেই মূলতত্ত্বের যথো অপর সব তত্ত্বও অনুমূর্ত্ত আছে। আর বাষ্ট্র পুরুষের গঠন হ'ল প্রত্যেক লোকের বিশ্বের গ্রহণের উপযোগী জ্ঞানশক্তি নিয়ে, সেই লোকের উপাসন দিয়ে, এবং তার যোগসীমার নীচে প্রচলিত থাকে অপর সব লোকের পুরুষশক্তি,—যেন এক কোণের অভ্যন্তরে আর সব কোণ। সেই পুরুষকোণের কথা বলা হয়েছে এ উপনিষদে। শক্তির এক স্তর থেকে উপরের জ্বরে উন্নীত হয়ে সেই স্তরের বিশ্বের সঙ্গে এবং বিশেষত্বের পুরুষ-প্রকৃতি উভয় ভাবের সঙ্গে একত্ব উপলব্ধি করা, নিম্নতর স্তরের কার্যকলাপ বর্জন না করে উর্ধ্বতর চেতনার আলোকে পুনর্বার নূতন মূল্যায়নের অঙ্গুক্রমে হৃদিন্দ্রিয় কল্পাই হল এ উপনিষদের সাধনার ধারা। এই ক্রমপরিণতির ফলে আত্মপ্রসারণ ও আত্মত্যাগের সাধিত হয়ে ক্রমে দিব্যজীবন লাভ হয়, প্রত্যেক জ্বরে পরম জ্ঞান-শক্তি-আনন্দের সক্রিয় অংশ বেশী বাতায় নেওয়া যায় এবং পরিশেষে আনন্দলোকে পরমের পূর্ণ আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়। এই হল এ উপনিষদের ব্যাপক শিক্ষা, ধর্মোপদেশ এটী একটী কথা। তার স্বরূপ শ্রীঅরবিন্দ বিবৃত করেছেন On Yoga গ্রন্থে, জ্ঞানযোগের The Ladder of Self Transcendence নামক অধ্যায়ে। সেখান থেকেই ১ম থেকে ৯ম পর্যন্ত মন্তব্য বহুলাংশে গড়ানিত হয়েছে।

৬। “বিশুদ্ধিতে আছে এক প্রাণ, এক বহাশক্তির উচ্চতরলীলা, জড়ের দিকটা তার মূলতম স্পন্দন নাকি।...প্রাণই ফুটেছে বাটির পৃথিবী হয়ে, সেই বাটির নুকে তরলতা হয়ে, আবার পৃথিবীতে বেঁচে আছে যে ভীষণোক্তি, তরলতা বা পরম্পদের প্রাণশক্তিকে আত্মসাৎ করে, তারাও সেই প্রাণেরই বিচিত্র বিভূতি।” (‘দিব্যজীবন’, প্রথম খণ্ড, অনির্বাণের অনুবাদ, পৃ ২০৭)

প্রাণলোকে বাষ্ট্রসত্তা হয় প্রাণময় পুরুষ, প্রাণভগবতের উপাসন দিয়ে গঠিত। তার নিম্ন মুখাপ্রাণ বা বিশ্বশক্তির সঙ্গে আসন প্রদান করে, পুষ্ট, বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যই না আর দেয়। দুই পক্ষ, অসান ও ব্যান তাঁরাবিশেষ পরিত্যাগ করে এবং সব লেহ বোম্পে বোম ও কর্ণ-প্রবেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সাধন করে আত্মা, আকাশ সব প্রাণক্রিয়ান সমস্তা বিধান করে ও ক্রিয়ার অবকাশ দেয়, প্রতিষ্ঠা পৃথিবী বা লেহ ও জড়বিশ্ব।

সেহতা, অর্থে ইন্দ্রিয়, জ্ঞান ও কর্ণের শক্তি বা আনন্দের আলোর দিকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়, কাম করে প্রাণ শক্তির আশ্রয়ে, প্রাণের দ্বারা বহু সৈনিক বস ও আত্মর করণ দিয়ে।

যোগসীমার নীচে অবস্থিত এই জ্বরের সঙ্গে যোগের দ্বারা গঠিত হল বিশ্বময় প্রাণশক্তিকেই পরম বস্তু বলে বসে হয়। সে উপলব্ধিতে অভিজ্ঞতার প্রসার অনেক বাড়ি, চিন্ময় বিশ্ব-বস্তু ক্রিয়ার সাক্ষ্য জ্ঞান লাভ হয়, সেহব্যতিরিক্ত জন্মমৃত্যুর অতীত প্রাণপুরুষ বলে নিজেই সম্বোধিত প্রত্যেক জানা যায়।

৭। প্রাণরূপাত্মক পঞ্চাশত ননোত্তমঃ সত্ত্বৈব আদিকারণেন যানঃ কাশে, ওহ জাম্ববাননপ্রকৃতিতে তা রূপাশিত। বিশ্বেশ্বর সেখানে ননোত্তম, তবে শুধু মুক্তি-বুদ্ধি যাত্রা তা সীমিত নয়, সংবাদি ও অধিবাসন পর্যন্ত তার বিস্তৃতি। তার জ্ঞান ও কর্মশক্তি আনন্দের কল্পনার অতীত। বাস্তবতা সেখানে "প্রাণপরীরমেনতা" ননোত্তম পুরুষ। ননোত্তম ব্রহ্মের উপলব্ধি হলে মানুষের জীবন অনেকাংশে শ্রাব্য দিব্যজীবনে পরিণত হতে পারে। কিন্তু পূর্ণ অধ্যায়জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় না।

উর্ধ্বাশী জীবের সাধনার প্রধান উপায় হল আত্মসমর্পণ, আত্মর ও বাহ্য বস্তু। ভাই ননোত্তম পুরুষের শির হল বস্তু, যাতে বস্তুর বিধান বেশ, সব বুদ্ধি সব কর্ম ভগবানে অর্পণই তার নর্থ। স্বর্গ ও মান যথাক্রমে আধ্যাত্মিক ও আত্মিক অভিজ্ঞতার প্রকাশ, যে বস্তুর উপর নন সমাধিত করতে হবে এবং সত্ত্বাত্মের দ্বারের আবর্তপতিতে আরাধ্যদেবতার সান্নিধ্য ও সাক্ষ্য অর্জন করতে হবে। এই হল দুই পাপু। অর্পণ ও অস্তিত্ব স্বীকার বস্তুর পূর্ণ প্রত্যক্ষ করেছেন, এবং অর্পণ বলে মন্ত্র চাড়া পুত্রেদের করণীয় সব কর্মে ভগবানকে সমর্পণ করার মন্ত্র ধরা হয়েছে, সেই হল প্রতিষ্ঠা। তার আত্মা হল আদেশ, প্রত্য্যামেশনলক সাধনার ধারা ও সত্যের বিস্তৃতি।

৮। 'বিজ্ঞান' অর্থে সমগ্র জ্ঞান, যুগপৎ এক ও বহুর জ্ঞান, সে জ্ঞানে প্রত্যক্ষ হয় যে বস্তু একেরই বিস্তৃতি, ব্যবহারিক সম্বন্ধে ও নিত্যই বহুর প্রত্য্যাকেন নথ্য একের অস্তিত্ব, একের নথ্য বহুর অস্তিত্ব, আর এক ও বহুর স্বরূপ অত্রে সাক্ষ্য বোধগম্য থাকে, সত্য ঋত ও বৃহত্তের অনন্ত একোত্তা একত্ব। সেট হল দিব্য অস্তিত্ব, তাকে শ্রীযদবিল অতিমানস বলেছেন।

আবার বলেছেন, অতিমানস হল ঋতচিৎ, সত্যাপ্রতি প্রজ্ঞা এবং চিৎপতির অনোষ কর্মসামর্থ্য। এই হল সত্ত্ব-পুরুষ ভগবানের চেতনা। তার যাত্রা তিনি নিজে স্বরূপ ও বিশ্বে অতিবাস্ত সত্যকে জানেন। প্রত্য্যাক বাস্তব বিশ্বের আশ্রয় ও আত্মা, বিশ্বে সত্যরূপ এবং সচিৎসামান্য, সবই সে প্রত্য্যাক জানতে পারে, কারণ সবই সেই তৎস্বরূপ — "সর্বং পল্লিং ব্রহ্ম"। নন হল অজ্ঞানের সত্ত্ব কিন্তু অতিমানস স্বরূপত জ্ঞানের বুদ্ধি, স্বতঃই জ্ঞানের অবিকারী, কারণ তার দৃষ্টিতে জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয় অস্তিত্ব; তাই সব পদার্থকে সে বেশে নিজেই সত্ত্ব, পরমায়া থেকে বা অস্তিত্ব, তার আলোকে। তার ক্রিয়া-শক্তিও স্বতঃপ্রসূত। অতিমানসলোকে তা সাক্ষ্যভাবে আলোক ও সত্যের তথ্য সত্ত্ব করে, সবই পরবের একর ও স্বধনার উপর প্রতিষ্ঠিত, অজ্ঞান আবরণ থেকে মুক্ত। আনন্দের জ্ঞান সে-প্রাণ-বনের অজ্ঞান তথ্যের উপরে তা অবস্থিত, কিন্তু তা বিশ্বাসীত নয়। বিশ্বে তা প্রচ্ছন্ন আছে এবং অতিবাস্ত হবে। (On Yoga II, P. 264)

কোন কোন নতে বিজ্ঞান অর্থে বুদ্ধি, বুদ্ধিবিচারে সত্য নির্ধারণের বা বিশ্লিষ্টের ক্ষমতা, ধরা হয়েছে। সে সব নতে এই বুদ্ধির দ্বারের অবাধিত পড়েই আসে ওহ আত্মার চেতনা। কিন্তু বুদ্ধির জন্যই যে অন্তর্ভুক্তি দ্বার প্রয়োজন এবং সে দ্বার যে সাধনার অধিপত্য,

শ্রীঅরবিন্দ তা দেখিয়েছেন 'লিনাক্সীবনে'। আর এক নটে বিজ্ঞানকে নিষ্ক্রিয় বিজ্ঞানমন চৈতন্য বলা হয়েছে। সেও বিজ্ঞানের এক দিক নাত্র, বিজ্ঞানের ক্রিয়া-শক্তিও আছে, দুই সত্য বা Real Idea-কে অতীতসত্তা পথে প্রকাশিত করার অনোষ শক্তিও তার স্বতঃ-স্বকূর্ভ। সেই হল মূল স্বভাবী-শক্তি।

বাষ্টসত্তা সেখানে বিজ্ঞানমন পুরুষ। তার শির হল শ্রুত্বা—কোন সত্য বিশৃঙ্খল করে বা ভেদে সেই অনুসারে জীবন যাপন করার সংকল্পই হল শ্রুত্বা। “শ্রুত্বান্নো হমঃ পুরুষঃ”, এক হিসাবে শ্রুত্বা দিয়েই পুরুষ গঠিত, ব্যক্তিক গঠনের মূল উপাদানই হল শ্রুত্বা। শ্রুত্বা শক্তির কথা ঋগ্বেদেও (১০-১৫২) বলা হয়েছে, “শ্রুত্বা অগ্নিঃ সনিধ্যতে” ইত্যাদি। প্রত্যেকের শ্রুত্বা হয় তার মনের মনুরূপ আর শ্রুত্বা আবার যে সত্য ক্রমে তাতেই সে পরিণত হয়। আর বিজ্ঞান লোকে তা হল যাকে যে সত্য অভিযুক্ত করতে হবে তার মন্য অনন্যমুখ অনোষ শ্রেয়ণা। পার্থ হন স্বত ও সত্য—তা প্রকাশ করতে হবে এবং যেভাবে, যে পদ্ধতিতে তা সাধিত হবে, স্বতী-প্রবৃত্ত পরনের অতীত তপঃশক্তি থেকে পুণর বা জাত হয়েছে, ঋগ্বেদের ভাষায়। তার মায়া যোগ সাধনা এবং পরনের সঙ্গে নিত্য একত্ব বোধ। তার প্রতিষ্ঠা হল চতুর্থ ব্যাখ্যাত্তি নহঃ—সত্য স্বত সৃষ্টিতে চৈতন্য—বাষ্টচৈতন্যর বিশ্বব্যাপ্তি।

৯। এ দেখেই অভিমানস বিজ্ঞান লাভ ও ধারণ করা যায়। ক্রমগতির প্রত্যেক স্তরেই চৈতন্যর নবরূপায়ণ ও প্রশার হয় বটে—জড় থেকে প্রাণে, প্রাণ থেকে মনে। কিন্তু মন থেকে বিজ্ঞানে উৎকৃষ্ট হল যোগে বিশেষ নবরূপায়ণ, যাতে দিব্যতীন্দ্র অধিগত হবে। নবরূপায়ণে আত্মা হয় ভাগবত স্বরূপ ও স্বধর্মের অংশীদার, শক্তি হয় পরা প্রকৃতি, সে চৈতন্যেই নিখ্যা, দুঃখ, পাপ বা অজ্ঞানের কোন গান থাকে না।

১০। বেদপ্রসঙ্গে (৫৬৮) শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, বেদের ধর্মবা শ্রেনকে দেখতেন উপর থেকে, তার মূল উৎস থেকে, দিবা আনন্দের প্রাধান্যরূপে, এবং সেই ভাবে তাকে তাঁদের মানব-আধারে গ্রহণ করতেন। ‘ময়ন্’ ও ‘প্রয়ন্’ এ দুটি শব্দ তাঁরা ব্যবহার করেননি যথাক্রমে বিষয়-নিরপেক্ষ স্তরের তত্ত্ব এবং বিষয় ও অপর সত্তার সংস্পর্শজাত অস্ত্রনের সূত্র ও হর্ষের বহির্গামী প্রবাহ অপেক্ষ। সেই চিত্তের দ্বারা অনুসরণ করে ধর্মি পরমসেবের আধ্যাত্মিক ও বিশ্বময় আনন্দ (সেবাস্ত্রের আনন্দ সেবের ময়ন্) প্রসঙ্গে এখানে বলছেন যে তার শির হল শ্রিত্ব (বেদের প্রয়ন্) বা আশ্রয় সূত্র ও তৃপ্তিকর বিষয় বস্তুর রস। সে আনন্দের পরাকাষ্ঠা হল শ্রেন।

১১। যে ব্রহ্মকে জানে সে ব্রহ্মই হয়, “ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি”। এই পাঁচটি লোক বা চৈতন্যর স্তরে অভিযুক্ত ব্রহ্মকে যে যেভাবে বড়টা জানে, বিশ্বে সে ব্রহ্মকে সেই ভাবে ভক্তটাই প্রকাশ করতে পারে। আনন্দমন ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতাই হল যোগের চরম সিদ্ধি, তাতে ব্রহ্মকে পূর্ণ অভিযুক্ত করা হয়, ব্রহ্মভাবে বিশ্বে জীবন যাপন করে বিশ্বকে ব্রহ্মরূপ করা হয়, স্বষ্টীর উদ্দেশ্য সফল হয়। তবে বিশ্বাতীত পরনের নৈশল্যা ও নিষ্ক্রিয়তার সাধক নির্বাণ লাভ করে, সে ‘দশং’ হয়, তার বাষ্ট অস্তিত্ব থাকে না।

“অসং বলতে মানস বুদ্ধি এমন একটা কিছু যা এই জগতের জ্ঞান ও করণমান রাপে বস্তু-সত্তার যে সুক্ষ্মতম নিবিশেষ অনুভব ও শুদ্ধতম ধারণা থাকে ও বেড়ে ছাড়িলে। ‘কিছুনা’র অর্থ হল এমন কিছু আত্মার ধারণা দ্বিগে ইতি হয় না যারা...এই অসংই কিন্তু একমাত্র সত্যিকার সং।” (‘জিবা-জীবন’—অনির্বাণের অনুবাদ, পৃ. ৩২,)। বুদ্ধের শূন্য ও অমৈত বাদের নিবিশেষ বুদ্ধ আর অসং অভিন্ন।

অসং থেকে সং আসা কি করে সম্ভব হয় ? এ প্রশ্ন তুলতে ছাশোগা(৬১২)। কিন্তু ‘অসং’ শব্দকে এই অর্থে নিলে আর কোন বিরোধ আসে না।

১২। এই স্বষ্টির উদ্দেশ্যকে ‘কাননা’ বলা হয়েছে, বেদেও আছে ‘কানন্তদগ্রে সববর্তত’ (ঋগ্বেদ ১০।১২৯।৪)।

১৩। ‘তপঃ’ শব্দের অর্থ তেজ, উত্তাপ। চেতনা বা মনন বা ইচ্ছাপন্থিকে একাগ্র ও সংহত করলে তেজ উৎপন্ন হয়, সেই হল স্বষ্টির মূল; সব ক্রিয়াপন্থির উৎস। বেদেও আছে “অতীচ্ছাং তপসঃ অধ্যভ্যসত” (ঋগ্বেদ, ১০।১৯০।১)—প্রত্নমণিত তপঃপন্থি থেকে জাত হল।

১৪। দুটি প্রশ্ন করা হল। প্রথম প্রশ্ন। এখানে, এ জীবনে বুদ্ধকে না জানলে অপর লোকে আর এজন্য যার কিনা। ঋষি তাঁর কোন উত্তর দিলেন না। অন্যান্য উপনিষদে আছে, এখানেই তাঁকে জানতে হবে, না চলে “মহতী দিনষ্টী”। পৃথিবীতেই সাধনার একমাত্র কথোপকথন বৈলে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বললেন, সব কিছুই পরমের স্বষ্টি, অন্যান্য-সংগ্রহী আর তিনিই সব হয়েছেন। উদ্দেশ্য, আনন্দ, বহুর সঙ্গে সম্বন্ধনীনা। পৃথিবীর উপরে জ্ঞানোদয়ী বচন্তর আছে, প্রত্যেক স্তরের আনন্দ ক্রমবর্ধমান। সাধক যতটা অগ্রসর হয় সেই পরিমাণে আনন্দ লাভ করতে পারে এই বেদ ধারণ করেই। আর পরমের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি হলে, দেহ বন্ধার পরেও ব্যাধি আবার অস্তিত্ব থাকে, আনন্দময় কোষ নিয়ে আনন্দময়ের নীলার চির সঙ্গী হয়ে।

মায়ের সঙ্গে কথা

[প্রারম্ভঃ]

(১)

প্রশ্ন : অতিনানস যদি এখানে অবতরণ করেছে, তবে কেন আমরা এট মুক্তিযুদ্ধের
বনের গায়ে ছাড়িয়ে সরাসরি অতিনানসে উত্তীর্ণ হতে পারব না ?

উত্তর : কে বলছে যে পারবে না ?

শ্রীঅরবিন্দ হো বলেই দিয়েছেন, অতিনানসের সংস্পর্শে আসতে চলে কি কি করতে
হবে, আর কেনন ভাবে তাকে প্রচণ্ডের জন্য কেত্র প্রস্তুত করতে হবে। যখন তা এই
পৃথিবীর আবহাওয়াতে এসে পৌঁছে গেছে, তখন তার অভিব্যক্তি কেউ পেতে চাইলে এখন
আর বিশেষ কোনো চাপন করতে হবে না। উপযুক্ত আধার যদি হোমান হৈমি থাকে,
আর অতিনানসের যদি ইচ্ছা হয় সেখানে সীধ হতে, তবে অন্যভাবেই তা হতে পারবে।

তাই জানতে চাই, কে বলছে যে তা হতে পারবে না ? কেউই সে কথা বলেনি।
শ্রীঅরবিন্দ তখন বলেছিলেন যে তা হবে, কিন্তু এখন হো হয়েই গেছে। এন আসান জন্য
তখন ঐরকম বিশেষ প্রস্তুতির প্রকার ছিল। কিন্তু এখন আর অতিনানসের ফ্রিডম জন্য
একটা বিশেষ পদ্ধতির লোখ্য অপরিহার্য দেখি না। স্বাধীনভাবে করবার উপায় তার থাকবে
না কেন ?

এখন সব রকমের সম্ভাবনাই উপস্থিত রয়েছে ; শুধু ঐকান্তিক আশুহা আর পুরো
নিবেদন চাই, তা থাকলে তার গাড়া নিলবেই। তার জন্য এই পদ্ধতি, প্রণালী, মধ্যবর্তী
ব্যবস্থা, সুপাঙ্কর প্রভৃতি অসংখ্য রকমের উপায় রয়েছে। কেবল এ সাহায্য হবে আর ও
সাহায্য হবে না, এমন কোনো কথাই নয়।

কোনো একজন, সে যেই কেন হোক, সে যদি অতিনানসের স্বপ্নাত্ম বা মানস
একটা অংশের ও প্রচণ্ডের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে, তবে তার কাছে আপনা হতেই তা এসে
যাবে। সেই অতিনানসের চেতনা ও ধীপ্রতি এলে তার ফল হবে অসংখ্য রকমের, তা নির্ভর
করবে আধারের আপন সম্ভাব্যতা ও সাহায্যের উপর, ব্যক্তিগত আশুহার ঐকান্তিকতার
উপর।

আত্মনিবেদন হতেই সমগ্রভাবে হবে, আশুহা হতেই তীব্র হবে, তার ফলও হবে ততই

সম্পূর্ণতর ও খড়ীরতর। কিন্তু তার ক্রিয়া দেখা দেবে অসংখ্য সকলে ব্যবহিত্র হয়ে, সকলের পক্ষে একরকম কখনই হবে না—আর তা সম্ভবও নয়, কারণ অতিমানসের তা স্বীতিই নয়।

আর আত্মাওয়ার প্রকৃতিও এখন বদলে গেছে; ফল স্বতই বহু রকমের হোক, তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। সাধারণ শক্তির ক্রিয়ার থেকে অতিমানসের ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ আলাদা বলেই চেনা যাবে, কারণ তার প্রকৃতিও আলাদা আর প্রকাশও আলাদা।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে জনে জনে কে-কোনো উপায়ে কে-কোনো নুহুর্টে এক একটি অতিনানস-প্রতিভা হয়ে পড়াবে। তেমন যেন কেউ আশা কোনো না।

কিন্তু আমি বলি কি, তোনরা যদি স্বতন্ত্র এটুকু দেখে যে তোনাদের নিজেদের তরফের নুচতা আগের চেয়ে একটু কমেছে, তবে তাও তো কিছু একটা হবার মতো হলো।

*

প্রশ্ন: কিন্তু বিদ্যানিকায় কেত্রেও কি তার অভিব্যক্তির কোনো প্রভাব দেখা দেবে?

উত্তর: তার প্রভাব কোনো বিশেষ বিভাগে যাদ থাকুক, তাই কি চাও?

*

প্রশ্ন: তা নয়, তবে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন কিনা, এই শিক্ষাপদ্ধতি “এখনও রয়েছে আশ্চর্য রকমে নিঃশব্দ”।

উত্তর: এখনকাল চারদলের তোনরা যে পদ্ধতিতে শেখাও, তারই কথা বলছ তুমি? এ ভিনিস বহুকাল আগেই বন্ধ বাওয়া উচিত ছিল।

পাঠানুপাঠিকতা সবাই পছন্দ করে, অন্যরা যেটা করছে তারই অনুকরণ করতে চায়। এ সম্বন্ধে অনেক আগেই বলেছি। ও তরফের যুক্তি হলো, “সকলে করতে বলেই আনন্ড করছি”। কিন্তু আমি বলতে চাই, “সকলে যা করবে, আনন্ড তা করব না। চিরকাল একই রকম করতে থাকায় কি লাভ?”

*

প্রশ্ন: তাহলে আপনি অন্যরকম দেখিয়ে দিন, নইলে তা কেনন করে হয়?

উত্তর: আমি কেন? নিজেস্বই তোনাদের পদ্ধতি বদলাও, অতিমানসের সূত্র ধরে। স্বতন্ত্র চেষ্টা করো। কাউকে অনুযোণ না ক’রে নিজেস্ব করো। একই ধাঁজ ধরে যদি চলতে থাকো তাহলে সেই পুরোনো খাজেই চিরদিন আটকে থেকে যাবে। খাজের ভিত্তর থেকে বেরিয়ে আসা চাই।

এই নিয়ে আমি সর্বশেষ বলি। আরও কিংবা কানট বলচিস্নান যে কেউ যদি অজ্ঞানতা নিয়ে থাকতে চায়, সে অধিকার হার পাবে। আধ্যাত্মিক অজ্ঞানতার সম্পর্কে নয়—তার মধ্যে তো সকলেই রয়েছে—আমি বলছি সাধারণ অধিকার অজ্ঞানতার কথা। অনেকে এমন আছে যারা কোনো শিক্ষা পেতে নাহয়, লেখাপড়া করতে চায় না, আমি বলি সে অধিকার তাদের দেওয়া হোক।

তোমাদের কর্তব্য কেবল এই কথা তাদের বলা “তোমাদের বয়স কাটা, নৃত্তিক নতুন তৈরি হচ্ছে। এই সময় যা কিছু শিখবে তা নৃত্তিকের জোটা জোটা কোঠেবে পাঁথা হয়ে থাকবে। শিকা আর চিত্তা আর কাজ, যতট বেশী হবে ততট সেখানে দরেক রকম জ্ঞানের সম্পদ চলে উঠবে। এখন তোমরা জোটা মাছো, এই হলো তার পক্ষে উপযুক্ত সময়। সেইজন্যই এই বয়সটি মানুষ শিক্ষার্থনের কাল বলে বেছে নিচ্ছে, কারণ এই সময়েরই শিখতে পারা সব চেয়ে সহজ। যতএব আমরা যা বলি তাই শোনো।” এ ছাড়াও শিখা যতকম নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন না হচ্ছে সেই বয়স পর্যন্ত তাদের নিয়মের অধীনে রাখা বঙ্গবান, কারণ তখন তারা নিজেদের ভালোবাস নিজেদের বেছে নিতে পারে না।

আর এই বৈশেষ্যের মধ্যেও তারতম্য আছে। কার কতখানি বিকাশ হয়েছে তার উপরেই সেটা নির্ভর করে। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে সাত বছর বয়স থেকে শুরু করে চৌক বছর বয়স পর্যন্ত, এই সাতটি বছরে সেখা দেব বুদ্ধির বিকাশ। সবুচিহ্ন সাতাব্যাপেলে এই সাতটি বছরের মধ্যে মানুষের মতো বুদ্ধি খুলে যেতে পারে।

তবে সাত বছর বয়স হবার আগে—সপ্তমের প্রাতিভা ছাড়া—শিখা নিজেদের সম্বন্ধে চেনার হয় না। তারা কখন কি করে আর কেন করে তা নিজেরাই জানে না। এই সময়টিতে শিখকে বন্যোৎসাহ দেওয়া খোঁচাতে হয়, যে কাজে হাত দিচ্ছে তাতে একাগ্রতা আনতে খোঁচাতে হয়, এমন একটি নিয়াম রাখা করে দিতে হয় যাতে সে পড়ালে মতো যত্ন সহজে না পাবে, বুদ্ধির প্রাথমিক বিকাশ পেয়ে যাতে সে বন্যাপদ্মবাচা হয়ে ওঠে।

কিছু ই প্রথম বয়স কেটে গেলে তার পরের সাতটি বছরের মধ্যে তাকে খোঁচাতে হবে নিজের সাতা নিজে বেছে নেবার দিক দিয়ে, অর্থাৎ যে রকম সে হতে চায়। যদি সে চায় তার নৃত্তিকের দিকের উগুতি ও কমকমলতা, তাহলে সেই ধরনের কিছু কাজ তাকে দিতে হবে; কারণ কাজেরই ডিঙির দিয়ে মনন, অনুধাবন, বিশ্লেষণ প্রভৃতি যা ধরকার নৃত্তিকের উগুতির জন্য, তা এসে যাবে।

চৌক বছর বয়সের মধ্যেই তারা নিজেদের সাতা বেছে নেবার উপযুক্ত হবে, অতত তাই হওয়া উচিত। এই বয়সে পৌঁছে যে শিশু স্পষ্ট করেই বলবে: “পড়াশোনা করতে আমার ইচ্ছা নেই, পড়া ছেড়ে নিরাকর হয়েই থাকতে চাই,” সেখানে আমার মতে তাকে জোর করে পড়ানোর অধিকার তোমার নেই; আর সকলকেই যে একই রকম ভাবে মানুষ হতে হবে তারও কোনো মানে নেই।

কেউ বা হয় নিম্নস্থরের, কেউ বা হয় অন্য স্থরের। এমনও আছে যাদের মধ্যে বিশেষ যোগাভা পাকলেও লেখাপড়ার দিকে ঝুটি নেই। কিন্তু যারা কিছু কাজও করতে চায় না, লেখাপড়াও করতে চায়না, তাদের সাবধান করে দেওয়া ভাল যে যখন বেড়ে উঠলে অন্যদের দাননে তাদের সংকুচিত বোধ করতে হবে। তাতেও যদি তাদের কোনো পরিবর্তন না আসে, লেখাপড়া শিখতে না চায়, সেখানে তাই নিজে কারো মোহ করার অধিকার আছে বলে আমি মনে করি না।

এই নিয়ে এখানকার শিক্ষকের সঙ্গে আমার নিত্য কলহ বাধে। তারা এসে বলে, কিছুই না করলে ওরা নির্বোধ আর মূর্খ হয়ে থাকবে। আমি বলি, তাই থাকতেই যদি ওরা চায়, তুমি সেখানে জোর করবার ক'কে? লেখাপড়ার জ্ঞানকে তুমি বাধ্যতামূলক করতে পারো না। সোজা কথা।

কিন্তু কেউ যদি ভাবে যে লেখাপড়া শেখা বা কোনো কিছু চেষ্টা করা বাদ থাকলেই প্রতিভার সন্ধান হবে, অতিমানস প্রতিভা তাতেই আপনি ফুটে ওঠার সাত্তা পাবে, সেটা নিতান্তই অসঙ্গত নীতিসিদ্ধান্ত, কখনই তা হবে না। তোমার আভ্যন্তরীণ আশুখা থাকলে কিংবা ভগবৎ কৃপার ফল থাকলে যদিও তুমি উপরের আনন্দের স্পর্শ পেয়ে যাও, তবু তোমার মাথার মধ্যে এমন কোনো গুণ নেই যার দ্বারা তার বিকাশ ঘটিতে পারবে। সুতরাং, যা পাবে তা তোমার কাছে ধোঁয়ার মতোই হবে থাকবে, আর ব্যাঘ্র জীবন যেনম ছিল তেমনই থেকে যাবে। অন্যথা তাই নিয়েই যদি তুমি খুশি হও, তাহলে কোনো তোমাকে চোর করে অন্য দিকে ফেলার অধিকার নেই সে ক্ষেত্রে চেতনা বহুতর প্রভাবের মধ্যে নিজেদের থেকে না আসায়ে ততক্ষণ তোমাকে আপেক্ষা করতেই দিতে হবে।

তবে অবশ্য কেউ কেউ আসার এমন আদে যারা চৌক বড়বেও যবে খেতে পাও বড়রের শিঙর মতো। তাদের সম্বন্ধে বেশী কিছু আশা করার নেই, বিশেষত এখানে যারা রয়েছে।

সুতরাং পিকা সম্বন্ধে তোমাদের মতটা এখন বদলাতে হচ্ছে।

তোমাদের বিশেষ করে একটিমাত্র কর্তব্য, ওদের সেখানে ওদের নিজস্বদেরকে জানতে, নিজেদের ভাষা দিক ক'লে নিয়ে নিজেদের চনার সাত্তা বেছে নিতে। ওরা যেন নিজেদের দিকে চাইতে শেখে, নিজেদের বুঝতে শেখে, নিজের সম্বন্ধে ইচ্ছা করতে শেখে। এই পিকাই সব চেয়ে বেশী দরকার,—অবুক সময়ে পৃথিবীতে কি ব্যাপার ঘটেছিল, বা পৃথিবী কেমন করে গড়লো, বা এই ধরনের আরো কিছু সেখানোর চেয়ে তোমাদের ঐটি সেখানো বেশী দরকার...তবে হাঁ, ঐওলিও সেখা চাই বৈকি পৃথিবীতে সাধারণ জীবন যাপন করার পক্ষে, কারণ এই সকল জ্ঞানের ভিত্তি কিছু না থাকলে লোকে তাকে অন্ধ দেখে ভাজিলা করে বলবে, “এঃ, একবারে নির্বোধ, দুনিয়ার কিছুই জানে না।”

কিন্তু লেখাপড়া শেখা কে-কোনো বরসেই স্কুল করা যায়, যখন ওদিকে নম হবে; তার

জনা শুনে যাবার ও প্রকার নেই। শেখবার ইচ্ছা হলে তার জন্য ভগ্নাংশে যথেষ্ট নয় আছে, এমন কি প্রয়োজনের ও চেয়ে অনেক বেশী। এধানকার লাইব্রেরীতে বেশাগলের কাছে গেলেই চন্দা, সেখানে যে-কোনো বিষয়ের এত এত বই পাবে (চাও তুলে দেখানেন) ।

কিন্তু আসল কথা হলো কে কি চায়। তাই ভাবতে একটু বাধীনতা থাকা চাই। সেদিক দিয়ে কোনো ভোগান্তির কিংবা বাধাতা যেন না থাকে, নিজের ইচ্ছায় কাজ করতে দিতে হবে। যদি অন্যর হয়ে কেউ থাকতে চায়, সে জানুক যে অন্যর দাবি কি কল... ভোগতা ভাবনের ক্ষেত্রে এট সেখানে যে কুঁড়ে যাত্রা হয় তাহলেই অন্যের চেয়ে আরো দশগুণ বেশী খাটতে হয়, কারণ তারা কাজগুলো এমন ব্যাপ্ত করে যে আমার নতুন করে তাই করতে তাদের বাধা হতে চান। সেই অভিজ্ঞতাই তাদের শিখিয়ে দেয়, কারো চাপ দিয়ে শেখাবার প্রকার হয় না।

নিজের নামকে নিজে শেখাতে হবে, তাকে রাখতে হবে নিজের হাতের মধ্যে, কারণ বন হলো তরল বকনের চকল পদার্থ। তাকে যদি কোনো বিষয়ে লেগে থাকতে না শেখাও, তাহলে সর্বশেষ সে এলোবোলো ভেঙ্গেই বেড়াবে। কোথাও সে বসবে না, অনিচ্ছিতের মাছের কেবল এতকি এতকি বেয়ে যেতে থাকবে। যেহেতু কোনো কিছুতে বনঃসংযোগ করতে যাবে, অর্থাৎ সে কি দাব্য কই! একটুখানি চেষ্টা করতে না করতেই অর্থাৎ বনে বসবে, “ওঃ, আর আমি পারছি না, বড়ো কষ্ট হচ্ছে,” এই বলে সে হাল ছেড়ে দেবে। যেন বেঘের স্নানভে ভেঙ্গে পেড়াচ্ছে, বাপটি বইল বেঘে ছড়ানো (অনেকের মাথাই তাই)। সুনির্দিষ্ট কিছু নয়, স্পষ্ট কিছু নয়, সবই ধোঁয়া ধোঁয়া, কুয়াশাচ্ছন্ন। জ্ঞান নেই কোনো বিষয়ে, কাজেই সবই হচ্ছে আশায়ে। কল্পনা, অনুভব ও আবেগের ঝোঁক থেকে যে সব উল্টো-পাল্টা বকনের ধারণা আসতে থাকবে—তার মধ্যে চিন্তার স্পষ্টতা নেই, সবই হবে “আমারো” বকনের। সেইভাবেই একত্র ছড়ো করে তার মধ্যেই কোনোবাক্য একটা বাক্য করে নিয়ে থাকতে হবে।

কিন্তু যদি চাও যে হোয়ার চিন্তাগুলো প্রকৃত বানুঘের বস্ত্রা নির্দিষ্ট ও নির্দিষ্ট হোক, এক একটা বিষয় নিয়ে তাতে পুঙ্খ হোক, তাহলে তার জন্য অভ্যাস করা চাই, চারদিক থেকে নিজেকে গুলিয়ে নিয়ে একাগ্র হতে শেখা চাই। প্রথম ব্যবে যখন সে চেষ্টা করতে যাবে তখন বাধা জো পাবেই, ত্রিষ্ট জো হতেই হবে।

কিন্তু এ অভ্যাস যদি না করে তাহলে সারাধীন ভাগতেই থাকবে। আর যেহেতু কোনো সববার সমুদীন হবে,—কারণ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বতই এড়িয়ে চলো তবু ছোটো বড়ো সবসাম এসে পড়বেই, আর তখনই কিছু বীনাংসা করা প্রকার—তখন যেটা করতে হয়, অর্থাৎ তার সূত্রগুলিকে পরে পরে সাজিয়ে গুলিয়ে নেওয়া, প্রণয়নিক সলল দিক থেকে বুঝে নিয়ে তার চেয়ে উপরে উঠে সেই উপর থেকে দেখা যে তার কি সমুদীন হতে পারে—

এর কিছুই ভাবি করতে পারবে না, বরং তার বললে কেবল বুঝপাক খেতে থাকবে আর চাকি-
লিকে ধূসর ধোঁয়া তেপতে থাকবে, কেবল মনে হতে থাকবে যে মাথা মথো যেমন অনেকগুলো
মাকড়সা ছুটে বেড়াচ্ছে—কিন্তু কোনো বীমাংগতেই পৌঁছবে না।

আমি এখানে সবচেয়ে সোজা সব সবলার কথাই বলছি। সারা জগতের কিংবা
দেশের কিংবা সকল মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে যা ভেবন কিছু গুরুতর বিষয় নিয়ে নয়। বলাছি
তোমাদের নিজেদেরই প্রাত্যহিক জীবনের ছোটোখাটো সবলার কথা—তাও মনে হবে নয়
একতাল উল্লের মতো।

ভেবন যাতে না হয়, সেইজন্যই বলা হয়ে থাকে যে বস্ত্তিক বর্ধন নতুন গড়ছে তখন থেকে
এই জিনিস আর এই অভ্যাস তার মধ্যে না ঢুকে যায়, চেষ্টা করতে পারো যাতে মাথা মথো
নিষ্টিষ্টতা স্মৃতিশ্রুতি ও একাগ্রতা আসে, তোমাদের বস্ত্তিক যেন সকল সবলার সমুদীন হয়ে
বুদ্ধি খাটিয়ে সঠিক বীমাংসার ঘরা নাটি জিনিসটি বেছে নিতে পারে।

অবশ্য বুদ্ধি মানুষের সর্বশেষ গুণ নয়, তারও উপরে ওঠা চাই কিন্তু এটা ঠিক কথা
যে বুদ্ধি যদি না থাকে তাহলে একটা অসম্বদ্ধ বকনের জীবন যাপন করতে হয়, আচরণের
মধ্যে হুজুলামড়সা থাকে না। আর মাঝামাঝি কিছুতেই বিচলিত হয়ে কি করবে কেন
করবে তা ভাবে পাও না।

কিন্তু যার বুদ্ধি থাকে সক্রিয় সে সকল আক্রমণেরই সমুদীন হতে পারে। কোনো
বকনের চিত্তবিপর্যয়ই হোক বা কোন কঠিন পরীক্ষাই হোক, কারণ এই সব জিনিসেই তো
জীবন পরিপূর্ণ—মতিও চোখোখাটো বকনের অবাকনীর জিনিস, তবু যে যেমন ভাবে তাকে
নিরে থাকে—বস্ত্তত অসম্বদ্ধ যার নাগে তার কাছে তা নিশকণই নাগে। কিন্তু বুদ্ধি সক্রিয়
হলে সে সে তার থেকে নিজেকে একটু পাশ কাটিয়ে নিতে পারে সব কিছু দেখেভনে
হেসে বলতে পারে, “নাঃ এই সামান্য ব্যাপারকে বড়ো করে থাকিয়ে তুলে কাজ নেই।”

বুদ্ধি না থাকলে তখন তোমার অবস্থান বীড়াবে যেন উটাল সমুদ্রের বুকে এক টুকরো
সোনার মতো সোনার ঐরূপ অবস্থায় পড়ে কেনন কই হয় তা জানি না, কিন্তু বাহনীর
অবস্থা নিশ্চয়ই নয়।

এই হলো বোটি কথা।

যাক, এখন এই সব কথা বলার পরে—যদিও এই একবার মাত্র নয়, কিন্তু এ কথা
হাজার বার বলেছি আর দরকার হলে আরো হাজার বার বলব—এর পরে নিজেরাই তোমরা
সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বেছে নেবে যে যখন সমুদ্রেভাঙ্গা সোনা হয়ে থাকতে চাও, না বুদ্ধি
আর জ্ঞান নিয়ে এগিয়ে যেতে চাও—অর্থাৎ বেশিকে এখোতে তোমার মন হয়।

এ বিষয়ে কতকটা পরিষ্কার হতে পারে অপরিহার্য, যাতে অন্তত যে পূণ বেছে নিলে সেই
পথে পা বাড়িয়ে চলতে পারো। বিদ্যার আহ্বাজ হতে বলছি না—সে কথা বোটেই নয়।
কিন্তু এ প্রান্ত ছাড়লে একেবারে অন্য প্রান্তে চলে যাবে, মাথা মথো এত আবজনা এসে

চুপবে যে উপব পেকে আলো এসে ঢোকবার জায়গা পাবেনা ; যাতে যখন ধরনের সোনার টুকরো না হতে হয় তার জন্য সব চেয়ে করণক্ষের সীমা একটা তো আছেই।

*

প্রশ্ন বিদ্যামিঞ্চন কথা নিয়ে লোকে বলে যে এখানে বোটে ভালবসক শিখাই হয় না, কারণ এখানে তার চেয়ে খেলাধুলা এবং মেহচর্চার দিকেই বেশী ঝোক দেওয়া হয়। সেটা কি ঠিক কথা ?

উত্তর : কারা বলেন্ডে এমন কথা ? মেহচর্চা জিনিসটাকে বাস্তব ভালো চোখে দেখতেই পারে না ? কিংবা যারা অস্বাভাবিক বুড়ো প্রফেশার, নড়াচড়া করতে পারে না, তারাই তো ? (নাম জানতে চাইছি না)।

কিন্তু তাদের ও-কথা আমি মানি না।

স্মরণ করে দেখ শ্রীঅরবিন্দ এ সম্বন্ধে বুনেটনের প্রথম পুস্তকেই কি বলেছিলেন,— এই সব লোকের প্রশ্নেরই খুব স্পষ্ট জবাব তিনি তাতে দিয়েছিলেন।

আমি নিজেও ও-কথা সত্য বলে মনে করি না, জোর করে বলতে পারি যে এটা নিতান্ত ভুল ধারণা। আমার বিশ্বাস যে আমার ছেলেবেয়াদের আমি অসম্ভব রকমের স্বাধীনতা দিয়েছি (তাতে কিছু ভয় হয়ে থাকলে সে মোঘ মেনে নিতে আমি বাস্তব আছি)—আমার বিশ্বাস যে এতটা স্বাধীনতা জগতে আর কোথাও ছেলেবেয়াদের দেওয়া হয় না—আর এও ঠিক কথা যে এ স্বাধীনতার সম্ব্যহার করা খুব কঠিন।

তবু এ পরীক্ষাটা ক'রে দেখার মত জিনিস। তোমরা সে কথা ঠিক বুঝবে না, কারণ তোমরা জানেনা অন্য অবস্থাটি ; এখানে তোমাদের এটাই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। কিন্তু স্বাধীনতা পেলে তাকে মানিয়ে চলা সহজ নয়। তবে এতে যদি তোমরা আপনা হতে নিজেদের সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারো—কোনো পরীক্ষা পাস করার দিক নিয়ে নয়, নাম যশের জন্য নয়, প্রফেশনের খুশি কববার জন্য নয়, প্রাইজ পাবার জন্যও নয়, তাহলে সাধারণত যে কারণে ভালো হয় তার কোনোটার জন্যই নয়, ঐ সব প্রলোভনকে আমার বাপ দিয়েই রেখেছি—ঐ সব দিকে এখানে কারো অবহেলা দেখলে কোনো ধনক দেওয়া বা শাস্তি দেওয়া হয় না—কিন্তু শুধুই এক উচ্চতর কারণে যদি আপনা হতে নিজেদের সুনিয়ন্ত্রিত করতে থাকো (প্রত্যেকে আপন আপন বীজিতে, কেউ কাউকে অনুকরণ ক'রে নয়), কেবলই নিজেদের উন্নত করতে চাইছ বলে, নিজেদের ভিতরকার উৎকৃষ্টতাকে প্রকাশ করতে চাইছ বলে, তাহলে তোমরা যেমন মানুষ হয়ে দাঁড়াবে তা হবে সাধারণ ছুঁলে শাসিত পড়ুয়াদের চেয়ে অনেক উৎকর্ষের। আমি সেটাই পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাইছিলাম। কিন্তু সে পরীক্ষায় যে আমি বিফল হয়েছি এমন কথা মোটেই বলছি না ; এখনও আমার খুবই আশা আছে যে এই অসম্পূর্ণ সুযোগের ব্যবহৃত সম্ব্যহার করে তোমরা তার থেকে প্রকৃতই লাভবান হতে শিখবে। কেবল একটা জিনিস

ভোনারেন্দ্রের নিজেদের মূখে নিজে চলে আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও তার কি প্রয়োজনীয়তা ; নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এক পাও এগোনো যায় না, এমন কি সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনও ভালো ভাবে যাপন করা যায় না। তবে সাধারণ সমাজের মানুষী ধারণার বাঁধা নিয়ন্ত্রণের বন্ধনে আনি ছেঁকেছিলাম, এবং এখনও তাই চাই, যে নিজেদের পরিণতি আনতে ও নিজেদের সমগ্র পূর্ণ বিকাশ আনতে ভোনার স্বনির্বাচিত নিয়ন্ত্রণ নিজেদের উপর প্রয়োগ করবে।

কিন্তু তা না করলে কি হবে?...ভেবে দেখে যে কোনোক্রমে নিয়ন্ত্রণ না করা হলে আর ভোনারেন্দ্রের স্বেচ্ছা অসম্ভব কি ধাঁড়াতো। এমন দুই পারের উপর ভর করে ধাঁড়াতে পর্যন্ত পারতে না, নিজের নজর চার পথে ছাড়াও দিতে হতো। নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কোনো কাজই করতে পারা যায়না। নিজেদেরই বাধা হতে হয় নিয়ন্ত্রিত হতে ; তা ছাড়া কোনো দেশ বা কোনো সমাজেই বাস করা যায় না, কেবল মনে ছাড়া, এমন কি তাও সম্ভব হয় কিনা সন্দেহ। তাই অসংখ্যার ভোনারেন্দ্র বলি যে এটি অপরিহার্য। সামাজিক বা অন্য কোনো মাসন-বিধির বিরুদ্ধে আমার কোনো বিরূপিতা বিরোধ নেই ; এমনও বলি না যে কোনো নিয়ম মানব প্রকার নেই। আমি বলি বলি যে প্রত্যেকে ভোনার নিজেদের আশুপা এবং আত্মপলকির সাফল্যের সাক্ষ্য হুঁতে বেছে নাও।

আমি জানি, অধ্যাপক, শিক্ষক প্রভৃতির কাজই হলো যে বিষয়ে সাক্ষ্য করা। কোনো একটা কঠিন মনসে দেখলে তখন যাঁহে তাদের কাছে, তারা নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে বললে, "না, এটা করা ঠিক নয়, এটা করো, তুমি এ সাক্ষ্য না দিয়ে এই সাক্ষ্য চেষ্টা করে দেখ"। সেখানে বাঁধা নিয়ম চালানো আর পুণিবারে তব পোমানোর পরিবর্তে সত্য বিষয়ে ভোনারেন্দ্রের সমুচিত সম্মান দেবে, চড় থেকে আধ্যাতিক পর্যন্ত বিষয়ে তার যেমন শিক্ষা কৃতিত্ব আছে।

যদি বাস্তবিক জ্ঞান কিছু না পেলে সংসারের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হয় তাহলে হয়তো কিছু বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। কোনো অজ্ঞান নিজেকে যদি অসাধে ছেড়ে রাখা হয়, তাহলে দেশলাই এর ব্যঙ্গটি চাপে পেলে প্রথমেই সে নিজেকে পুড়িয়ে ফেলবে। তেমনি পুরোপুরি বাস্তবের ঠিক থেকেই বলছি যে এমন শিক্ষক সহায়ক পাঠ্য ভালো যারা নিজেরাও কিছু জ্ঞানে আর ভোনারেন্দ্রের সম্মান ও বলে দিতে পারে ; নইলে প্রত্যেককে যদি আপন অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে হয় তাহলে নিরাশ ভরসী কথাগুলি শিখতেই কত ভয় দেখে যাবে। এখানেই শিক্ষক প্রভৃতির সাহায্যের দর। তারা নিজেদের হাতে কাজ করে কিংবা বই পড়ে অনেক কিছুই ভেবেছে, আর যেটুকু জ্ঞান ভোনারেন্দ্রের থাকাই চাই সেটুকু তারা নিশ্চয় শিখিয়ে দিতে পারে। সে শিক্ষা যদি নাও, তবে অনেকটা মনর বেঁচে যায়। তাদের কাজই চাই, ভোনারেন্দ্রের প্রশ্নের সমুদ্রের সেওতা।

কিন্তু ভোনারেন্দ্রের প্রণু করবার নজর জীবন্ত বস্তিক যেন থাকে। আমি তো দেখি

যে আনাকে প্রণু করণান মাত্রা কিছুই তোমাদের থাকে না, আর থাকলেও পুস্টি কম।
তাইতেই প্রমাণ চলে যাণ যে তোমাদের বনে জড়তা হয়েছে।

যখন বলি, "কোনো প্রণু না ক'রে নিজের ভিতরকার জিনিস খুঁজে বের করে,"
তখনকার কথা আসাশ। কিন্তু এখানে এসে যখন বলি, "কারো কিছু প্রণু করবার আছে
কি?" তখন নতাই থাকে চুপচাপ। অর্থাৎ কারো বনে ঐচ্ছিক্য নেই। এমন কথা
বলছি না যে এখানে কিছু আমি পড়ে পোনাবার পরে তাই নিয়ে প্রণু কিছু করতেই হবে;
তবে যে যা প্রণু করলে তার ভাবা নিতে সব সবচেই আমি সাধী যাচি। কিন্তু তোমাদের
প্রশ্নের ভাঙার বেশি শূন্য! মপচ তা ছাড়া আমার কিছু বলবার স্বেষণ সকল সময় বেলে না।

তবে যদি তোমরা বিজ্ঞান বা পদার্থবিদ্যা বা ঐ ধরনের কিছু নিয়ে আনাকে প্রণু করে
বসো, তাহলে আনাকে তখন বলতেই হবে যে ও বিষয়ে আমি কিছু জানি না, তোমরা বই
পড়ে দেখ কিংবা শিকশকে শিখাশা করে দেখ। কিন্তু আমার অধিকারেন মধ্যে প্রণু করলে
নিশ্চয় বলব।

শেষবার কথাটা বনে সেমি: তোমাদের কারো কিছু জানবার আছে? (সকলে
নিরুত্তর)

চমৎকার! (না হাসলেন) আচ্ছা, তবে এই পর্যন্তই থাক।

(২)

জগৎগ্রহণ অনিদিষ্ট

জগৎগ্রহণের কথা গত সপ্তাহে বলেছিলাম—কেনন করে আমরা সেদিন মধ্যে প্রবেশ
করে; তখন এও বলেছিলাম যে সেহকটির ব্যাপারটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তেনন সন্তোষজনক
নয়—সন্তোষজনক তেননের সংখ্যা এতই কম যে তা উল্লেখযোগ্য নয়।

আরো বলেছিলাম যে তোমরাও এসেছ ঐভাবে, তার সঙ্গে এনে ফেলেছ এত কিছু
বোঝা বা বর্জনীয়, প্রকৃত উনুতলাত করতে হলে ওগুলোকে বর্জন করতেই হবে।
আমারই সেই সব কথা এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে: "যোর করে ধরে এনে তোমাদের
ঘাড়ে একটা পরিবেশ চাপিয়ে দেওয়া হয়, পুরুষানুকৃতিক কতকগুলো ধারা তোমাদের বনে
নিতে বাধা করা হয়ে থাকে।" এটি উদ্ধৃত করে চিঠিতে প্রণু করা হয়েছে, এমন কাছ
কে করে?

আমি ভেবেছিলাম তা ওতে ইতিপূর্বে বলাই হয়েছে, কিন্তু শেষছি আরো স্পষ্ট করে
বলা উচিত ছিল।

নবমেরের প্রথম কষ্ট করে একটি পুরুষ আর একটি নারীতে বিনে, তারাই হয় তার

বাপ আর না। যাকে পৃথিবীতে তারা আনলে তার তরফ থেকে মত সেবার কোনো উপায় সেখানে নেই, জানান উপায় নেই যে ওদের কাছে সে আসতে ইচ্ছা করছে কিনা, কিংবা ওদের সঙ্গে তার মিল হচ্ছে কি না। এমনি ভাবে একটি সন্তান সেহের জন্ম দিয়েই তারা নিজেদের পূৰ্ণমানুষনিক রীতিভুলো ওর উপরে চাপিয়ে দিতে বাধ্য হয়, তার পর নিজেদের পরিস্রবশে মথো রেখে তাকে সেইরকম শিক্ষাই দিতে থাকে, যেমনো প্রায়ই হয় তার ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পরিপন্থী।

জট আনি মনেভিনান এবং আবারও বলছি যে এই হলো পাণ্ডিৰ পিতৃবাত্তার দ্বারা পাণ্ডিৰ জন্ম সেবার সাধারণ ধারা, তা ছাড়া আর কিছু নয়। যে আত্মা সেই বেহে এলো, সে অপরিণত আত্মাই হোক বা পরিণত আত্মাই হোক, তাকে ঐ পাণ্ডিৰ জন্মের বিশিষ্ট ঘটনা-পরম্পরার বিস্তৃতি সংগ্রহ করে যেতেই হবে, আর সেই সংগ্রহের ভিতর থেকে নিজের ঠিক পথটি বুঝে নিয়ে সেই পথে তার পূর্ণতার ফিরে যেতে হবে। এই হলো মোটামুটি কথা।

এবার আসো কিছু প্রশ্ন থাকে তো বলো কেউ কিছু জানতে চাও?

*

প্রশ্ন এমন হওয়া কি সম্ভব...বাপ না যে আত্মানিকে কাননা করবে তাকেই তারা জন্ম দিতে ডাক দিয়ে আসতে পারবে?

উত্তর ডাক দিয়ে আসা? তার জন্য বিশেষরকম ওয়াশস্ত্রি পাকা চাই, যা সাধারণত কারোই থাকে না। তবে এটা নিশ্চয় সম্ভব—নির্ভীক পঙ্কজের মতো সন্তানস্কটের অনিচ্ছা-সহ্য ও কেবল প্রবৃত্তি বা কাননার দ্বারা জন্ম দিয়ে না ফেলে, যথাযথিত মদিচ্ছা ও সং আশ্রুহা নিয়ে জন্মদান করা। প্রার্থনা করার মতো একটি আশ্রুহা থাকবে যাতে কান্না সন্তানের সেহাটী কোনো আশ্রুমানুষ আত্মার উপবৃত্ত হয়—সেই আত্মাকে ঐ বেহে মূর্ত হতে যেন তারা আশ্রয় করতে পারে। সাধারণত এমন হয় না, খুবই কম, কিন্তু আনি কারো কারো কথা ভাবি তারা স্নিকণ দেখে তারই ভিত্ত হুযোগে রীতিমত আশ্রুহা ও ধ্যানের দ্বারা একাগ্রতা এনে নিজের প্রস্তুত হয়ে বিশেষ কোনো অসাধারণ আত্মাকে কাননা করে, তাদের দ্বারা সৃষ্ট সেহাটীতে অবতরণের জন্য।

আগেককার কালে কোনো কোনো দেশে এক্সপ পদ্ধতিই ছিল; আর এখনও বলা হয় যে সন্তানসম্ভবা নারীকে রাখা হবে যথাগন্তব হুন্দর ও সমতিপূর্ণ পরিবেশে, শান্তি ও স্বচ্ছন্দ্যের মধ্যে, যাতে তার গর্ভস্থ সন্তান গর্ভের অনুকূল অবস্থায় মধ্যে বসিত হতে থাকে। এমন ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা উচিত, কারণ বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে সেটা সম্ভব। মানুষ এখন কথেকিই উন্নতিশীল, তাদের পক্ষে এ এমন কিছু অসাধারণ কাজ নয়। অথচ এখনকার পক্ষে এমন কথা বলা প্রায় অসাধারণই বলতে হবে, কারণ কেউই এতটা ভাবে না; এদিকে মানুষ বিবিধভাবে কেবল সন্তানের জন্ম দিয়েই চলেছে।

এই কথাগুলিই মানুষ বড়না ছিল।

যদি বিশেষ কোনো আত্মকে ভেঁকে আসাও সম্ভব, কিন্তু তার জন্য নিঃসংশয়ও তেমন চেষ্টা না থাকে বরংকার, তার যেকোন চাইলে সেই অনুযায়ী প্রকৃতি পাকাও বরংকার। নিত্যন্ত বিরল হলেও তা একেবারে অসম্ভব কথা নয়।

*

প্রশ্ন : সেহ যখন তন্ময় তখন আত্মাটি কি সেই বেহেতু যেতে বাধ্য হয় ?

উত্তর : তোমার প্রশ্ন কি তা বুঝান না।

*

প্রশ্ন : বেহের অন্যান্য নির্ভর করছে বাপ-মায়েদের উপর, কিন্তু তার মধ্যে যে আত্মাটি আসছে সে কি ঐখানেই আসতে বাধ্য হচ্ছে ?

উত্তর : তুমি জানতে চাও যে আত্মাটি নিজের জন্য বিভিন্ন দেহের মধ্যে ইচ্ছানুসৃত একটিকে বেছে নিতে পারে কিনা ?

*

প্রশ্ন : হ্যাঁ, তাই।

উত্তর : এত অসংখ্য মানুষের মধ্যে এসে কোনো চেতনাসীল আত্মার পক্ষে ইচ্ছা পাকা হবেও বাছাই করে কোনো বিশেষ দেহে জন্ম নেওয়া সম্ভব হতে পারে। প্রায়ই তা হয়না। আগেই বলেছি যে, কোনো পরিবর্তিপ্রাপ্ত আত্মা সেহধারণ করতে চাইলে চৈতন্যলোক থেকে সে পৃথিবীর দিকে চেয়ে দুঁছে দেখে তার নিজের নতুন চৈতন্যর আলো কোথাও বেলে কিনা। তাছাড়া তার পূর্বজন্মের অভিজ্ঞতা সকলের শেষে তখনকার সেহ-ত্যাগের সময় কতকটা সংকল্প করা পক্ষে যে পনের বারে সে কেনন বরংকার জন্ম নেবে। কিন্তু অবনতাবে বাছাই করে আসা খুব কন হয়। আমাদের পক্ষে তা হয়তো সম্ভব হতে পারে, কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে ও এমন কি উচ্চশিক্ষিতদের বেনাতেও তা সম্ভব হয়না। আংশিকভাবে পরিণত সত্তা বার বার মেনে আসে নানা আধারের মধ্যে, অথচ একটু ফুটিকের অবস্থা থেকে শুরু করে পূর্ণ পরিণত অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছতে কয়েক হাজার বছর সময় লেগে যায়। যে উচ্চতার উঠলে কোনো আত্মা তার ঐপিত কাছ করার জন্য ইচ্ছানুসৃত জীবন বেছে নিতে পারবে, সেখানে গিয়ে পৌঁছতে তার হাজারের পর হাজার বছর লেগে যায়।

আত্মা বলবে, “না, আমি এ সেহ চাইনা, অন্য সেহ চাই”,.....অবস্থা এমন হওয়াও কিছু অসম্ভব কথা নয়, সবই সম্ভব। নৃত পিত্ত প্রসবের কথা তো জানোই তার মানে কোনো আত্মাই তার সেহের মধ্যে আসেনি। অবস্থা তার অন্যরকম কারণও থাকতে

পারে, হয়তো খুল গঠনের সোম্বেও হতে পারে। ঘাই হোক, পূর্বোক্ত রকম বলাও আবার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়, কিন্তু সাধারণত এই হয় যে মুক্ত ও চেতন আত্মা যখন নিজের আধার বেছে নেয়, তখন সে জন্ম নেবার আগের থেকেই প্রস্তুত হতে থাকে। সুতরাং নির্দিষ্ট ঝাপ-মারের অভ্যাসপ্রবণ কারণে তাকে কেনেভাবেই ঐ স্থান বেছে নিয়েছে, সেখানে সে আলোর আভাস একটু কিছু পেয়েছে—হয়তো একটা সম্ভাবনা মাত্রেরই আলো, তথাপি তাই দেখেই সে এসেছে। সুতরাং যদিও সে বলে, “মা, এটা আমার পছন্দ হচ্ছেনা”, তথাপি তখন আর সে তার ইচ্ছানুসৃত জায়গা খুঁজবে কেনন করে। তাও হতে পারেনা এমন নয়, অসম্ভব কিছুই নেই, কিন্তু প্রায়ই তেমন হয়না। চৈত্যান্যকে থেকে যেটা সে বেছে নেয় তাতে মালারক জুল কিছু হয়না।

এমনও হতে পারে যে আত্মা কোনো সেহ আশ্রয় করে কারণ আগেই তার যাত্রা শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেক কানধাই পাকতে পারে সে যাত্রারতের। যে সকল শিশুরা জন্ম নেবার পরে কিছুদিনের মধ্যেই নানা যায়, হয়তো কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ মাত্র ভ্রম্য বেঁচে থাকে, সেগুলি চয় কতকটা এইরকম ধরনের কারণে। আবার এমনও পোনা যায় যে তারা এসেছিল মন্থ কিছু অভিজ্ঞতার জন্য, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তা শেষ করে আবার চলে গেল। সকল রকমই সম্ভব। আবার ইতিহাস বলতে গেলে এত বিচিত্র রকমের কাহিনী এসে পড়বে, যেমন মানুষদের ইতিহাসেও হয়ে থাকে।

সুতরাং ভোর করে কিছু বলতে যাওয়া, “এ জিনিসটা এমনই হবে, এমন নয়, এইরকম ছাড়া অন্যরকম হতে পারেনা” সোটা হবে নিতান্ত জেনেবানুধি। সকল রকমই হতে পারে। বড়ো ভোর এই পরিস্থিতির সাধারণ ভাবে বলতে পারো যে প্রায়ই এমন হয়ে থাকে, কিন্তু এমন কথা বলতে পারেনা, “সর্বদা এটাই হবে, ওটা অসম্ভব”। বাস্তবে তা নেনোনা।

কিন্তু হাঁ, আত্মা যেখানে সচেতন এসে জেনেওনে আধারটি বেছে নিয়েছে, তেমন আদর্শবলম্বী যদি মানুষী পার্থক্য ধারায় সেহটির জন্ম হয়ে থাকে, তাহলে সেই মানুষ-পঙ্কর মোমগুলিকে খণ্ডন করে নিতে আত্মাকে যথেষ্টই সংগ্রাম করতে হয়।

ঝাপ-মারের তরফে আবার তাদের নিজস্বের গঠন-বৈশিষ্ট্যের প্রণু রয়েছে, তাদের স্বাধস্যের দিকের ভালোমন্দ রয়েছে; অন্য কোনো মোম না থাকলেও পুরুমানুকৃতিক ধারা-ভ্রম্য রয়েছে প্রচুর, তাদের যত্নাত্ম রীতিগুলি, তাদের জন্মাজিত চেতনার এবং অবচেতনের গঠনধারা, তাদের জীবনব্যাপী পরিবেশ, সবকুই-সেখানে রয়েছে; উৎকৃষ্ট প্রকৃতির মানুষ হলেও তাদের মধ্যে এমন কত কিছু আছে যা চৈত্যা জীবনের প্রতিবন্ধক—সব চেয়ে উন্মত্ত ও চেতনামুগ্ধ ব্যক্তিরের বেনাতেও এমন হয়ে থাকে। তাছাড়া আবার আন্যে কত দ্বিগল পরে এসে লুটে যায়। ঝাপ-মারেরা তাদের সম্ভাবনকে ভালো শিকা দিতে চেষ্টা করলেও তার বাল্যকালে এমন সব লোকের সংস্পর্শ আসতে হয় যাদের প্রভাব একেবারে অন্যরকম;

সেই প্রত্যক্ষ এসে নোকে অবচেতনের মধ্যে, তারও বিরুদ্ধে তাকে খুবই নড়াই করতে হয়। তাই পুনরায় বলছি—সেহত্মনের সর্বদান পদ্ধতির কারণে খুব অনুকূল অবস্থাতেও আমরাকে অবশ্য বিবেক সঙ্গুদীন হতে চলে। সেগুলো দেখা দেবে অবচেতনের ভিতর থেকে, তার বিরুদ্ধে নাড়ে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে তোমাকে আপন স্বাভাবিক বিকাশ আনতে চলে।

(৩)

প্রশ্ন : শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন (Synthesis of Yoga-Ch. V) “কিন্তু হৃদয়ে যা তারও পশ্চাতে রয়েছে অপ্রীতির এক জ্যোতিঃ”। এ কোন জ্যোতিঃ ?

উত্তর : ওটি প্রেমের জ্যোতিঃ।

*

প্রশ্ন : এর পরে লিখেছেন “তিনি যদিও তপাকর্ষিত সহজাত পোষি নয়—কারণ মনের অন্তর্গত যা চলেও তাকে মনের ভিতর দিয়েই আসতে হয়—তথাপি সহজাত প্রত্যক্ষ স্পর্শ আছে তার মধ্যে, এবং বাসুদেব জ্ঞানধর্মিত বুদ্ধির চেয়ে তা দিব্যেব অনেক কাছাকাছি।” এর অর্থ কি ?

উত্তর : অর্থাৎ তা কেবল বোধ নয়, একটা উচ্চতর আলো, প্রেমের ভিতর দিয়ে সেই জ্ঞানের আলো। যখন ওঠে, একটা প্রত্যক্ষ জ্ঞানভঙ্গি ঘটে যায়। পোষিও আসে বুদ্ধির অন্তর্ভুক্ত হয়ে, অস্তিত্ব তার অভিব্যক্তিতে—কিন্তু প্রেমের সরাসরি একটা জ্ঞানচেতনা এসে যায়, যা আসে প্রেমহেতু অনেকটা একান্ততার দ্বারা।

*

প্রশ্ন : শ্রীঅরবিন্দ এখানে বলেছেন “আন্তর প্রত্যাক্ষেশের” কথা। তার মানে কি ?

উত্তর : ওরেক্স ? তার মানে একটা নিব্যক্তি, পূরদৃষ্টি, প্রতীক-চেতনা, যা আসে চৈতন্যদ্বারা। মহাপুরুষেরা যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন সে তাঁদের মন থেকে নয়, মনের বোধ ও অনুভবের অতীতে চৈতন্যের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ হতে তা উচ্চারিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ এ কথাও বলেন যে বোধ প্রভৃতি মন থেকে রচিত নয়, কারো বাধা হতে তৈরি হয়নি। তার মূর্ত্তগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে উৎসারিত হয়ে সরাসরি বাণীতে ব্যক্ত হয়েছিল চৈতন্য থেকে।

*

প্রশ্ন : কে-কেউ চৈতন্যের সংস্পর্শ পাবে, তারই কি ঐক্লপ শক্তি হবে ?

উত্তর : তা হবে, অসম্ভবিত্বর ভাবে। আর বস্তু গাঢ় সংস্পর্শ তার শক্তি হবে তত বেশী।
সত্যর বাহ্য সত্তাবনার উপরেও তা নির্ভর করে। সে কথা বচবার সুবিধেই।
চৈতন্যের সংস্পর্শ ঘটলে কতকগুলি গুণ আপনা হতে আসে। কোনো নিরাকর ব্যক্তির যদি
সেই আত্মাত্মীয় সংস্পর্শ ঘটে, তখন দঠাৎ তার মুখে জ্ঞানগর্ভ অধুত বাক্যাসফুরণ আপনা হতে
এসে যায়।

★

প্রশ্ন : যদি হৃদয়বৃত্তির দ্বারা ই অধিকতর প্রত্যক্ষ জ্ঞান বেলে তবে মনের বুদ্ধিবৃত্তির
কি কাজ ?

উত্তর : মন তো জ্ঞানোপায়ের যন্ত্র নয়। কিন্তু জ্ঞান পেলে মন তখন তাকে প্রয়োগ
করতে পারে করে। মনের প্রকৃত কাজই তাই, করের স্রষ্টা ও সম্পাদন করা। বিভিন্ন
বস্তু কিছু প্রেরণা আসে, মনই তাকে ধরে নিরে কাজে ভবিতান্য করে।

এই কাজেই মন লেগে থাকে, যা আসছে উপর থেকে বা আত্মার অতীন্দ্রিয় কেন্দ্র থেকে
তাকে প্রদান করা, তার থেকে সবিস্তারে জিহ্বার সংযোজন্য করা, লীলনের ক্ষুদ্র ব্যাপারেই
হোক বা ভগবতের বৃহৎ ব্যাপারেই হোক আপন উচ্চিৎ কাজগুলি সাধকভাবে সম্পন্ন করা।

এ কথা স্রষ্টাই টের পালে অনেক সময়, যথা, লীলনকে যখন নিয়ন্ত্রিত করতে চাইবে।
মনের বুদ্ধিবৃত্তির একটি দিক আছে যা সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুকে ওড়িয়ে নিয়ে পরিকল্পনা
অনুযায়ী কাজ শুরু করে দেয়। কিন্তু জ্ঞানের স্রষ্টা মন থেকে নয় ; জ্ঞান আসে আত্মার
অতীন্দ্রিয় গভীরতা থেকে বা উচ্চতর চেতনা থেকে—মন তাকে নিয়ে করের ভিত্তিতে
বাস্তবের ভগবৎ প্রদান্য করে।

মনের আসে একটি কাজ আছে, যখন তুমি বুদ্ধির কেন্দ্রগত বুদ্ধিবৃত্তির সংস্পর্শে আসো ;
বিস্তৃত্ত বুদ্ধিচেতনা প্রাণের ঝোঁকের উপর বসেই প্রভাবের দ্বারা তাকে সংযত রাখে। প্রাণের
ভগৎ থেকে যা কিছু আসছে তাকে বুদ্ধির দ্বারা বশে এনে সুস্থভাবে কাজে লাগাতে পারে।
কেবল দেখা চাই যে তা যেন কোনো লক্ষ্যের দিকে প্রবৃত্ত হয়, কোনো উচ্চাশ্রয়ই হোক বা
ভগবৎ চেতনার বিকাশই হোক,—কিন্তু শুধু আত্মবৃত্তির জন্য নয়।

মনের তাহলে এই দুইরকম কাজ : সংযমশক্তি প্রয়োগের যন্ত্ররূপ হওয়া, এবং কর-
নিয়ন্ত্রণ শক্তির যন্ত্ররূপ হওয়া। এইগুলিই তার কাজের প্রকৃত ক্ষেত্র।

★

প্রশ্ন : তবে কি শুধু প্রেরণের দ্বারা ভগবৎ উপলব্ধি বিলম্ব ?

উত্তর : হ্যাঁ গো ছেলে, নিশ্চয়ই তাই। আর তাই সব চেয়ে সেরা উপায়। ভগ-

বানের নাগাল অবধি তুমি পৌঁছতে পারো, এমন কি তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পুনোপনি ভগবৎ চেতনাও পেয়ে যেতে পারো, ভগবানের বহুরূপও হয়ে যেতে পার। কিন্তু পূর্ণসোপান যে উপলব্ধি কানা তা আসবে না, কারণ তোমার যে উপলব্ধি নিম্নে তা হবে একপাশে ধরনের।

★

প্রশ্ন : কিন্তু মনের দিকে কিছু উন্নতি না থাকলে ভগবানকে বাছ করা যায় না তো !

উত্তর : বুদ্ধির দ্বারা তা করা যায় না, বাছ করা যায় আপন কালের দ্বারা, ভাবের দ্বারা, জীবনের দ্বারা।

★

প্রশ্ন : নাহে নাহে বেশি বিষণ্ণতাই এসে বেশীকণ পর্যন্ত লেগে থাকে, প্রকৃত্ততা এসে তা খুবই অল্পকণ দ্বারা থাকে।

উত্তর : হাঁ, এই বকনই হয়।

★

প্রশ্ন : প্রকৃত্ততাকে দীর্ঘস্থায়ী করার কি উপায় ?

উত্তর : কিন্তু মাঝে এই কণাটি জানো, তোমার যে যশে বিষণ্ণতা আর যে যশে প্রকৃত্ততা আসে তা আলাদা আলাদা, দুটোই একই জায়গা নয়।

আর তুমি প্রকৃত্ততাকে আনন্দ বলে ভুল করছ। প্রকৃত্ততা বা স্বধনোদয় হলো প্রাণরাজ্যের জিনিস, তা নিত্যস্থিতি চপল জিনিস। তা ছাড়া স্বেদন চেয়ে এখনকার দিনের জীবনে দুঃখ আসার কারণটিও রয়েছে অনেক বেশী। স্বপ্ন নামে একটা তুষ্টির ভাব, যা এসেই চলে যায়, বেশীকণ ধরে দাখা যায় না, কারণ স্বপ্নের স্পন্দন কিছু বেশীকণ হতে থাকলেই তা যে শুধু নিঃশেষ হয়ে যায় তাই নয়, তা উল্টো তখন অস্বস্তিকর বা এমন কি বিরক্তিকর হয়ে পড়াবে যদিও স্পন্দনটি ঠিক একই রকম হচ্ছে। তত্বটা : স্বপ্ন এলো আর চলে গেল, এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু আনন্দ এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। ওতে ভিতরে একটা উদ্ভাপ আসবে, ফুরিয়ে গেলে উঠবে তার আলো (মাথার মধ্যেও হতে পারে), যাকে বলে দর্শভ্রোটি। এই দ্বিরকদ্বিতীর পরব সম্পদটি এখনও তার পূর্ণবিকাশে পৌঁছয়নি। অথচ আনন্দ যাচ্ছেই, সমস্ত সভ্য ও সারবস্তুর মধ্যে তা নিত্যই বিদ্যমান, আত্মার মধ্যে, চৈতন্যের মধ্যে তা সব সময়েই আছে।

আনন্দ হলো এক অত্যাশ্চর্য আজ্ঞান, স্বেদনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই।

কিন্তু ভিতরকার চৈতন্যের চেতনা পূর্ণরূপে না আসা পর্যন্ত আনন্দের অনুভব হওয়া

খুবই বিরল। যদিও আসে তখনই চলে যায়, কারণ ত্রোনার ননদ্বন্দ্ব এখনও তার উপযোগী নয়। অপরপক্ষে ত্রোনার দাগাদাগ প্রানধরী অবস্থাতে তুমি নিত্যই অবস্থান করছ, ওখানকার পক্ষে অপ্রীতিকর কিছু ঘটলেই সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়বে বিধগুতা—তার বানে তুমি দুর্ভাগ হ'লে তখন সেখানে আসে বিলগুতা, তুমি সবল হলে সেখানে আসে বিদ্রোহ। কোন কিছু কাননার অপূর্ণতা, প্রতিবন্ধকতা, বাইরের কোনো অব্যাহিত সংস্পর্শ তাতেই ওগুলি আসবে, এই স্বাভাবিক আর এমনই বর্তমান দিনের জীবন। একবার খারী জিনিস হলো আনন্দ। সমস্ত ভিতরকার সমস্তের দেখা পেলেনই সেখানে যে আনন্দ তার মধ্যে চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে।

*

প্রশ্ন কিয়ৎ রূপের মধ্যে দুইরকম কিয় হতে দেখি; তার মধ্যে বিজ্ঞ মনিসও থাকে আবার প্রাণের ঝোঁকও থাকে। এমন বিশৃণ এলে পড়ে কেন্দন করে? দুটি যখন এক ভায়গাতেই হচ্ছে, তাই নয় কি?

উত্তর না, দিক এক জায়গাতে নয়।

এখানে দুইদেহের দুই অঙ্গের কথা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে রূপকেত্রের কথা (যা বুকের মাধ্যমে আত্ম নিয়ন্ত্রণে দেখানো)। এর মধ্যে গভীরতার মানা স্বর আছে।

এর মধ্যে যত বাইরের দিকে যাবে ততই সেখানে পাবে প্রাণের ঝোঁকের বিশৃণ, এমন কি স্বেচ্ছাসংকল্পিত প্রতিফ্রিয়া ও সংবেদনে তা পরিপূর্ণ। আর যত গভীরের দিকে যাবে ততই পাবে কম বিশৃণ। খুব গভীরের অনুভূতি একেবারে বিজ্ঞ। গভীরতার তত্ত্ব-ভ্রমের উপরেই সমস্ত নির্ভর করে।

কিন্তু ত্রোনা সর্বশেষ থাকে। বাইরের দিকটা নিয়ে, বাহ্য বোধগুলি নিয়েই নিত্য কারসার, যেন নিজের বাইরে বাইরেই সব সময় কেটে যাচ্ছে। যে মুহূর্তে নিজেকে একটু পর্যবেক্ষণ করতে যাও, একটু খেনে কোথায় কি হচ্ছে তাই যদি শুধু জানতে চাও, অবনি তখনই তোমাকে গুলিয়ে গিয়ে বাইরের চেতনাকে ভিতরে ফেনে নিতে হয়। সেই বাহ্য চেতনাই বাইরের দিকের সংস্পর্শগুলি নিচ্ছে, অন্যের দিক থেকে অনুকূল স্পন্দন এসে তার সঙ্গে নিজের সংস্পর্শ ঘটাবে। এ ক্রিয়া চলতে থাকে যেন ত্রোনার বাইরের কোনো অংশে।

সাধারণ চেতনাগুলো এই জাবেই চারিদিকে ব্যাপ্ত হচ্ছে।

যেমন মনে করে, কোনো অনুপ্রেরণা এলো চেতনার ভিতর থেকে (যারা আপন চেতনা সম্বন্ধে চেতন নয় তাদেরও সেখান থেকে একরকম অনুপ্রেরণা আসে)। প্রকাশ হতে চাইলে তাকে বাইরের দিকে আসতেই হবে। আর বাইরে এলেই তা বিশেষ যাবে বাইরের যত ভেজালের সঙ্গে, কারণ বাইরের দিকের জাতে লাভ আছে। যেমন, প্রাণের ভরফের যত কিছু কাবনা বালনা, তারা যেননি সেখানে যে ভিতর থেকে একটা শক্তি বের আসছে, অবনি তাকে

ছড়িয়ে নিয়ে আপন কাজে লাগালে। কিংবা হয়তো যারা ননপ্রধান, আপন অনুভূতিক পর্বত যাত্রা “বুঝে নিতে” চায়, তাকে নিয়ে ওজন ক’রে বিচার ক’রে লেখতে চায়, তাদের মন সেই অনুপ্রেরণাকে ধরে নিয়ে ঐ সকল ক্রিয়া করতে থাকে, তাতেই একটা বিশৃংখ এসে সব নষ্ট হয়ে যায়। নিতাই এমন হচ্ছে, বাইরের ক্রিয়া ভিতরের প্রেরণার সঙ্গে মিশে তাকে বিকৃত করতে, তাকে চেপে দিয়ে পচ্চিয়ে নষ্ট করতে, তাই শেষ পর্যন্ত আসল জিনিসটিকে সঙ্গে মিশে তাকে বিকৃত করতে, তাকে চেপে দিয়ে পচ্চিয়ে নষ্ট করতে, তাই শেষ পর্যন্ত আসল জিনিসটিকে চেনা পর্যন্ত যাচ্ছে না।

*

প্রশ্ন : বাইরের দিকের ঝোঁক ভিতরের দিকের অনুপ্রেরণার সাক্ষাৎ পোনে, তাকেই নষ্ট না ক’রে বরং তার দ্বারা সেই ঝোঁকেরই রূপান্তর হওয়া উচিত নয় কি ?

উত্তর : এটা দ্বিক কথা, পরস্পরের বহো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া একটা ত্রো চলাবেই, তবে তার ফল হবে পরস্পরের ওজস্বের অনুপাতে। এই সব ব্যাপারের উপযুক্ত প্রতিকার আছে, নতুবা উন্মাদনের কারো কোনো অশাঈ থাকত না। ভিতরকার অনুপ্রেরণা তার নিজের কাছ যাচোকে কিছু করবেই, সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে না—সে কথা নয়। তবে কাজ করলেও তার বহো বিশৃংখ এসে যায়, তার ওজস্ব ও যৌনিক শক্তি চারিধে যায়। সেম যদি একটু কিছু বাকী থাকে, কিন্তু তার সাক্ষ্য নির্ভর করে শক্তির তারতম্যের উপর, যার প্রত্যেকের পক্ষেই তা বিভিন্ন প্রকার।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে চৈতন্য বর্ধন একটা কিছু উদ্দেশ্যে তার শক্তি প্রয়োগ করে, তখন তাকে স্পষ্ট চৈতন্যপ্রেরণা বলেই চেনা যায়। আবার কখনো বা লেখা যায় একটা ছায়ার মতো জিনিস মন বা প্রাণের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে মিশে গেল, কিন্তু সেই জিনিসের তেমন বিশেষ লান নেই, তাকে প্রশ্নের না দিলে তা প্রেরণার প্রকৃতিকে বদলাতে পারে না।

একটা সময় আসে যখন অভ্যন্তরীণ অনুপ্রেরণা ত্রোমকে ডাক দিয়ে আদেশ করতে থাকে, তখন তার কথা মানতেই হয়, তখন তা বিগত থেকে ত্রোমকে দিয়ে ভগবানের ইচ্ছা মফল করে।

*

প্রশ্ন : বলা হচ্ছে : “আত্মাকেই অনুসরণ করো, নবকে নয়, কারণ মন কেবল বাহ্য-রূপ দেখেই বস্ত হয়ে ওঠে...”। কিন্তু বৈদগ্ধি জীবনের ক্ষেত্রে তা কখন করে করবে ?

উত্তর : এটি হলো ব্যক্তিগত প্রশ্ন।

প্রথমতঃ এমন অবস্থাটি নিচ্ছেন মধ্যে এনে ফেলা চাই যাতে আত্মার ভিত্তিকার প্রেরণাকে ঠিক করতে পারেন—যা কণা এখনই বলনাম—কারণ করতে না পারলে তাকে অনুসরণ করবে কেনন করে ? সুতরাং আত্মার সহজে একটু চেতনা আনতে হবে। তারপর সেখানকার অনুপ্রেরণা এনে তখন যুক্তিযুক্তির কথাই পরিবর্তে তাকেই আনবে।

কেনন ভাবে কোন প্রণালীতে তুমি তা করবে সে প্রশ্ন ব্যক্তিগত। প্রত্যেককেই তা নিজে বুঝে নিতে হবে, কারণ প্রত্যেকের মেলাতেই তা স্বতন্ত্র। আত্মার প্রেরণা সহজে কতখানি তুমি চেতন হবেন আর কতখানি তার সঙ্গে একাত্ম হয়েছ, তারই উপর সব নির্ভর করে। একই উপায় ভগবতের সকলের পক্ষে খাটে না।

(৪)

প্রশ্ন শ্রীমদ্রবিশ্ব বলেনছেন, আগে ভিতরের আলোর সন্ধান করতে, তার পরে বহ্য-বস্তুর কাছে আরসমর্পণ করতে। কিন্তু এখন যখন অস্তিত্বমানদের অবতরণ ঘটে গেছে, এখন কি তা আগের চেয়ে সহজসাধ্য হবে ?

উত্তর তা, ভিতরের আলো তো আছেই। তবে আর মূণকিন কিসের ? তার সন্ধানে বাধা কোথায় তোমার ঠেকছে ? কঠিন লাগছে কোথায় ?

*

প্রশ্ন তাই করতে চলে তবে আর ঐ অস্তিত্বমানদের অবতরণের ফল কি হলো ?

উত্তর অপেক্ষা ক'বে দেখ, তোমার মধ্যে যখন তার ফল ফলবে তখনই জানবে। বেশ তো, মনে করো একটা অন্ধকার ঘরকে আলো করতে তুমি কেরোসিনের বাতি মেনেছো, আগেকার কালে যা করা হতো। ঘাট বছর আগে সেই ল্যাম্পাই ছিল, তখন মোক-বাতিও হয় নি ; পরে এলো মোমবাতি, আগের চেয়ে একটু উন্নতি হলো, যদিও ফল প্রায় একই সমান। সে সময়ে মোমবাতি নিয়েই কাজ চালানো হচ্ছিল। তার পরে হঠাৎ কেউ একজন আবিষ্কার করলে বিদ্যুতের আলো। তাই এখন সেই আগেকার কেরোসিন আলোর বদলে ইলেক্ট্রিক আলো মনেছে, এখন আগের চেয়ে দশগুণ বেশী আলো হচ্ছে। তাহ'লে এখন তোমার লমপ্যাটা কোথায় ধ'ড়োচ্ছে ? ঘরে তোমার বস্তাবই আলো জ্বালা আছে ভিতরের ঘরের কথা বলছি কেনন কেরোসিনের বদলে সেটা ইলেক্ট্রিক হবে। এই তো কথা। বুঝতে পারলে ? এ কথা বোঝা এমন শক্ত নয়।

*

প্রশ্ন : কিন্তু সে আলো দেখা যাচ্ছে কই ?

উত্তর : দেখতে চাও ? ভিতরে ঢুকে যাও, সেখানে দেখতে পাবে ।

*

প্রশ্ন : কেমন করে ঢুকবে ভিতরে ?

উত্তর : চাবি দিয়ে আগে ভিতরের দরজা খোলো ।

কিংবা দরজার মুখে বসে প্রতীক্ষা করে থাকো, যতক্ষণ পর্যন্ত দরজা খোলার সঙ্গ বা শক্তি বা কৌশল না পাচ্ছ, যেমন জনৈক আরব্য ব্রহ্মণীর ধারণা । ঠাট্টা করছি না, গম্ভীর ভাবেই বলছি । দরজার মুখে বসে থাকতে হবে, অতিরিক্ত রকম একাগ্রহতা আনতে হবে, তবে নিশ্চয়ে দরজা খোলার চাবি কিংবা শক্তি কিংবা সঙ্গ ।

কিন্তু যদি কোনো চেষ্টাই না, করো, দরজা আপনা হতে খুলবে না । দরজা কয়েক হাজার বছর পরে খুলে যেতে পারে, কিন্তু তুমি চাইছ যে এমনই খুলে যাক—তাহলে ? তাহলে উপায় কিছু না বোঝা পর্যন্ত দরজার সামনে শক্ত জিম্ব ধরে বসে থাকতে হয় । একটা চাবি কিংবা শক্তি কিংবা সঙ্গ, যাই হোক না কেন তোমার পাওয়াই চাই, এই সংকল্প নিয়ে অশা নিয়ে ঠায় দরজার সামনে বসে থাকা, যতক্ষণ পর্যন্ত না খুলতে পারছ ।

সকল রকমের ভাবনা চিন্তা ছেড়ে দিয়ে ঐভাবে বসতে হবে ।

একদিনের ভাবনা তোমার থাকবে, ঐ দরজা খোলার ভাবনা ।

*

প্রশ্ন : চাবি নোকানার কোনো ফুটো নেই, যেখান দিয়ে কিছু আলো দেখা যাবে ?

উত্তর : ফুটো ? তার মানে কি ? আলো আসার নতো একটা ভিন্ন ?.....হাঁ, তাও দরজা আছে, আলো আগেও সেখান দিয়ে, কিন্তু তুমি তা দেখতে পাও না ।

আলো বৈকি আলো । কিন্তু সে আবার আলোই প্রশ্ন । আগে তোমার চোখ খোলা চাই, খোলা চোখে দেখতে দেখা চাই ।

খুব বাচ্চা বাচ্চা শিওর। প্রথমে চোখে দেখতে পায় না বাচ্চা ভদ্রাও চোখে দেখে না বেড়ালের জন্যও প্রথমে কিছু দেখেনা । কয়েক ঘন্টা বা কিছুকাল বাচ্চা তখন চোখ ফুটে দেখতে পায় । তোমাকেও তেমনি করে চোখ ফুটে দেখতে শিখতে হবে ।

(৫)

নিম্নোক্ত আত্মপ্রসারণ

ফ্লোরিডার পর থেকে আমার কাছে অনবরত নানান প্রশ্ন আসছে : “অভিনাস এখন কি রকমের কাজ করবে ? কেমন ভাবে তাকে আরও সেবা ? কেমন আকারে তা অভিব্যক্ত হবে ?” যতটা পেরেছি এই সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছি । কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের

যে বটবানি রয়েছে বেশ সম্বন্ধে (On the Veda), তার একটি পৃষ্ঠাতে নীচেকার কুটিনোটে যা লেখা আছে তাতেই এ সব প্রশ্নের স্থলস্থল জবাব দেওয়া আছে । সকলকেই আমি বলি, শ্রীঅরবিন্দ যা লিখেছেন তা যদি একটি কষ্ট করে পড়ে, তাহলে তোনাদের অনেক প্রশ্নই অনাবশ্যক হয়ে যায়, কারণ প্রশ্নের আগেই তিনি তার জবাব লিখে রেখেছেন । যারা সেগুলো পড়েন তাদের হয়তো ভেদন সবার নেই, খৈর্ষ নেই, আর ইচ্ছা বা প্রয়োজনও নেই । কোনোটাই তারা পড়ে না । বইগুলো ছাড়া হয়ে যেখানে যায়, যথেষ্ট বিতরণও হয়, কিন্তু খুব কম লোকেই তা পড়ে । সে যাই হোক, শ্রীঅরবিন্দের এই জবাব সেওয়াই রয়েছে । ঐহ্য কথাগুলো জানো করে একটি ভেবে দেখো, তারপর কিছু প্রশ্ন থাকে তো বোনো, আমি বুঝিয়ে দেবো । এখন শোনো সোটি

“নিমিত্তা পুণ্যাবধের ও আত্মপরিণতির ফলে এবং উগ্ধবৎ-ইচ্ছাতে অতিনিমানস জগতের অভ্যুদয়ান বা সৃষ্টি হলে ।” (On the Veda ৬৩ পৃঃ, সোটি ২)

এ কথার সর্ম্মার্থ হলো এই যে, তুমি যদি চাও জোনার মধ্যে অতিনিমানস সত্তা সার্ব্বকভাবে গঠিত হয়ে উঠুক এবং তার থেকে ক্রমে অতিনিমানসের জগৎ স্রষ্ট হোক, তাহলে—প্রথমত জোনার নিমিত্তের চেতনাকে যথেষ্ট প্রশারিত করতে হবে এবং আত্মপরিণতির দিকে নিরন্তর অগ্রসর হয়ে চলতে হবে, তা ছাড়া অন্য কোনো দিকে ঝোঁক থাকবে না,—তার মানে গোড়ায় কেবল একটি আশুচা, একটি চেত্না, তার পরেই চাল চেড়ে দিয়ে সিদ্ধা, এমন হলে চলবে না, —সত্তার মধ্যে সর্ব্বকণ ভোগে পাকা চাই সেই ভাবটি, সর্ব্বকণ থাকবে কেবল তার জন্যই ইচ্ছা, চেত্না, ভাবনা ।

প্রত্যয় যদি শুধু পাঁচ মিনিটের জন্য স্মরণ করে যে এই বিশ্বে অতিনিমানস শক্তি বলে কিছু রয়েছে, তা যদি এসে আবার মধ্যে অতিবাহিত পায় তবে খুব ভালোই হয়, এবং তারপর অবশিষ্ট সময় অন্যান্য চিন্তায় কাটাতে থাকে, তাহলে সেই ভিনিস যে জোনার মধ্যে এসে যথারীতি তার কাজ শুরু করে দেবে, এমন ব্রহ্মবের কোনো সম্ভাবনাই নেই । শ্রীঅরবিন্দ সে কথা খুব স্পষ্টভাবেই বলেছেন । আর জোনার চেত্নার জোরেই তা যে হয়ে যাবে এমন কথাও তিনি বলছেন না, বলে দিয়েছেন যে তা হবে উগ্ধবৎ-ইচ্ছাতে । সত্তারঃ এমন কথা যেন আবার কাড় বসতে এসে না, “কৈ আমার এত চেত্নাতেও কিছু হচ্ছে না !” তুমি যে নিজে তাই চেষ্টাতে পারবে এমন কথা এখানে বলাই হচ্ছে না, শুধু জোনাকে বলা হচ্ছে যে সত্তার মধ্যে প্রবল আশুচা আনো আর চিন্তার প্রশারণ করতে থাকো, যাতে চেত্না যথেষ্ট বিস্তার পেতে থাকে ।

কারণ সত্তা কথা বলতে কি, সকলেই জোনা ছোটো, নিতান্তই ছোটো আর ছোটো, এতই ছোটো যে অতিনিমানসকে তার মধ্যে খাঁটাতে পারা যায় না । এত ছোটো যে তুলছ করেকটি ক্রিয়াতেই তা বোঝাই হয়ে যায় । সত্তাকে তার চেয়ে অনেক বেশী বড়ো করতে হবে, তবেই সেখানে অতিনিমানসের কাজ করবার উপযুক্ত কারণ্য হতে পারবে ।

যার উন্নয়নের একটা আশুতা পাকা চাই। যেমন আছি আর যা ক্ষতি তাতেই খুশি থাকি নহ, যা ছানি আর যা নিশাস করি তাই দিয়েই নিশিচয় পাকা নয়, কিং নিশা আশুতা থাকবে যে এর চেয়ে আগে কিছু হোক, এর চেয়ে আগে ভালো হোক,—‘বৃহত্তর আলোর দিকে উচ্চতর চেতনার দিকে, সত্যের চেয়েও অধিকতর সত্যের দিকে, ভালোর চেয়েও ব্যাপকতর ভালোর দিকে যেন অগ্রসর চট। আর সব কিছুর উপর এক ওভেচরা থাকবে অটুট হয়ে।

অন্য করেকন্দিগের মধ্যে ই তিনিস আসে না।

আমিও সকল দিক বিবেচনা করে যথেষ্ট শতর্ক হয়েই বলেছিলাম যে এইসব পুণিনীকে সুযোগ দেওয়া হলো, অতিনিমাল শক্তিকে গ্রহণ করতে এবং তার যথাযথ বিকাশ ঘটানো ; তার মানে এই নয় যে সেই বিকাশ সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে যাবে, আর প্রত্যেক লোকই নিম্ন চেতনার সকল সত্তাবনার ও সকল সিদ্ধির চূড়ান্তে উঠে যাবে। আমি তখন এ কথাও বলেছি যে জা এত সোচ্চার নয় আর এও বলেছি যে তার জন্য সময় লাগবে যথেষ্ট। তবু লোকে আমিণ করতে শুরু করেন যে অতিনিমাল এসে পড়াতেও আবারও সুবিধা কিছু হয়নি, পরং কোথাও কোথাও অবস্থা আরো বেশী করিন হয় উঠেছে। খুবই দুঃখের কথা, তবে আমি তার কি করতে পারি। অতিনিমাল শক্তিরও এতে কোনো অপরাধ নেই। যেমন ভাবে তাকে দেওয়া হচ্ছে সেই দিক দিয়েই শেষ হচ্ছে। কারণ এমন দৃষ্টান্তও আমি দেখতে পাচ্ছি যেখানে আশুতা ঐচ্ছাসিক হওয়াতে আর সহযোগিতা পুরোপুরি থাকতে যথেষ্ট ফল হচ্ছে, আগে যা খুবই করিন ছিল এখন সে ক্ষেত্রে খুবই সফল হয়ে এসেছে।

কিন্তু এখানে একরূপ ভাবের সঙ্গে অন্যরূপ ভাবের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে,—একটি হলো শুধু মনেরই ক্ষেত্রের আর শুধু এই সম্পর্কিত ভাব আর কথাগুলিকে নিয়েই নাড়াচাড়া করতে থাকা, আর একটি হলো সত্যের অন্তরস্থ খাঁটি আশুতা। এতেই সমস্ত কিছু যায় আসে ; এই প্রকৃত আশুতা ও আত্মস্বর্গীয় ইচ্ছাতে বলে যে ই তিনিস আমার চাইই চাই, চাই আমার ই উপলব্ধি, ও চাড়া সব কিছু মূল্যহীন, ও চাড়া শুধু বেঁচে-থাকা-অস্তিত্বের কোনো অর্থ ই নেই।

এইভাবে তাকে চাইতে হবে, যদি সেই অতিনিমালকে ব্যবহার জোখে দেখতে চাও। আমি সেহের রূপান্তর আমার কথা বলছি না, কারণ জোবান সবাই জানে যে সেহের ওজনটা ফেলে দিয়ে এক জ্যোতির্গত ও মননীয় বেহে পরিণত হয়ে যেখানে সেখানে উড়ে বেড়াবে, একই সময়ে বারোটা মানে আবির্ভূত হবে...এটা স্বাভাবিক সত্য নয় না,—যাশা করি জোবান এটা নির্বোধ নয় যে এমনি কিছু প্রত্যাশা এই মুহূর্তে করবে—তার জন্য সময় লাগে।

ঝোটার উপর সমস্তই চেতনার কাজ,—যথাসম্ভব আরম্ভ, সেহের উপর অধিকার, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, একান্তবোধের শক্তি, আবার দৃষ্টির পরিবর্তে স্বচ্ছ দৃষ্টি, বাহ্য মায়া ও কীকিকে

সত্য বলে না দেখা।—এই সমস্ত মিলে একটা পুস্তাক রচনের আভাস্তরীণ চেতনা আসা ; নিজে পুস্তক হয়ে উঠতে পারলেই তা এসে যাবে।

যোনীনাট্য তখন এই যোধ হতে থাকবে যে আমার এই শ্বাসগ্রহণ জীবন্ত, আমার এই পল্লি অধিনশুব তোমার কি করতে হবে তা শ্রী তখন জানতে পারবে, অস্ত্রের বজো ছাড়াতে হবে না, ভিতর থেকে শ্রুষ্টি নির্দেশ মিলবে ; তখন বলবে এ সকল জিনিস আসল নয়, আসল হলো ঐ জিনিস। তোমাকে আরো পুস্তক হতে হবে, পুস্তক হয়ে উঠলে তৎকথাৎ সবই আসনের মধ্যে আসবে।

(৬)

পুশ্র তর্কেটি যে, কেউ যদি উল্কাপাত হতে দেখে, আর তৎকথাৎ সেই মুহূর্তেই কোনো কিছুর জ্ঞান আশ্পৃহা করতে পারে, তাহলে সে আশ্পৃহা এক বছরেই সত্য হয়। এ কি সত্য ?

উক্ত উল্কাটি এখন বলন্ত অবস্থায় দেখতো তার সঙ্গে সঙ্গেই আশ্পৃহাটি জেগে ওঠা চাই, কিন্তু উল্কা তো গিরাছুই কখনকারী। ওইই মুহূর্তের মধ্যে যদি সে আশ্পৃহা তোমার জেগে উঠতে পারে, তাহলে বুঝতে হবে তা যাগের থেকেই তোমার চেতনার সামনে ছাতির চিত্র। বাহ্য কোন আশ্পৃহা নয়, এখানে আভাস্তরীণ আশ্পৃহাবই কথা হচ্ছে। তাহলে যে কথা তোমার চেতনাকে খনন ভাবে অধিকার করে উন্মূগ হয়ে আছে, তা অতি শীঘ্র সফল হো হুগেই। আমিও একবার এটা পরীক্ষা করে দেখছি। যে মুহূর্তে উল্কার আলো চেতনের সমুদ্র নিয়ে চলে যাচ্ছে তৎকথাৎ আমার চেতনা থেকে এই কথা বেরিয়ে গেল, “আবার যেহ যেন তপস্বৎ-বিলন লাভ করে।” বছর নামেকের মধ্যেই আমার সে আশ্পৃহা সফল হয়েছিল। কিন্তু তার কারণ ঐ উল্কার্শন নয়। আশ্পৃহাটি আমার সমগ্র চেতনাকে সর্বক্ষণ অধিকার করে থাকতো—আমি কেবল তাই ভাবতাম, তাই চাইতাম, তারই জন্য নিত্যা সাধনা করতাম। তার ফলে যে জিনিস নিম্নোক্ত প্রায় সামাজীবন লাগে (বলা হয় যে অষ্ট ৫৫ বছর !) তা বাহ্যে আসেই মিলে গেল।

কিন্তু আমার ছিল কেবল ঐ এক চিন্তা। আর সেই কারণেই যেননি শ্রুতিন্দ্র বলতে দেখেছি এমন সঙ্গে সঙ্গে আশ্পৃহাটিও ব্যস্ত হয়েছিল—অশ্রুষ্টিরূপে নয়—শ্রুটি ভাষাতেই বলেছি “আবার যেহ যেন তপস্বৎ-বিলন লাভ করে।”

এখানে উল্কাটি বড়ো কথা নয়। আসল কথা আশ্পৃহা। তেমন জোর আশ্পৃহা থাকলে তার পূরণের জন্য উল্কার পরকার হয় না। পরকার কেবল সমগ্র ইচ্ছাশক্তিকে ঐ একাধিনায়া বিশুদ্ধে কেন্দ্রীভূত ও একাগ্র করা।

(৭)

প্রশ্ন : কুচিভাঙনো কেন আসে ?

উত্তর : ভোনারের কি বলিনি সে কথা ? এ প্রশ্ন তো অনেক পুরোনো । একশো বার বলেছি ভোনারের, কিন্তু ভোনারের মাথার তা চোকেদি ।

কুচিভাঙ যত বকনের আছে, তার কারণও তত বকনের আছে । প্রত্যেকটি চিহ্ন আসে তার নির্দিষ্ট কারণ হতে ; প্রবণতা থাকলে আসে, দুর্ভিক্ষের ভুগলে আসে, চাইলে আসে, অনুকূল অবস্থা পেলে আসে, আরো অনেক কারণে আসে, আবার সমস্ত কারণ একত্রে বলিয়েই আসে ।

কিন্তু যে চিহ্নটি ভোনার কাছে আসছে তার মতো কোনো অনুকূল অংশ ভোনার মধ্যে রয়েছে বলেই তা আসছে, নতুবা তা ভোনার কাছে এলেও চোখের সামনে দিয়ে পার হয়ে যাবে, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করবে না । হঠাৎ এ প্রশ্ন করার মনেই হলো কুচিভাঙ কিছু এসেছে । তার আগবার রাত্তা রয়েছে বহু বকনের ।

ভোনারের এ কথা বলাই হয়েছে যে বনের ভিত্তরকার যে পরিবেশ, তা ঘাটের ভিত্তর পরিবেশের চেয়েও ভীষণ, অসংখ্য বকনের ধারণা আর ভাবনা অববর্তাই এমন জট পাঁকাচ্ছে যে তার থেকে কোনো একটিকে আলাদা করে টেনে বের করা প্রায় অসম্ভব । ভোনার মাথা ভুবে আছে তার মধ্যে, মন হানুড়ু খাচ্ছে তার চেয়ে আরো বেশী, সবুজের রান করতে গেলে বেনম হানুড়ু খেতে হয় । চেউএর পর চেউ আসছে, যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে, নাহিছে বাজা, ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, বেরিয়ে চলে যাচ্ছে !

মনের যা পরিবেশ তার সবচেয়ে পুরো সচেতন হলো তখনই পাখান হয়ে কেতে । তাই প্রত্যেকেরই মস্তিষ্কের মধ্যে জীবনের অধিকাংশ সময়ের জন্য বাঁধের বেড়া দেওয়া থাকে, যা চেতনার হাঁকনির মতো সেগুলোকে আটক করে রাখে ।

যদি ভোনাকে ঐ বাঁধ থেকে বেরিয়ে ঐ পরিবেশের মাঝখানে থেকে সব কিছুই লক্ষ্য করতে হয় (মন ছাড়া প্রাণসত্তার পক্ষেও এই একই কথা, বরং তার পরিবেশ এর চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর), তাহলে ভোনাকে পুরো নিরোঁট চরিত্রের হতে হবে, নিছকের ভিত্তরটাকে সম্পূর্ণ নিরোঁট ক'রে ফেলতে হবে । বোঁট কথা, তুমি দেখতে পাও আর নাই পাও, জানো কিংবা নাই জানো, ব্যাপারটা হলো ঠিক এইরকম । সুতরাং কুচিভাঙ কোথা থেকে আসছে এ প্রশ্নই ওঠে না—কুচিভাঙ সর্বত্রই আছে । কেন আসে ? না এসে যাবে কোথা ? তুমি যে তার মধ্যেই আছো ।

চেতনার হাঁকনি কেনমতাবে কাজ করবে, যাত্রা বিশেষ কতগুলি কুচিভাঙকেই ভোনার মধ্যে ঢুকতে দেবে আর থাকী গুলোকে কেন দেবে না,—তা নির্ভর করে ভোনার আভ্যন্তরীণ

অবস্থা, ত্রোনার প্রবণতা, আত্মসীরাণ অভ্যাসবাহ্য (নবের কথাই এখানে বলছি, চৈতন্যের মত,) ত্রোনার শিক্তা ও নক্ষিক-বিকাশ প্রভৃতির উপর। এ প্রাক্তনি ত্রোনার আনিবের তৈরি, তাই সেই অনুসারেই কতকগুলি চিত্রা সেখানে আটকে থাকে আর কতকগুলি গলে আসে। কেবল ধরনের চিত্রা গলে যেখানে আসছে তার নমুনা থেকে প্রমাণ করা যায় যে কেবল ত্রোনার চরিত্র,—সে চরিত্র অবচ্ছিন্নে রয়েছে বলে ত্রোনার নিজেই ও জানা সেই, কেউই নিজেই আনয়ন ঠিক ভাবে চিনি না, কিন্তু কোন দিকে যে ত্রোনার ঠোঁড় তা ওর থেকে বোঝা যায়। সোজা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি, একজন আশাবাদীকে দেখ, তার কাছে কেবল আশার চিত্রাই পাবে, আর নিরাশাবাদীর কাছে নিরাশার কথাই পাবে (এটা সাধারণ ভাবেই বলা চলে); বিস্তারিতর কাছে দেখবে কেবল বিস্তারিতের চিত্রা ; ভেড়া প্রকৃতির মানুষের কাছে হস্ত ভেড়ার মতো চিত্রা (অর্থাৎ ভেড়াদের যদি চিত্রা বলে কিছু থাকে)। এই হলো সাধারণ নিয়ম।

কিন্তু যদি তুমি উনুয়নের সংকল্প নিয়ে যোগের পথে যাও, তাহলে তখন দেখা দেবে মনু কিছু ব্যাপার। যেমনি কোন দিকে এগোতে চাইবে, অননি ভিতরের ও চারপাশের সবস্ত বিবোধী শক্তির কাছ থেকে পদে পদে ধাক্কা খাবে, তারা তা হতে দিতে চায় না ; সেই বাধাগুলোই তখন নানারূপ বিরুদ্ধ চিত্রার রূপান্তরিত হতে থাকবে।

মনে করো তুমি খাবার লোভটা ছাড়তে চাও। অননি উনুই ক্ষতবক্ষত খাবার চিত্রাই জোনাকে পেয়ে পাবে, কি খাবে আর কি খাবে না, কেবলভাবে খাবে আর কেবলভাবে খাওয়া ঠিক হবে না ; এমন চিত্রাই তখন নাথায় আসতে থাকবে, আর তাকে স্বাভাবিক বলেই মনে হবে। আর যতই নিজে বলতে থাকবে, “নাঃ, এ সব চিত্রা ধূর হলেই বাঁচি, এতেই এগোবার পথে বাধা হচ্ছে,” ততই তা আরো বেশী বেশী আসতে থাকবে, সম্পূর্ণ নিঃসাড়, বতকণ আত্মসীরাণ উনুই শক্তির এমন স্তরে গিয়ে না পড়তো যাতে সেই উচ্চতা থেকে ও-স্তরোকে তাদের যথাস্থানে ফেরত পাঠাতে পারো—বিশেষ মধ্য তালে পান খুব বিকৃত নয়। সকল কিছুই বেনাতেই এমন। হস্তগাং ত্রোনার কর্ণ ও প্রবণতা কেবল যে তার অনুকূল চিত্রার সঙ্গেই সংযোগ ঘটাবে এমন কথা নয়, কিন্তু তার বিপরীত চিত্রার সঙ্গেও ত্রোনা কে ছড়াবে। যদি গোড়া থেকেই সতর্ক থাকতে নব না করে, তবে ত্রোনা কে তা চিত্রার এক বৃদ্ধকেই করে তুলবে।

যদি তুমি উপরকার স্তরে হৃদয় কল্পনার স্রোতে উঠে যাও, যে স্থান সোহাগ্রী সাধারণ মনের নাগালের মধ্যে নয়, তখন সেখান থেকে লক্ষ্য করবে এই সব বিরোধ ও সংগ্রাম কেবল ভাবে হচ্ছে। চিত্রার নারপ্যাচ ও কাটাকাটি কেবল হয় তা কোডুয়নের সঙ্গে তখন দেখতে থাকবে, ত্রোনাকে তা স্পর্শ করবে না কিংবা ছড়াবে না। তার চেয়ে আরো উপরে উঠে যদি আপন লক্ষ্যের দিকে অবদিত হও, তাহলে চিত্রাগুলিকে ক্রমে ভাঙ করে নিতে অভ্যাস হবে, যেগুলি ত্রোনার লক্ষ্যের অনুকূল তাকে বেছে নিয়ে বাঁকীগুলিকে প্রতিকূল ও হানিকর কোনে বর্জন করতে থাকবে ; কোনো চিত্রাই যাতে ত্রোনাকে বিচলিত না করে সেইভাবেই

সবগুলিকে দেখবে। কিন্তু যতক্ষণ এই নীচের দ্বারে আছে ততক্ষণ বিচলিত হওয়া এড়াতে পারবে না।

সব চেয়ে প্রেম কাচ হবে এমন কিছু নিয়ে নিযুক্ত থাকা যাতে তোনাকে সর্বক্ষণ একান্ত থাকতে বাধ্য হতে হয়, অশায়ন, অধ্যাপন, কিংবা কিছু হাতের কাজ, কিংবা এমন কিছু যাতে সেহ মনকে নিযুক্ত হয়ে থাকতে হয়, আর বন তাতেই নিবিষ্ট থাকতে ঐ সকল কাজে চিত্তাঙলো আসতে পারে না। নতুবা বর্তমান অবস্থাতে তাই নিয়ে ভাবতে বসলেই মাথা ব্যথা করবে; একেত্রে কুচিন্তার ডাঙনার প্রতিকার হচ্ছে কামের কীরনে বন লাগানো, কিংবা উচ্চত্তরে উঠে সেখান থেকে মনকে নিয়ন্ত্রিত করা।

কিন্তু তাও বনি, সেই একই দ্বারে বেন থেকে যেও না, তাতে বিশেষ কিছু লাভ হবে না, 'সৈনিক স্বাদেয় পক্ষেও নয় আর বৈভিক স্বাদেয় পক্ষেও নয়।

(৮)

প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন : "দুঃখের সঙ্গেই বলা যায় যে অতীতমানসের সত্যচেতনা যতক্ষণ এখানে না আসতে ততক্ষণ কোনোরূপ বীনাংসাই কেবল অস্থায়ী ও সাময়িক ভিন্ন অন্তরূপ হতে পারে না। সত্যচেতনা এলেই তখন প্রত্যেক ভিনিসের যথাযোগ্য স্থান নিরূপিত হয়ে যাবে ও সব কিছুর মর্ম উদ্ঘাটিত হবে, তার মধ্যে কোনটি গাঢ় আধ্যাত্মিক তাও জানা যাবে। আপাতত মানবের পক্ষে নিরাপদ ব্যবস্থা হলো উপস্থিত কাজ চানাবার নতুন আধ্যাত্মিক অনুভূতির কোনো প্রণালী খুঁজে বের করা কিংবা ভিতরে একটা পথ-প্রদর্শক আলো চালিয়ে রাখা, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত সত্যচেতনায় গিয়ে না পৌঁছই বা আমাদের মধ্যে তা আবির্ভূত না হয়। কারণ ঐক্লপ লক্ষ্য ছাড়া আস যা কিছু বাহ্য, যার মধ্যে কোনো আধ্যাত্মিক মর্ম বা অন্তর্দৃষ্টি নেই, যা শুধু বুদ্ধির বীনাংস বা প্রার্থের প্রত্যাব যা তাগিদ, বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদ, তার মধ্যে কখনো বা থাকে আশ-আলো, কখনো বা অলীক বীতি, তা সাময়িকভাবে কিছুকণ আলো দেখার পরেই বিরুদ্ধতা বা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে।" একবার অর্ধ বুঝিয়ে দেবেন?

উত্তর : ঐ সকল হলো মিশ্রিত আলো, অজ্ঞানমিশ্রিত খবিত জ্ঞান, কখনো বা বরী-ভিকার আলোর নতুন, অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানালোক নয়। সাধারণ মানব-চেতনাতে কিন্তু নবের ভাব, ধারণা, বোধ, চোখের দেখা—এইগুলোকেই জ্ঞান বলা হয়ে থাকে।

★

প্রশ্ন আর মেহের যে প্রয়োজনগুলো দেখা দিচ্ছে, তারাও কি মিথ্যা আলো ?

উত্তর : শ্রীঅরবিন্দ বলেন, এমন কি মেহের যেগুলি নিত্য স্বকীয় প্রয়োজন, স্বয়ং

মধ্যে বলা হয় বাঁটি সত্য আছে তাও অর্থালোক জ্ঞানের আলোর প্রতিচ্ছায়া কিংবা বিধায়ক। অবশ্য এ কথা আধুনিক মতের সম্পর্ক বিপরীত। লোকে বললে সেদের প্রয়োজন আগে অকাটা নিয়মে, তাকে না মানলেই সেদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ভুল কাজ করা হবে, এবং তাঁর জন্য শাস্তি পেতে হবে। তথাপি সে প্রয়োজনও আংশিক বা বিধা আনোর, কিন্তু সেখান ঐক্যপ।

এ কথা নিয়ে বিশেষভাবে বিচার করলে দেখতে পাবে যে সেদের ঐ উপাধিকৃত প্রয়োজনগুলি অনেকখানি নির্ভর করছে তোমার আপন মনোভাবের উপর। যেমন দেখ, খাদ্যের প্রয়োজন। এমন লোকও আছে যারা আট দিন কিছু খেতে না পেনে খিমের হয়ে বাঁধে আবার এমন লোকও আছে যারা ইচ্ছা করেই খাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে, যোগেও সুবিধার জন্য তারা ইচ্ছা করেই উপবাস করছে। আটদিনের উপবাসে তারা সুস্থই থাকে, বরং আরো ভাল বোধ করতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে এগুলো হচ্ছে জীবনময় প্রশ্ন, সম্প্রদায়ের পরিচালণের প্রশ্ন। অবশ্য চিরদিন না খেয়ে বাঁচা যায় না। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে খাওয়া সযত্নে তোমরা বা ধারণা করো তাও ঠিক নয়। এ নিয়ে গবেষণা চলতে পারে : “মৈত্রিক চাহিদার উপর মনোভাবের প্রভাব কতটা।”

মৈত্রিক চাহিদার মধ্যে তার নিজস্ব কিছু সত্য আছে, এ কথা কিন্তু শ্রীমদ্রশি মনেন না তিনি বলেন, “ওটা প্রকৃত জিনিস নয়, চাহিদা সযত্নে তোমাদের ধারণাও বিশ্বাস নাজ। ওতে সত্য নেই”।

*

প্রশ্ন : আর নীতি (morality) বানাও কি দরকার নয়? নীতিবাদের কারণেই কি আমাদের চেতনা উন্নত হয় নি?

উত্তর : ওটা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের উপর। নীতিবাদ অনেকের বেলা উপকার করে, অনেকের বেলা করে না।

নীতিবাদ জিনিসটা কৃত্রিম ও অনেকটা আপোষমূলক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এমন কি খুব ভালো লোকেরদের মধ্যেও ওতে একটা আকণ্ঠা আসে যে আমি ঠিক পথেই নিচ্ছেকে রেষেছি, আমি যথার্থই একজন ভালো লোক, কর্তব্যগুলো সবই ঠিক ঠিক করে যাচ্ছি, জীবনের সকল নীতি ছবয় পালন করছি,—এই আশ্বস্তিই তোমাকে আর এগোতে দেয় না।

পুণ্যবান লোকের পক্ষে ভগবানের কাছে পৌঁছানো খুবই কঠিন—এইরকম যে কথা বলা হয় তা খুবই সত্য, কারণ পুণ্যবান ব্যক্তি তাঁর পুণ্য নিয়েই বসে থাকে; তাঁর ধারণা

যে কান্না সব কিছুই তার নিলে গেছে, তার আর আশ্রয় করার কিছু নেই, এমন কি উপরনের জন্য প্রথম যে জিনিসটি চাই, অর্থাৎ ধীনতা, তাও তার থাকে না।

সাবিক যে চায়, সে তার সাহিত্য নিয়েই তুষ্ট, তার গভীর বাইরে সে যেতেই চায় না। কিন্তু তাতে ভগবানের কাছ থেকে লক্ষ যোজননের ব্যবধান এসে যায়।

বতকণ ভিতরে আলো না দেখছে, ততক্ষণের জন্য নিছকের পক্ষে একটা নিয়ম ঠিক করে নিয়ে তাই বেনে চলা জোনার সহায়ক হবে, তা কঠোর বা নিত্যস্থ অনবনীয় হবে না কিন্তু তা স্বনির্দিষ্ট থাকবে, যাতে দুনি পথ ছেড়ে গিয়ে বিপথে না পড়ে কিংবা প্রতিভাক্ষের অসাব্য কিছু সোধ না করে কেন—যাতে সারাধীবন তার কুকল ভোগ করতে হতে পারে।

সেইজন্যই নিছকের কতকগুলি আদর্শ ঠিক করে নেওয়া ভালো, এবং তা হবে প্রত্যেকের আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী। যদি কোনো সবটীগ্রাহ্য সামাজিক আইন হয়ে চলতে থাকে। তাহলে জোনাকে তা নিত্যস্থ ক্রীতদাস বানিয়ে দেবে; সে ক্ষেত্রে তা জোনার স্বপাত্তর আদার প্রতিবন্ধক হবে।

★

প্রশ্ন শ্রীম্বরবিশ যে আধ্যাত্মিক বা অতিমানস বিধির কথা উল্লেখ করেছেন, সে কিরূপ ?

উত্তর তা হলো প্রত্যেকটি সত্তার যে মূল সত্তা তারই বিধি।

প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে তার নির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক পরিপত্তির বিধান, তাই তার পক্ষে অতিমানস বিধি। সকলের পক্ষে তা এক জিনিস হয় না। প্রত্যেকের সত্তাটি তার আপন সত্তার নিম্নতম, অর্থাৎ বিশেষ মধ্যে তাকে সেই বিশেষ জিনিসটাই উপলব্ধি করতে হবে, অগত্যা ভিতর দিয়ে তাকে সেই স্থানেই পৌঁছতে হবে।

সেই সত্তাই হবে তার সত্তার সত্তা।

(২)

প্রশ্ন : কথায় বলে : “বতই নিতে পারবে ততই জোনার নিলবে”। এ কথা কি বৈবিক শক্তিই বোঝাতেও বাটে ? আমার সাধের বা অতিরিক্ত ভেমন কাজ কি আমি নিতে পারি ?

উত্তর : কিন্তু শক্তির ব্যয় না করলে শক্তি কখনই নিলবে না। শিওর যে ছোটো থেকে বড়ো হয়ে ওঠার শক্তি পার, তার কারণ এই যে তাত্ত্ব হিসেব না ক’রে ব্যয় করে।

অবশ্য শক্তি খরচ হয়ে গেলেই তার অভাবটা দাবলে নিতে হয় ; শিওর একদিনে

তা না পারলে পনের দিনে পারে। আপন সহজ আরতের সীমাকে ছাড়তে না পারলে উন্মত্তি আসবে না। যথা, ঐতিহ্যিক ব্যাধার ব্যাধা করে ডায়া নিজেদের মানবের সীমা বতই ছাড়িয়ে যেতে পারে ততই তাদের জনিক উন্মত্তি হতে থাকে।

এ হলো পরিব্রাজকের পুণ্য। খরচে বস্ত্র সব্ব নাগে তার পূর্ণপেও তেমনি সব্ব নাগে।

কিন্তু যদি তুমি ধরে বসে থাকো যে এই পর্বতই আনার সাধ্যসীমা—সোটা হবে অসম্ভব কথা, কারণ এখানেই না পারলেই তখন তোমাকে কিছু হটতে হবে।...অতএব সর্বদাই তোমার চেষ্টা পাকা চাই আগের চেয়ে আরো বেশী একটু করতে, আগে যতটা ভালো হয়েছিল তার চেয়ে আরো একটু ভালো—তবেই বলব যে তুমি ওঠার পথে চলেছ।

কিন্তু তোমার চেষ্টা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার বেচার কনভার্সে যেন বাড়তে থাকে, তোমার নিতে পারার স্বযোগও যেন বেড়ে যায়। অর্থাৎ, তুমি যদি চাও যে তোমার পেশী-শক্তি বাড়ুক আর ক্রমে ক্রমে তারই প্রয়োগ করতে থাকো, সেই সঙ্গে তোমাকে আরো একটু কাজ করতে হবে, যেমন দলাইনলাই, জনচিকিৎসা ইত্যাদি, যাতে কিছু গ্রহণযোগ্যতাও আসে।

অতঃপর হলো বিশ্রাম। কিন্তু মনে নিশ্চিন্ততার মধ্যে ভুবে যাওয়া নয়—তাতে বিশ্রামের চেয়ে স্তিমিতাই আসে বেশী—চাই সচেতন বিশ্রাম, একটা চেতনাবয় একগ্রন্থা, যাতে উন্মীলন আসে বিশৃঙ্খলিত প্রহরণ করতে।

সৈন্যিক শক্তির সত্তাব্যাহার সীমা স্বভাবের মধ্যে বেড়ে যেতে পারে। যারা নিয়মিত ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সভ্যায় করতে থাকে তাদের আশ্চর্যকর সাফল্য নেন। ডায়া বেহের সাহায্যে এমন কাজ করতে পারে যা অন্য লোকের কাছে অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হবে,—সোটা সত্ত্ব চয় কেবল নিয়মিত শিক্ষার ওপে। নিশ্চয়ই ডায়া নিজেদের সাধ্য সীমাকে ছাড়িয়ে যেতে জনিক চেষ্টা করতে থাকে, কেবল নিখুঁত ক্রিয়ায় জন্য নয়, কিন্তু শক্তিকেই বাড়াবার জন্য। একটু বেশীতরন কাজ করতে যদি তুমি ভয় পাও তাহলে নিশ্চয় নীচের দিকে নেন গিয়ে তোমার কবজটুকু হারাবে।

(১০)

প্রশ্ন : বুকের পরেও সকালে জাগ্রতি আসে কেন ? ভালো ঘুম হবার কি উপায় ?

উত্তর : সকালে উঠে জাগ্রতিবোধ করা মনেই ভয়, নিছক ভয় ছাড়া আর কিছু নয় ; ওর পরিচর আনি পেরেছি, দেখযোগের শুরুতে। স্বপাতর না হটা পর্বত এটি অপরিহার্য।

বুকের সময় সোজা চিং হয়ে তরে সব্ব পেশী ও স্নায়ুনিক শিথিল করে দেবে—এটি

শেখা খুব সহজ—যাক আমি বলি একখণ্ড বস্ত্রের নতুন বিজানার উপর বিড়িয়ে পাকা। আর দেখ ছাড়া নবের সম্পর্কে ও যদি তাই করতে পারো তাহলে অনেক বিগ্রা বপের হাত থেকে রেহাই পাবে, কারণ তাত্তই বুনের আগের চেয়ে বুনের পরে আরো বেশী রাস্তা করে দেয়। নতুনদের কোষগুলি তখন বিনা বাধার কাজ করতে থাকে, তাতেই অস্ত্র রাস্তা আসে। তাই তখন দরকার নবকে শিখিল করে পুরো অচকল হয়ে থাকা, সবস্ত্র উত্তরাঙ্গিকে পানিয়ে দেওয়া। কিন্তু এ কেবল গোড়ার কথা।

অন্তঃপর চাই সর্বতোভাবে নিষেককে দিয়ে দেওয়া; পুরোপুরি আয়তনান, বতখানি সস্ত্রব, আধা থেকে গোড়া পর্যন্ত, বাহির থেকে ভিতর পর্যন্ত, অহঃএর পিছুতান বেন কিছুনাও না থাকে; আর তার পরে নিষেকের নয়াটি আবৃত্তি করে বেতে থাকা—যদি তেনন তেজোবর্জিত নয়া কিছু ভোনার থাকে, স্বয়ং থেকে বস্তঃসকল কোনো নয়াবাক্য, যা ভোনার আশুহাপূর্ণ প্রাণনার মধ্যে। অতঃপর থাকলে করেকবার সেই নয়া আবৃত্তি করে তুনি সন্যাসির আশুর নেবে। সেই সন্যাসি পবিত্র হব নিভ্রায়। সে তন্ত্রাভাব বতকণই থাকুক, তার থেকে নিজা আপনা হতেই আসবে। পরে যখন বুন ভেঙে উঠবে তখন কিছুই সন্যাসি থাকবে না যে সন্যাসি কখন বুনে ভুলে গেছে।

এখানে বুনের একনাত্র কাজ হবে সেই সন্যাসি-বস্ত্রের জিরাকে স্পেনের মধ্যে পরিপাক করে নেওয়া, যাতে স্পেনের সর্বত্রই তা সন্ধানিত হয়ে সকল অংশই বিশ্রাম পেয়ে প্রাণিনিষ্ঠ হতে পারে। তারপরে ভেগে উঠলে তখন বুনের জড়তা কিছুই থাকবে না, সন্যাসি শান্তকিয়া সফল হবে।

ওরফে তন্ত্রাসন্যাসি যাদের অভ্যাস সেই, তারা আবৃত্তি করবে তাদের নয়া, বুনাবার পূর্বে করবে প্রার্থনাবোধী উচ্চারণ। কিন্তু সেই বাক্যগুলির মধ্যে প্রাণ থাকা চাই। বুদ্ধিগত ব্যাখ্যা বোধের কথা বনতি না, থাকা চাই প্রাণের স্পন্দন। স্পেনের উপর তার যা ফল হবে তা অসাধারণ...সেখানে স্পন্দনের পর স্পন্দন উঠতে থাকবে...তার পর বুনিয়ে পড়ার নতুন নিষেককে দেবে শিখিল করে। দেহের ভিতরকার সেই স্পন্দন উত্তরোত্তর জোনাকে টেনে নিয়ে যাক। এই হবে ভবনের প্রতিকার।

তবু হতেই আসে কুনিষ্ঠ। তা হয় দুই প্রকার: একসকল যাতে জোনাকে জড়বৎ ভারী এবং ভোঁতা করে দেয়, বেন পূর্বদিনে যা কিছু আরম্ভে এসেছিল তাও সবস্ত্র খোঁজা গেছে; আর একসকল যাতে আসে অবসন্নতা, বেন সবস্ত্রকণ কেবল নড়াই করে রাস্তা হয়েছে। আমি সেখিঁ যে বোঁটনাট বুনের সমস্তটা যদি কেটে কেটে ভাগ করে নাও (তা অভ্যাস করনাই হবে) তাহলে রাস্তাটা ভালো ভাবেই কাটে। অর্থাৎ এক এক ভাগের নির্দিষ্ট কালের পরে একবার করে কিবে এসে জোনার স্বাভাবিক চেতনাতে এবং আশুহাতে...কিন্তু তার জন্য ঝড়িতে এলাই দিয়ে রাখলে চলবে না। সন্যাসির অবস্থা যদি আসে, তা ওতে ভেঙে যেতে পারে।

দুনোতে যাবার আগে সংকল্প করি যে, “আমি অল্পকাল মধ্যে জগৎ (জেনেবেলাতে এটি খুব কার্যকরী হয়)।” প্রধান ভাগের দুইটা বেল ডিন বন্টার কন না হয়, কিন্তু শেষের ভাগের দুই এক বন্টা দলেই যথেষ্ট। প্রথমে অল্পতপক্ষে ডিন বন্টা দুইনো চাই। আর মোটমোট বিছানার ওয়্যে থাকবে সাত বন্টা, কারণ ছয় বন্টাতে যথেষ্ট কাজ হয়না (আমি বলছি সাধনার কাজের কাজের কথা)।

রাত্রিক সাধনার কাজে লাগানো খুবই ভালো। এতে দুই প্রকার কন বেল : এক হলো মধ্যমিক ক্রিয়া, যাতে বন্টা এগিয়েছে তার থেকে পিছিয়ে যাওয়া নিবারণ করে—যা বজায় রাখা খুবই কষ্টকর ব্যাপার,—আর এক হলো সন্দর্ভ ক্রিয়া, অর্থাৎ একটু কিছু এগিয়ে দিতে পারে, অগ্রগতি চালিয়ে যেতে পারে। রাত্রিকে এই ভাবে কাজে লাগালে ক্রান্তি কিছুই আসতে পারে না।

দুটি মিনিসকে বোঝাতে হবে : নিশ্চিন্ততার অভ্যাস বহু গিরে পড়া, বার কলো সেখানকার ও অবচেতনের সব কিছু ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে জোনাকে চেপে ধরবে ; আর প্রাণ ও মনের অতিচারনাকে প্রশ্রয় দেওয়া, যাতে জোনাকে কেবলই তার সঙ্গে দুর্ভাগ্য লড়াই করে যেতে হবে—নিরাসক্তভাবে। তার চেয়ে সেই অবস্থা থেকে দাড়াভাবে কত-বিস্তৃত হয়ে বেরোতে চয়, সেখানে কোনো অনুভবের “কেন” নেই। তাই বলছি, সেখা উপায় হলো ঘুমের প্রকৃতিকে বদলে দেওয়া।*

• S. A. I. C. E. Bulletin ফেব্রু. ১৯৫৩—ঐশ্বর্যমিশ্র চট্টোপাধ্যায়।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସନ୍ଦିର

ବର୍ତ୍ତିକା

(୨୫ମେ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୧)



ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠସନ୍ଦିର

୧୫, ବହିର ଗାଟାଞ୍ଜି ସ୍ଟ୍ରୀଟ : କଲିକାତା—୧୨

১। চিন্তাবলি ও হুমাবলি	শ্রীঅরবিন্দ	১
২। মহামানবের লাগরতীরে	সমৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
৩। প্রিমা প্রসঙ্গ	ডাঃ কে. আর. শ্রীনিবাস আরেঙ্গার	২
৪। বাসবদত্তা	শ্রীঅরবিন্দ	২০
৫। মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	৩১
৬। যোগসম্বন্ধ-প্রসঙ্গ	অমির্বাণ	৪০
৭। সেইৎ গ নীলের একটি কবিতা	শ্রীসরীকান্ত গুপ্ত	৫৬
৮। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ	শ্রীমলিনীকান্ত সেন	৬২
৯। পুনর্জীবন (কবিতা)	মীরদবরণ	৭২

বর্ষিকার নিয়মাবলি

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক টাঙ্গা ৫২ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। টাঙ্গা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিংবা কলিকাতা-লাহার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নুতন বৎসরের টাঙ্গা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠসমিতি
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট,
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পত্রিকারী

মূল্য—১২ টাকা

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠসমিতি, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট, কলিকাতা—১২

মুদ্রক—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পত্রিকারী



২৪শে এপ্রিল

১৯৬১

তুমি আহ, তাই ত অন্তঃপুরুষ ক্রমে উঠে চলে
ভগবানের সান্নিধ্যে ।

ঐঅরবিন্দ—“সাবিত্রী”

অন্তরের সম্বন্ধ অর্থ, তুমি অনুভব কর মায়ের সান্নিধ্য, সন্ত: সর্বদা
তারা নিকে ফিরে রয়েছ, তুমি বুঝতে পার তারা নক্তি তে:মাকে
চালায়, পথ দেখায়, সাহায্য করে, তাঁর উপর ভালবাসা তে:মায় পূর্ণ
রেখেছে, সর্বদাই বোধ কর তুমি তাঁর একান্ত নিকটে রয়েছ, দুলভ:
নিকটে থাক বা না থাক । এ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় মনে, প্রাণে এবং
আন্তর দুল অবধি—শেষে তুমি অনুভব কর তোমার মন মায়ের মনের
সম্বন্ধে, তোমার প্রাণ মায়ের প্রাণের ছন্দে বাঁধা, তোমার দুল-চেতনা
পর্যন্ত তারা দুল চেতনার পরিপূর্ণ ।

ঐঅরবিন্দ



চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি

পূর্বসূচী

ঐশ্বর্যবিন্দ

কর্ম

ব্যক্তিগত বিতর্ক সর্বদা পরিহার করবে। কিন্তু সর্বজনীন মুখে পশ্চাৎপদ হবে না—
এ ক্ষেত্রেও তবু শত্রুশক্তিকে যথাযথ বর্বাদা দেবে।

★

যখন এমন একটা বস্তু তোমার কানে পৌঁছে বা তোমার অপ্রীতিকর, তখন তবুও
তা ভাল করে দেখে নেবে, আবিষ্কার করবে কি সত্য তার মধ্যে রয়েছে।

★

নব্যযুগে সন্যাসীনা নারীকে করত বৃণা, মনে করত ভগবান তাদের স্রষ্টা করেছেন
সন্যাসীদের প্রলুব্ধ করার জন্যে। ভগবান সযত্নে এবং নারী সযত্নে আর-একটু উচ্চতর
ধারণা করা অন্যায় নাও হতে পারে।

★

নারী যদি তোমাকে প্রলুব্ধ করে থাকে, তবে দেখ তার না তোমার? নিবেদীত্ব আর-
প্রত্যয়ক বনে যেও না।

★

দুভাবে নারীর পাশবচন থেকে নিজেদের মুক্ত রাখা যায়, নারীনাশকেই পরিহার করে
চলা, না হয় সর্ব জীবকে ভালবাসা।

★

সন্যাস নিশ্চয় নিরাশ্রয়কর—ওহা শাস্তিপূর্ণ, পর্বতশিখর চনৎকার প্রীতিকর—তা
হলেও তোমাকে অগতঃই কান্ন করতে হবে, ভগবান যেননাটি চেয়েছেন তোমাকে দিয়ে।

★

শতরের দিকে চেয়ে ভগবান তিন বার হেসেছিলেন—প্রথম, যখন তিনি ফিরে এলেন
ঐক্য বৃত্ত মাতার দেহ সংস্কার করতে; দ্বিতীয় বার, যখন তিনি ঈশ উপনিষদের ভাষ্য
লিখলেন; আর তৃতীয় বার, যখন সারা ভারতবর্ষ ঘুরে তিনি নৈকর্য প্রচার করলেন।

★

★

সফলতার উদ্দেশ্যেই মানুষ পরিশ্রম করে; তবে বিফলতার সৌভাগ্য যদি কারো ঘটে তবে সে হল তার বুদ্ধিগত চাতুর্যকে প্রকৃতির জ্ঞান ও শক্তি হাটিয়ে দেয় বলে। একমাত্র ভগবানই জানেন কখন ও কি রকমে বিজয়ের মত ভুল করতে হয় আর সার্থকভাবে ব্যর্থ হতে হয়।

★

যে মানুষ কখন বিফল হয় নি, কখন কুঃখভোগ করে নি, তাকে বিশ্বাস করো না, তার ভাণ্ডা অনুসরণ করে চরো না, তার পতাকার নীচে যুদ্ধ করতে যেও না।

★

দুটি সত্তা আছে যারা মহাক্ষর, স্বাধীনতার অনুপযুক্ত—যে মানুষ অন্য কোন মানুষের কখন দাসত্ব করে নি আর যে জাতি বিদেশীর পদতলে নুটিত হয় নি।

★

তোমার আশ্রয় যে নিছক হবে তার কাল ও পক্ষা নিশ্চিষ্ট করে দেখে না। কাঁচ করে যাও, কাল আর পক্ষা সর্বত্র ভগবানের হাতে ছেড়ে দাও।

★

কাল এমন ভাবে করবে যেন আদর্শকে পূর্ণ করতে হবে সম্বন্ধেই, তোমার জীবনকালের মধ্যে—আবার এমন পৈর্য্য ধরে চলবে যেন তোমার জানা আছে যে সহস্র বংশসম্ব্যাপী পরিশ্রমের বিনিময় ছাড়া এ আদর্শ অধিগত হবে না। যা তুমি আশা করতে পার না পাঁচ হাজার বংশের মধ্যেও হবে, তা হয়ত আশাবীক্যের উষ্মার সঙ্গেই ফুটে উঠবে, আর যা তুমি আশা করছ, আকাঙ্ক্ষা করছ হবে এখনি, তা হয়ত নিশ্চিষ্ট হয়েছে ঘটবে তোমার পত জন্ম পরে।

★

আনন্দের প্রত্যেককেই আরো লক্ষ লক্ষ জন্মগ্রহণ করতে হবে এই পৃথিবীতে, তা হলে এই যত বস্তু, কোলাহল আর অধৈর্য্যের প্রয়োজন কি?

★

সবর পা বাড়িয়ে চলে যাও, লক্ষ্য বে দূরে। অতিরিক্ত বিশ্বাস নেবে না, কারণ তোমার বিধাতা তোমার পথের শেষে দাঁড়িয়ে পড়েছেন তোমার অপেক্ষায়।

★

যে নিঃশ্রুত অধৈর্য্য চীৎকার করে, পাগড়াঘণ করে, ঘোষণা করে আদর্শ নাস্তি—বেহেতু সোনার পাহাড়ে কখন পৌঁছান যায় না, আনন্দের কুত্র দিনটির মধ্যে যা করেছিল স্বপ্নদায়ী শতাব্দীর মধ্যে—তাকে আমি আর সহ্য করি না।

★

কামনাশূন্য হয়ে তোমার অন্তঃপুরুষকে নিবদ্ধ কর লক্ষ্যের উপরে, আর তাকেই চাও একান্তভাবে তোমার সব স্বাস্থ্য দিব্যশক্তি দিয়ে—তার ফলে লক্ষ্যই তার নিজের উপায়

স্বষ্ট করে চলেবে, না, সে নিজেই হবে নিজের উপায়। কারণ, লক্ষ্য হল ব্রহ্ম এবং তা নিত্যসিদ্ধ—সর্বদা তাকে ব্রহ্ম-রূপেই দেখবে, দেখবে নিত্যসিদ্ধরূপে তোমার অন্তরে।

*

বুঝি দিয়ে পরিকল্পনা করবে না, তোমার দিব্যদৃষ্টিকে ধাক্কা জোয়ার জন্যে পরিকল্পনাটি যথাবিন্যস্ত করে ধরতে। যখন একটি উপায় তোমার কাছে আসে করণীয় রূপে, তখন তাকেই লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করবে; আর লক্ষ্য বে বস্তু, তা জগতে নিজেকে সংস্কৃত করে চলেছে, তোমার অন্তরায়ের তা নিত্যসিদ্ধ।

*

বান্ধু ঘটনাকে দেখে যেন তা অসম্পাদিত, তার জন্য চেষ্টা করতে হবে, তাকে সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু এ হল মাত্র দৃষ্টি। ঘটনা সম্পাদিত হয় না, তা জনে ফুটে ওঠে। ঘটনা হল ব্রহ্ম, নিত্যসিদ্ধ, বর্জনানে সে প্রকাশ পেয়ে চলেছে।*

* Thoughts and Aphorisms থেকে। অনুবাদক—ঈশদীনাকার কব

মহামানবের সাগরতীরে

(ঐশ্বরবিশ্ব অবলম্বনে)

সমঃ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৫)

ভাৰোনে একরকম ধৰে নেওতা যাক আবাদেৰ প্ৰাচীন বৰ্ণব্যবহাৰ লোখকটি থাকা
সৰেও ভাৰতৰ অধঃপতনেৰ জনো ডাকে সম্পূৰ্ণ দাবী সাব্যস্ত কৰা অনায়াৰ হৰে। এখন
দেখা যাক আবাদেৰ ৰাজ্যব্যবহাৰ ডেনন কোনো খোল ছিল কি না।

কিছুদিন আগে অৰবি পণ্ডিত মহলে একটা ৰাষণা ছিল যে ভাৰতবাসী ৰাজ্যশাসনে
চিৰদিনই অপাৰগ। তাতা না কৰেছে কোনোদিন ৰাজ্যপৰিচালনা, না ভেবেছে কি ব্ৰকৰ
কৰে দেশ শাসন কৰতে হয়। আবাদেৰ দেশে না কি ৰাজনীতিৰ চৰ্চা। কোনদিন হয় নি।
আবাদেৰ যা কিছু শেখাৰ সব শিখতে হবে পুটো এগ্ৰিষ্টেল হ'ল লক্ কুশোৰ থিওৰী পড়ে।

কপাটা বাঁতা প্ৰচাৰ কৰেছিলেন তাঁরা যে মহাভাৰতৰ শাস্তিপৰ্ব পড়েন নি এমন কথা
বিশ্বাস কৰা শক্ত। কিন্তু তখনকার দিনে, অৰ্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনেৰ আগে, মোৰগলায়
পাশ্চাত্য পণ্ডিতৰ নতন বিকছে কথা বলার নতন সাহস রাখতো খুব অল্পসংখ্যক ভাৰত-
বাসী। কালেই ভাল ছেলের নতন আনন্স নিশ্চিত নন স্বীকার কৰে নিজেছিলুন যা বলেন
আবাদেৰ নতুন গুৰুনাথিগ।

স্বদেশী যুগে একটা বড় ব্ৰকনেৰ ওলটপালট হয়ে গেল। দেশেৰ লোক হঠাৎ সমাগ
হয়ে উঠলো আবাদেৰ প্ৰাচীন ইতিহাস সৰছে। বাসিকপত্ৰে আৰ্চক্ল বেকতে লাগলো,
ভাল ছেলেরা সংস্কৃত পড়ে গবেষণায় মন দিল, ক্রমশঃ ক্রমশঃ নুকের পাটা বাড়লো, বড় বড়
বই বেকতে আৰম্ভ হলো ভাৰতীয় সভ্যতা সৰছে—ভাৰতীয়দেৰ লেখা বই। ৰাজনীতিৰ
চৰ্চা ছিল তখনকার যুগধৰ্ম। কালেই দেশভক্ত ভাৰতীয় পণ্ডিততা উঠে পড়ে লেগে গেলেন
প্ৰকাশ কৰতে যে আৰম্ভ এক কালে ৰাজ্য চালিয়েছি, আবাদেৰ দেশেও ডেনক্ৰাসি ছিল,
গ্ৰামে গ্ৰামে ছিল স্বায়ত্তশাসন, এমন কি ৰিপাব্লিক বা গণতন্ত্ৰেও নতুন পাওতা যার আবাদেৰ
ইতিহাসে। ইতিমধ্যে ত্ৰিবাছুরেৰ মহাৰাজ্যৰ দৌলতে অৰ্থশাস্ত্ৰেৰ প্ৰাচীন পুঁথিৰ সন্ধান
পাওয়া গেল। সেটা কোটিল্যেৰ লেখা কি না এই নিয়ে প্ৰাচ্য এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদেৰ
বহো লেগে গেল বিপুল ৰচনা, একরূশ বই লেখা চোলেছে এখনও এই একখানা পুঁথিৰ
ভুলসার।

এতদিনে অনেকটা সাবাত হয়েচে যে ভারতবর্ষেও এককালে রান্নানীতির চর্চা ছিল। এখনও কিন্তু আমরা পাশ্চাত্য রাজনৈতিক চিন্তার আবহাওয়া সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারি নি। এখনও চেষ্টা চলছে কি রকম করে প্রমাণ করা যায় প্রাচীন ভারত ঠিক ইউরোপেরই চিন্তাধারা অনুসরণ করে এসেছে। এটা কিন্তু বনে হর ঠিক রাজ্য নয়। ভারতের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানে যেমন, সমাজব্যবস্থা রান্নানীতিতেও তেমন। সে বৈশিষ্ট্যকে আমাদের ফুটিয়ে তোলা দরকার।

ভারতের চিন্তাধারায় রাজার স্থান খুব উঁচুতে। ইতিহাসের বতেও ভারতবর্ষ বেজায় রাজারাজড়ার ভক্ত। বুদ্ধের উদ্ভিড়ে, গ্রীক পর্যটকদের বিবরণে, পুরোনো টাকাপয়সা এবং এমিক্ ওডিঙ্ কয়েকটা শিলালিপিতে অ-রামক রাজহ যথবা ত্রিপাস্ট্রিকের উল্লেখ পাওয়া যায় বটে। কিন্তু তা সবেও রাজাদেরই স্মৃতি হনো শেষ পর্য্যন্ত। গণতন্ত্র লোপ পেয়ে গেল গুপ্ত সম্রাটদের আনল থেকে, বৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পর থেকে।

এই নিয়ে প্রাচীন ভারতে একটা প্রশ্ন ওঠে। রাজার মধ্যে কি এমন গুণ থাকতে পারে যার জন্যে সারা পৃথিবীর লোক তার বশ্যতা স্বীকার করবে? রাজার কোনো প্রয়োজন আছে কি? প্রশ্নটা উঠেছিল অনেকদিন আগে, তার সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখতে পাই বৈদিক যুগে লঙ্ঘিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে। পরে, অর্থাৎ মহাভারতের আনলে, এ নিয়ে বিস্তর লেখা-লিখি চলে। শেষপর্য্যন্ত নবুর বিধানে মহাভারতের কথাটা একরকম সবাই মেনে নেয়। এমন কি বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকার যারা হিশু সেবদেবীতে বিশ্বাস করতো না তারা পর্য্যন্ত স্বীকার করে নেয় রাজার সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন বিগরিটা।

বিগরি কিন্তু ঠিক একটা নয়, অনেকগুলো ছিল। গোটা তিন চার নমুনা দিচ্ছি।

আগে আজাপ দিয়েছি বেদের যুগের মানুষ ঠিক আমাদের নতন করে ভাবতে পেরে নি। তাঁরা জলবাগতো রূপক বা গিঘনিহ্নন পরে যা থেকে পৌরাণিক রূপকবার উৎপত্তি। তাদের কাছে ঠাকুর সেবতারা ছিলেন খুব নিকট : বাটির পুতুল নয়, নিত্যসুই আপনার জন। এবং সেবতারা যেহেতু সেবতা, অর্থাৎ মানুষের চেয়ে অনেক বড়, অতএব তাঁরা যা চান মানুষের পক্ষে তাই শ্রেয়, তাঁরা যা করেন মানুষের তাই কষ্টব্য। এই কথাটা মনে রাখলে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের গল্পটা বোঝা সহজ হবে।

গল্পটা হচ্ছে এই। আগেকার দিনে সেবতাদের মধ্যে কেউ রাজা ছিল না। অথচ অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ লেগেই আছে। যুদ্ধে সেবতারা বার বার হেরে যাচ্ছেন অসুরদের কাছে। জারপার একদিন তাঁরা ভেবেচিন্তে ঠিক করলেন, আরজা হেরে যাচ্ছি তার কারণ আমাদের কোনো রাজা নেই সেই জন্যে। তখন তাঁরা সোমকে করলেন রাজা। আর তাঁর ফলে তাঁদের যুদ্ধে জয় আরম্ভ হলো। গল্পটা এখানেই শেষ। কিন্তু এর একটা মানে আছে নিশ্চয়ই। খুব সম্ভবতঃ তখনকার লোকের ধারণা ছিল আগেকার দিনে রাজা ছিল না,

অথচ যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই আছে, একজন এমন লোকের দরকার যে অন্ততঃ যুদ্ধক্ষেত্রে কঠোর-
ব্যক্তিগত কাজ করবে। তাই থেকে প্রথম রাজার উৎপত্তি।

তার পর অনেক যুগ কেটে গেছে। রাজারা বেশ স্বাক্ষরিত বসেছেন, অনেকে স্ত্রী-
বা রাজচক্রবর্তী হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছেন। মানুষের চিন্তাধারাতেও পরিবর্তন এসেছে।
ঠাকুরদেবতার একটু পেছনে পড়ে গেছেন, মানুষ সব জিনিষ বুঝতে চাইছে নিজের বিচার
বুদ্ধি দিয়ে। এটা নব্যভারতের যুগ। শাস্তিগর্বের একটা অধ্যায়ে (৫৮ অধ্যায়, কনুনা
সংস্করণ) দেখতে পাই যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে একটা বেশ অতিআধুনিক প্রশ্ন জিজ্ঞাস করছেন।
রাজাদেরও তো ঠিক সাধারণ মানুষের মতন স্বভাবের শরীর, বুদ্ধিবিবেচনাও তেমন একটা
কিছু অসাধারণ নয়, অথচ সেপের লোক দেখি সবাই তাদের বেনে চলে, কব সেব, খোশা-
মোদ করে। এর কারণটা কি বলতে পারেন?

ভীষ্মদেবের উত্তরটা বেশ, প্রাচীন এবং আধুনিকের একটা চরমকার সংনিগ্রহ। তিনিও
একটা গল্প ফেঁদে বললেন। আগেকার দিনে, অর্থাৎ সভ্যযুগে, রাজা বা রাজকন্যার কোনো
জিনিস ছিল না। প্রকৃত্যে সবাই ছিল ধর্মপরায়ণ, যে যার নিজের নিজের ধর্ম অনুযায়ী
চলতো, অপরের স্বকণ্ঠবাক্যের ভার ছিল তাদের নিজস্বের মধ্যেই, তার জন্যে ন্যেবিধানের
প্রয়োজন ছিল না। কিছুদিন পরে আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে মোহ প্রবেশ করলো, তার
ফলে তাদের ধর্মজ্ঞান ক্রমে নুগ্ন হলো, প্রকাশ পেল মোহ, কাম, বিষয়াসক্তি। দেবতার
প্রবাদ গণলেন, কারণ মানুষ আর যত্ন করে না, যত্নের হবিষ না পেলে দেবতারের এদিকে
পেট ভরে না। তখন তাঁরা আর কি করেন, লোকশিতানহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়ে বললেন,
একটা বিদিত করুন, নগতো আনরা যে রাজা বাই। ব্রহ্মা বললেন, ভর পেয়েনা, আমি
একটা বই তৈরী করছি, তার নাম হবে নীতিশাস্ত্র। তাতে দেশরক্ষার সব রকম ব্যবস্থা
লিপিবদ্ধ থাকবে, সেইনত চললে পৃথিবীতে শৃঙ্খলা স্থাপিত হবে, তেমনাদের আর কোনো
দুর্ভাবনা থাকবে না।

নীতিশাস্ত্র তো হলো, কিন্তু পড়বে কে? একটা আশাটা পাতা নয়, একনক অধ্যায়।
স্বপ্নানু মানুষের জীবন কুরিয়ে যাবে অধ্যায়গুলো শেষ করতে। শেষ পর্যন্ত রক্ষা হলো
নিবঠাকুর তা থেকে কেটে ছেঁটে বাব দিয়ে দশ হাজার অধ্যায়ের এক সানারি তৈরী করলেন।
কিন্তু তাই বা পড়ে কে? অতএব কাটাইট করতে করতে শেষ পর্যন্ত বৃহৎপতি আর
জ্ঞানার্ধ্যতে বিলে তাকে সংক্ষিপ্ত করলেন তিনহাজার এবং এক হাজার অধ্যায়ে।

বই তো হলো, কিন্তু লোকে যদি বই অনুযায়ী না চলে, তখন? দেবতার আবার
ছুটলেন, এবার বিকুর কাছে। তাঁকে বললেন, এমন একজন কেউ থাকা দরকার যে মানুষের
মধ্যে হবে শ্রেষ্ঠ, যার কথা লোকে শুনেবে। বিকুর তখন ভেবেচিন্তে এক নানসপুত্র তৈরী
করলেন, তার নাম হলো বিরাম। এই বিরামার বংশে উৎপন্ন আনাদের সর্বপ্রথম বড় রাজা,
নাম তাঁর পুত্র। বিকুর স্বয়ং তাঁর শরীরে প্রবেশ করলেন। স্বরাজ্যে আবার বর্ষ সংস্থাপিত

হলো পুখুর ওপে, তাই থেকে ধরিত্রীর আর এক নাম হলো পুখিবী। প্রজাদের হলো মনো-রত্নন, তাই থেকে নাম দেওয়া হলো রাজা। রাজার জন্ম বিষ্ণু প্রজাবে, তাই লোকে তাঁর বখ্যাতা স্বীকার করে।

শান্তিপর্ব্বেরই অন্য এক যায়গায় (৬৫ অধ্যায়) গল্পটা একটু অন্যভাবে বলা হয়েছে। এই গল্পটা পড়লে হঠাৎ মনে হয় হনু বা রত্নসের সোশ্যাল কন্ট্রাস্ট খিওরি পড়ছি। ভাগ্যো মহাভারতকার ইংরিজি বা ফরাসী জানতেন না। নরভো কেউ নিঃসংশয়ে বলে বেড়াতেন এ নিশ্চয়ই নকল। গল্পটা এই রকম।

আগেকার দিনে রাজা বলে কেউ ছিল না। অরাজক রাজ্যে যেমন হয়ে থাকে, লোকেরা পরস্পর খাওয়া খাওরি করে শেষ করতে বসেছিল নিজেদের। ইতিমধ্যে তাদের মতিগতি ছিলনা, সবাই দিনে ঠিক করল বাগা আনাদের মধ্যে খারাপ লোক তাদের আনন্ডা বরকট করব। নিজেদের মধ্যে আনন্ডা কোনরকম ছাউতেন রাখবো না—অর্থাৎ কি না এক ধরনের প্রিন্সিটট কনুনিমমের ব্যবস্থা। জা সম্বন্ধে যখন গোলামোগ নিটল না তখন সবাই বলে প্রজাপতি বুজার কাছে গিরে মিনতি জানাল, মোহাই ঠাকুর, আনাদের একজন রাজার ব্যবস্থা করে দাও, জা না হোলে আর প্রাণ বাঁচে না। তখন বুজা বললেন মনুকে, তুমি এদের শাসনের ভার দাও। মনু সেখানে বেগতিক, বললেন, এই মানুষগুলো বড় খাচ্ছে লোক, মিথ্যাই এদের ময়ল, এদের ওপর সর্গারী করা আনার পোষানে না। 'প্রজা' তখন একজোটি হোয়ে নানা রকম লোভ দেখাল, বলল, আপনার কোনো ভয় নেই। টাকা-কড়ি আনাদের যা আছে তার নানো অংশ আনরা আপনাকে দিয়ে থাকো কর হিসেবে, আনাদের মধ্যে তাদের অস্ত্রশস্ত্রে ভাল হাত আছে তারা আপনার সৈন্যে ভর্তি হবে, আনাদের যা কিছু পুণ্যফল তার চতুর্দাশ আপনার প্রাপ্য। অগত্যা মনুকে শেষ পর্যন্ত রাজ্যভার গ্রহণে রাজী হতে হলো, তিনিই হলেন আনাদের সর্ব্বপ্রথম রাজা।

রাজার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই ধরনের আর একটা গল্প আছে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ দীঘনিকায়ে। বৌদ্ধেরা গোড়ার দিকে ঠাকুরদেবতা মানতো না, তাই তাদের গল্পটা মারও বর্জ্য। তারা বলে এককালে যখন সত্যযুগ ছিল তখন রাজার দরকার ছিল না। তারপর ক্রমশঃ মানুষের অবঃপতন আরম্ভ হলো। তখন প্রজারা নিজেদের মধ্যেই ঠিক করলে, ঠাকুরদেবতার পরামর্শ না নিয়েই, যে একজনকে রাজা করতে হবে। রাজার নাম হলো "মহাজনসম্মত"।

তার পরে এন মনুসংহিতার যুগ। মনুস্মৃতির সপ্তম অধ্যায়ে রাজার উৎপত্তি সম্বন্ধে বা বলা হলো সেইটেই হয়ে গেল শেষ কথা। পরের যুগের স্মৃতিকার এবং অবঃপাত্ত রচয়িতারা মনুর ঘটনের পুনরুক্তি করে এলেন। মনুর মতেও আদিন যুগে রাজা ছিল না এবং রাজার উৎপত্তি অরাজকতার ভয় থেকে লোকদের উদ্ধার করার জন্যে। অবশ্য মনু-স্মৃতির রচয়িতা গোঁড়া হিন্দু, কাজেই সেখানে ঠাকুরদেবতা ছাড়া কোনো কাজ হয়না।

রাজাকে সন্তুষ্ট করলেন স্বয়ং ভগবান এবং সন্তুষ্ট উপকরণ হলেন বড় বড় সব দেবতারা, ইন্দ্র, বরুণ, আমিত্য, ইত্যাদি। এই সব দেবতাদের অংশ রাজার মধ্যে বিদ্যমান, তাই তাঁর সৌর্ধও প্রতাপ।

এই হলো রাজার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রাচীন খিওরি। এ থেকে অনুমান করা যায় প্রাচীন ভারত বিশ্বাস করতো এমন এক দিন ছিল যখন দেশে রাজা বলে কেউ ছিল না। তাঁর প্রয়োজন হয়নি কারণ প্রত্যেকে নিজের নিজের ধর্ম বেনে চলতো, শাসনকর্তার দরকার ছিল না। রাজা এবং দণ্ডনীতির উৎপত্তি হলো যেদিন থেকে মানুষ ধর্ম ভুলে যেচ্ছাচারের আশ্রয় নিল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে একধরনের যেচ্ছাচার বাঁচাতে গিয়ে আর এক রকমের যেচ্ছাচারকে সিংহাসনে বসান হলো। হিন্দু শাস্ত্রকার রাজার জয় গান করলেন ঘটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একখাটাও স্পষ্টভাষায় বলে ছিলেন যে রাজার প্রধান কাজ প্রজারতন এবং ধর্মস্থাপন। রাজধর্ম অধ্যায়গুলো বহাভারত এবং স্মৃতিগ্রন্থের বেশ কানিকটা যায়গা জুড়ে বদল। রাজাকে দেবতার স্থান বেওয়া হলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কর্তব্য নির্ধারিত হলো পুণ্যপুণ্যরূপে।

কি সেই রাজধর্ম? কোথায় তাঁর বিশেষত্ব। এ বিষয়ে একটু আলোচনা করা দরকার।

[ক্রমঃ]

শ্রীমা প্রসঙ্গ●

ডক্টর কে. আর. ঐনিবাস আরেক্সার

(১)

শ্রীমা যখন পণ্ডিতেরীর যোগাশ্রমে যোগদান করেন তারপর প্রায় বত্রিশ বছর (১৯৬০ সালে আশ্রমবাস ৪০ বৎসর পূর্ণ হল) অতিবাহিত হল। না, এক মুহূর্তের জন্যও না, তাঁর বিশ্বাস কখনও টেনেনি। ভবিষ্যৎ বেননি এসেছে কাছে, তেননি ঘুরে সবে গিয়েছে, এবং বিলুপ্তও হয়েছে, বিশ্বাসের পথের উপর পড়েছে সশেষের ছায়া এবং তা-ও আবার আপনিই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে এবং সব পৃথিবী, সব স্বর্গের রচনা প্রতিনিয়তই হয়ে চলেছে অবারে, নিঃশেষে। নাথে নাথে সচরাচর নববর্ষের প্রারম্ভে, কালের সঙ্কটমুহূর্তে সারা মানবের অথর্ণাকে প্রতিদূর্ত করে শ্রীমা “প্রার্থনা” গুলি সূত্রাকারে পরিণত করেছেন এবং এই প্রার্থনাগুলি—বিশেষ করে নববর্ষের বেগুলি—ব্যক্তি মানবের আশা ও ভ্রমকে দিয়েছে আকার ও তীব্রতা, লক্ষ্য ও গতি। যুদ্ধের স্রাকালে ও অবসানে রচিত কতকগুলি প্রার্থনার ব্যঙ্গনা ও সৃষ্টিশক্তির ঐশ্বর্য্যে প্রত্যক্ষ :

“১৯৪০

এ বছর হল নীরবতার ও প্রতীকার বৎসর...

হে ভগবান, আমরা যেন বুঝে পাই আমাদের পূর্ণ অবনমন একান্তভাবে তোমার করুণায় ”

“১৯৪৪

হে ভগবান, পৃথিবী তোমার কাছে বিনতি জানার যাতে সর্বদাই সেই একই নির্বুদ্ধিতার নাথে বারে বারে প্রত্যাবর্তন না করে।

আশাখর্বাস কর, কর নাও যেন স্বীকৃত ভুল নুতন করে পুনরাবৃত্ত না হয়।

সর্বশেষ আশাখর্বাস কর যেন এদের কর্মাবলী সঠিক হতে পারে এবং প্রচারিত আশ্বর্ষের আভ্যন্তরিক অভিব্যক্তি হতে পারে।”

“১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৫

● On the Mother—Chaps—XXIV-XXV & Postscript

তোমার বিজয়, ভগবান, তোমার বিজয় হয়েছে, সেজন্যে তোমাকে আনন্দের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

কিন্তু এখন আনন্দের প্রচলন প্রাৰ্থনা উঠে চলেছে তোমার দিকে। বিজয়ীরা অয় করে শুধু তোমাই শক্তিতে ও তোমার শক্তির দ্বারা। আশীর্বাদ কর, বিজয়ের সময়ে তারা যেন তোমায় ভুলে না যায় এবং বিপদের উদ্ভিগ্জতার সময়ে তোমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা তারা করেছিল তাও যেন রাখবে। তারা তোমার নাম নিয়ে মুক্ত প্রবৃত্ত হয়েছিল, আর তারা যেন শান্তি স্থাপনের সময়ে তোমার করুণার কথা ভুলে না যায়।”

১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্টে ‘ভারতনাত্যকে আৰাহন’, বিশেষ অর্ঘ্যপূর্ণ

‘না আনন্দের ভারতের আত্মশক্তি না তুমি, তোমার সন্তানদের করণ ছেড়ে যাওনি তুমি, গাঢ়তন অবশ্যদের শিনেও, এমন কি যখন তারা তোমার করুণা কর্ণপাত করেনি, সেবা করেছে অন্য ইষ্ট, অস্বীকার করেছে তোমার তখন পর্য্যন্ত—এখন তারা কিনে উঠে দাঁড়িয়েছে, তাই তো এই নৃত্তি-উদ্যায়, এই দিবা নৃত্তি যখন জ্যোতি কুটে উঠেছে তোমার বুখনওনে, প্রপত্তি জানাই তোমায়। পথ দেখিয়ে নাও আনন্দের—যাতে মুক্তির উন্মুক্ত প্রসার নিয়ে যায় সত্যকার মহত্ব প্রকাশে, নিয়ে যায় জ্যোতি-সমুদ্রের সম্মেলন কেন্দ্রে তোমার সত্যকার জীবনগায়। পথ দেখিয়ে নাও যাতে আনন্দের সর্বদা যেন মহৎ আনন্দের পথে দাঁড়াই, মানবজাতিকে দেখাতে পারি তোমার সত্যকার স্বরূপ,—অধ্যায় সাধনার পথে দিশারী, সকল লোকের নিত্র ও সহায়।”

শ্রীমদ্রবিশ্ব আশ্রম আর হয়ে উঠেছে পৃথিবীর কৃত্র সংস্করণ একটি। আশ্রমবাসীর সংখ্যা প্রায় ১৮০০ এবং “শ্রেষ্ঠ সহরচী” ছুড়ে ও এমন কি তাকে ছাড়িয়ে অসংখ্য বাসভবনে তারা বাস করে।

“গোলকৃষ্ণা” আশ্রমের একটি অতিথিভবন, মহাকাব্য ও নুই চিত্রাকর্ষক। ছাপাখানা, দপ্তরীখানা, মুদ্রকেন্দ্র, স্টাফের কারখানা, ডাক্তারখানা, গ্রন্থাগার, পাঠশালা, বিদ্যালয়—অনেক প্রাণবন্ত বিভাগের মধ্যে এগুলিও আশ্রমের সৌন্দর্য ও সম্মতি বৃদ্ধির সহায়তা করে।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী-অধ্যাপক ডাঃ সি. আর. বেন্ডী বলেন :

“.....এই অপূর্ণ আশ্রমে, জীবন ও জীবন-আনন্দের সাথে আধ্যাত্মিকতা ও আধ্যাত্মিক উসুতির এক আনন্দপূর্ণ একত্বতা ঘটছে। যেন বেদের অদ্বায়ী আবাসটিকে পণ্ডিতেরাতে পুনর্জন্ম করা হয়েছে।

কিন্তু অপূর্ণ মা, জাগ্রত প্রতিভা এবং মহান প্রভু-সমুদ্র, অনুপ্রাণিত তারা এখানেই আনন্দের পাই পুণ্ড্র ও প্রকৃতির অনুভবনীয় প্রতীক, ধারা জীবন, আলো ও সামগ্রিক আনন্দ বিচ্ছুরিত করেছেন।...যদি কেউ নব করে থাকেন যে প্রথম শ্রীমা সন্যাসীর নির্মলতা এবং অবিদ্যার মুক্তির অনুশীলন করবেন, তা হলে তারা ভুল করবেন। তিনি সন্যাসিনী নন। তিনি টেনিস খেলেন। সেবেদীয়া সর্বদাই জ্যোতির্ভয়। এবং এই মহামন্দিরের

উৎসবে এসে নিলেছে পুরুষ, নারী ও বালবিলোয়া—তাদের হৃদয়ে ভক্তি, চোখে ব্যবহারে কণ্ঠ্যবাহ্য্য প্রেম, আলো ও আনন্দ।”(১)

আশ্রমে রুক্ম সন্ন্যাসীভাবের স্থান শাখানাই, প্রায় নেই বলনেই চলে। রত্নগিরির নিরান্দা পদ্মবছায়ায় বসে শিখার্ষ বুকেছিলেন বিশ্বপু বোগী ও ভিক্টরের জীবন নিরানন্দ ও অবিদ্যা। এরূপ স্ব-কৃত নরকের তুলনায় কবি দ্বারের “ইনকার্বে” বেন একটি স্বাধা-নিবাস। “শ্রীমা কেন মূল্যবান ও হৃদয়ের পোষাক পরিহিত করেন” এ প্রশ্নের বুধে পাঠ্য প্রশ্ন করে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, “এই কি ত্রোনার অভিব্যক্ত যে ঈশ্বরের প্রকাশ হবে এ পৃথিবীতে দারিদ্র্য ও কুংসিতের প্রতীক হয়ে?” (২) ঈশ্বর যদি পরম সত্যই হন, তাহলে তিনি পরমশক্তি পরাজ্ঞান, আনন্দ, পরমহুশর; সৌন্দর্য ও আনন্দকে ছোর করে চেপে রাখলে সত্য হারায় গুপ্ত অর্থ, দীপালী তার আনন্দকল্পন জ্বলতা। নিরানন্দাত্মীর ডাঙ ও চার্বাকীর কুণ্ডলুই-ই নিয়ে যায় বিপথে। অনশন আত্মহত্যার পথ দেখার এবং তার চেয়েও শ্রু বিনষ্টের দিকে ঠেলে দেয় যত্নভোজন-নাশ্য। একমাত্র ন্যাপথটি, দিবক-খচিত মঙ্গলনয় পথটি পথ সেধিয়ে নিয়ে যেতে পারে ‘নিকম্ব কেন্দ্রের’ দিকে। সত্যকার সাধকেরা চিত্তা, প্রচেষ্টা আনন্দ এ সবই যত্ন হিসাবে অর্পণ করে এবং আশ্রমের প্রথমতঃ শিখায় রূপান্তরিত হয়ে কথুরেখা রচনা করে অরুণোদীপ্ত স্বর্গে উঠে চলে। মহা আনন্দের পথ বুনে দেয় যা তা হল শান্ত প্রসারতা, প্রদীপ্ত সত্যতা, জীবনমূলের সন্মুখ প্রসঙ্গতা। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অনেকগুলি পত্রে বুঝই পরিভাষ করে সেধিয়ে দিয়েছেন আশ্রমজীবনে এবং বিবর্তমান পাপিব চেতনার বিরূপ নাট্যশালায় নিবানানবী শ্রীমার ভূমিকা :

“ভগবান মানবী তনু পরিগ্রহণ করেন যাতে মানুষ পরে দিবা চেতনায় উঠে যেতে পারে।”(৩)

“একটি বাত্ব সৈন শক্তি আছে যা বিশ্বে, ব্যষ্টিতে কাজ করে চলেছে এবং সে শক্তি ব্যষ্ট ও বিশ্বেও অতীতে। শ্রীমা এসবেরই অন্তো নিব্বাচিত্ত প্রতিনিধি। কিন্তু তিনি এখানে কাজ করেন মানবী তনু নিয়ে—এমন এক শক্তি যা আত্ম ও পর্যাণ্ড রুজ্জগতে প্রকট হয়নি তাকে অবতরণ করাতে, যাতে এ জীবন এখানেই রূপান্তরিত হয়।”(৪)

আশ্রমে যে সব শিক্ষাকেন্দ্র আছে এবং সে-সব সেধে অন্যদের নত্যা ডা: রেডডীও বলেছেন যে “প্রাচীন উপাধিক্রি তৈর ও আনন্দ তাদের ধিরে রেখেছে”। শ্রীমার উচ্ছ পরিচালনায় আশ্রমের ছেনেয়েয়েদের দেহের গঠনের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম অনুশীলন করান হয় এবং “বুলেটিন অব শ্রীঅরবিন্দ ইন্টারন্যাশানাল সেন্টার অব

1 Mother India 3rd September 1949.

2 Letters of Sri Aurobindo on The Mother, P. 152

3 Letters of Sri Aurobindo on The Mother, P. 142

4 Letters of Sri Aurobindo on The Mother, Pp. 6-7

এডুকেশন" বি-ভাদিক পত্রিকায় আশ্রমজীবনের নানারূপ অসামান্য কার্যাবলীর বিবরণী ও ছবি পরিবেশন করা হয়।

ডাঃ স্রেডী উরসের ও শ্রীমাকে পুঙ্খ ও প্রকৃতির প্রত্যক্ষ প্রতীক বলে অভিহিত করেছেন এবং বাহ্যিকই শ্রীমা আশ্রমে বিশ্বের আদ্যাশক্তিরই অনুরূপ হান অধিকার করেন। যে ভাবেই হোক না কেন, সাধকের কাছে শ্রীমা হলেন পরমারাধ্যা মা, ঈশ্বরী মা ; যোগাশ্রম বলতে শ্রীমা, আবার শ্রীমতবিশ্বেরও সেই আশ্রম। আশ্রম অর্থ মা-কিন্তু তাই-ই শ্রীমা ও শ্রীমতবিশ্ব।

এখন অবশ্য শ্রীমতবিশ্ব সব কিছুই অন্তরালে, আর শ্রীমা হলেন সাধক সাধিকাদের আশ্রয় ও বহিঃশীষ্যের প্রত্যক্ষ পরিচালিকা। তাঁর আধ্যাত্মিক ন্যূনতম আনন্দের আর সন্নিবিষ্ট করে না, কারণ শ্রীমতবিশ্ব মনৈক পত্রলেখককে এ বিষয়ে পরিকার করে জানিয়ে দিয়েছেন :

"শ্রীমা ও মারা তাঁকে গ্রহণ করে এই উভয়ের সম্বন্ধ হল নিগূঢ় ও আধ্যাত্মিক না-হেলের ; এ সম্পর্ক পাখির মায়ের সঙ্গে সন্তানের যা তাঁর চেয়ে অনেক বহান ; মানুষী মা যা সেন ইনি তা সেন, কিন্তু অনেক বহত্তর ভাবে এবং এর মধ্যে আছে সম্পর্কের অকুরব...। এই যে আধ্যাত্মিক ন্যূনতম তা এ আশ্রমেরই নূতন স্বষ্টি নয় ; এ হল চিন্তন সত্য যাকে পাশ্চাত্য ও এশিয়া বহুগুণ আগে থেকেই বেনে নিয়েছে। পাখির সম্বন্ধ এবং চৈতন্যপুরুষ ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের মধ্যে যে পার্থক্য আমি দেখিয়েছি তাও নূতন আবিষ্কার নয় ; এ ভাব সম্বন্ধানে জানা আছে ও উপলব্ধি করা হয়েছে, সম্পূর্ণ সম্বন্ধ ও সরল ভাবে সকলেই স্বীকার করে নিয়েছে।" (১)

পণ্ডিতেরা যোগাশ্রমে শ্রীমা সাধকদের যা বলতে চান তা তারা আকাশ বাতাসের পরিবেশের মধ্যেই অনুভব করে কিন্তু সে অনুভূতিকে কোনরূপ হুঁকি দিয়ে শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। কোন কণিকের অস্তিত্ব যদি চোখ, কান সক্রিয় থাকে তা হলে তিনি তা নিজেই অনুভব করতে পারবেন। যদি আমাদের কল্পিত মর্শকটি শ্রীমাকে সশরীরে দেখতে না পান কিম্বা দেখেও তাঁর মধ্যে অনৌকিক কিছু না পান, তা হলে তিনি বেন সাধকদের দিকে নম্র বেন। সাধকদের শ্রীমায়ের উপর একান্ত ভক্তি—যখন তারা শ্রীমাকে মর্শন করে, প্রণাম করে, তখন তাদের মধ্যে অনেকেই এক অদ্বৈতপূর্ণ প্রফুল্ল আনন্দ-বিস্মৃতির ভাব প্রকাশ পায়—যে সংঘট আগ্রহ ও নম্রুৎ নীরবতা নিয়ে মায়ের সামনে প্রতি সন্ধ্যায় তারা ধ্যানে বসে—এ সবই আমাদের অতিপট্টিত চিত্তের খোঁজক বোণাবে। আর চিত্ত সৈব অশ্রুর বত বারন হয়ে পৌঁছে সেবে ব্রহ্ম বিশ্বাসের রাজ্যে। একজন চীনা পণ্ডিত, প্রফেসর জন ইয়ুন পান, অল্প কয়েক দিন আশ্রম পরিদর্শনের পর তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন এই ভাবে :

“আশ্রমের শ্রীমা কি মনুর? তিনি যে শক্তিময়ী তা প্রত্যেকেই অনুভব করতে বাধ্য। আমি অনুভব করলাম যেন, এই যার সঙ্গে কথা বলছি তিনি আমার সম্পর্কে আমার নিকটতম। হৃদয়বিক্রমই তিনি লক্ষ্যেরই না এবং আশ্রমে যা-কিছু রূপায়িত হতেছে সে সবই তাঁর পরিচালনায়।”

আর একজন দর্শক, ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক, এ প্রবন্ধের লেখককে বলেছিলেন যে শ্রীমাকে প্রণাম নিবেদন করার পর তিনি জন্ম-পুরুষের এমন শ্রবণ উত্তেজনা ও আনন্দ অনুভব করলেন যে সাগরাত্ত জেগে কাটাতে হল। বিমুগ্ধাবতীর ভূতপূর্ব অধ্যাপকও এখন আশ্রমবাসী, শ্রীমিশিরকূনার নিজ মহাশয় যখন প্রথম শ্রীমাকে দর্শন করেছিলেন ১৯৩৯ সালে তখন অভিজ্ঞ ও নোহিত হয়ে আবেগভরে লিখেছিলেন:

“তিনি (শ্রীমা) অনন্তযৌবনা ও চিরতাজপোষ নূর্ত প্রতীক। তিনি রাজরাজেশ্বরী, সবদেবতার উপাস্য তাঁর দিব্যাসাধী, যিনি সর্বত্রই আর্ঘ্য সন্তানদের অতঃশ্রবণ করছেন এবং তাঁর স্বর্গীয় নৃমু হাসির মধ্যে আছে তাঁকে গ্রহণ করা ও অন্যর লাভ করার সম্ভব যৌন আশ্রয়।” (১)

শ্রীময়বিশেষের নাম তিনিও পবিত্রতম শুদ্ধতার দীপ্ত ভক্তিমূলক কবিতা লেখার জন্য অনেককে অনুপ্রাণিত করেছেন—একজন পুত্রালাব, আর একজন নিশিকান্ত, একজন মিলীপ কিংবা একজন মীরদবরণ, একজন আর্জব বা আর একজন অমল—এসে সকলেই কবিতাকে বাধান করে আরপ্রকাশে নিমুক্ত এবং কবিতাগুলিকে শ্রীমা ও শ্রীময়বিশেষ চরণে অর্ঘ্য হিসাবে নিবেদন করে। পূর্ণবোধ সাধনার মূল কথা হল - “স্ববরণ কর, অর্পণ কর,” এই ভাবে শ্রীমার সাথে একাক্ষতাই যোগের প্রথম সোপান: সব কাজ তাঁর ইচ্ছাতে (২) সম্পন্ন, আত্ম-সমর্পণ হিসাবে সব কিছুই তাঁকে অর্পণ করা হয়।

(২)

বর্তদিন আগে ১৯১২ সালে শ্রীমা লিখেছিলেন “জড় প্রকৃতির রূপান্তর ও সৌন্দর্য ঘটান যেতে পারে দুটি উপায়ে, সে-দুটি দেখতে যদিও সম্পূর্ণ বিপরীত, তবু তাদের একসাথে হতে হবে—পরস্পরের উপর কাজ করতে হবে, পরস্পরের প্রতিপূন্য হয়ে।

1 Sri Aurobindo—A Homage, P. 21

(২) শ্রীময়বিশেষ কোন কোন চিত্রিত আকারে শ্রীমার স্থান লক্ষ্যে উল্লেখ আছে। কোন একজনকে লক্ষ্যে তিনি যোগ্যতা করলেন যে “শ্রীমাতার চেতনা ও আচার চেতনা এক, একই বিদ্যা-চেতনার ষেচ ব্রহ্মাণ্ড, কারণ লীলার জড়তা তা প্রত্যক্ষন,” আর এক চিত্রিত তিনি বলেছেন যে সাধকদের শ্রীমাতার কাজ থেকে আসে ও পক্ষি গ্রহণ করার কল্যাণের তিনি নিজেই করেছেন এবং “সর্বস্বের আচার কার থেকে নয়—এ বাহ্যিক যে আমি কংকি তা কোম কন্যারী উৎকৃষ্ট নয়, বরং এই-এ একবার কার্যকরী নয়।” (Letters of Sri Aurobindo on The Mother, Pp. 10-11.)

(ক) ব্যক্তিগত রূপান্তর, এক আত্মর বিকাশ বা নিম্নে যাবে দিব্য সাগুণধার ভিতরে।

(খ) সমাজগত রূপান্তর, এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি যা হবে ব্যক্তির প্রস্তুত ও উদ্ধারের অনুকূল।

যেহেতু পরিবেশ ব্যক্তির উপর প্রতিক্রিয়া করে আর অপরপক্ষে পরিবেশের মূল্যও নির্ভর করে ব্যক্তিগতবনের মূল্যের উপর, তাই দুটিই কাজ চলেবে মূগুণং ও পাশাপাশি"। (১) এ সব প্রতিপূর্ণ প্রতিক্রিয়াগুলি শুরু করতে, তাদের কার্যকরী করতে, শাসনাধীনে আনতে ও মূল্যবদ্ধ করে তুলতে পারায় আগে শ্রীমার হস্তে কয়েক বৎসরই কেটে গেল। শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমার ন্যায় দুজন অপূর্ণ শক্তিশালী আধ্যাত্মিক শক্তিকে একত্র হতে হয়েছিল প্রথম ১৯১৪ সালে ও দ্বিতীয়বার ১৯২০ সালে এবং দুজনেই দিব্য-জীবনের বহিরাগত প্রাঙ্গণের ভিত্তি স্থাপন, ভিত্তির উন্নতি সাধন ও নির্মাণের জন্য যেন পূর্ণ-নির্ভরিত। তাঁদের পূর্ণ-যোগের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল "এক আত্মর আত্মোন্মতি যার দ্বারা যে কেউ এই পথ অনু-সরণ করে থাকে সেই-ই কালে অদ্বিতীয় সবস্বত্বকে প্রত্যেকের মধ্যে আবিষ্কার করতে পারবে এবং মানসচেতনার চেয়ে এক উচ্চতর চেতনার বিবর্তন হবে যা হল আধ্যাত্মিক, বা সেই অতিমানস চেতনা যে মানস প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করে দিব্যে পরিণত করবে।" (২) পণ্ডিতেরী আশ্রমকে নিঃসঙ্গেই বলা যার একটি প্রধান বীক্ষণাগার যেখানে বিরাট গবেষণা চলেছে। একভাবে বিশৃঙ্খল শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অন্তর্গত বলা যায়। শ্রীমা ও শ্রীঅর-বিন্দের কাছে কত অনুশাসিত হই প্রসারিত হয় পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে, তারা শুধু ডাকে, নৈরাস্যের সঙ্কট পাঠায় বারে বারে এবং তাদের নিবেদন যদি আত্মরিক ও জরুরী হয় তখনই এঁদের কাছ থেকে সাড়াও যায় সুনিশ্চিত ও অব্যর্থভাবে। (৩)

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা উভয়েই আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যে আগলি কাজ শুরু হয়েছে নতুন। অতিমানসের অবতরণ, মানবের দেহবিন্যাস, জড় প্রকৃতির অতিপ্রাকৃতে রূপান্তর—এ সবই অতিপ্রেরিত; এর চেয়ে বেশী কিছু বলা বিপজ্জনক। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "একাত্ত নিঃসঙ্গেই আমি জানি অতিমানস শক্তি হল এক সত্য, প্রকৃতির প্রতিটি স্তরে তার আবির্ভাব অনিবার্য। প্রশ্ন হল শুধু কবে ও কি ভাবে। তাও উদ্ভূত কোন এক স্তর থেকে সঙ্কলিত ও সুনিশ্চিত হয়ে আছে; কিন্তু এখানে বিরুদ্ধ শক্তির কঠিন বিরোধিতার মধ্য দিয়ে তাকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে।..... তবে এ নিশ্চিত যে অনেক পুণ্য আত্মাকে এ ভগতে পাঠানো হয়েছে যাতে এখনই এখানে সে-রূপান্তর কার্যকরী হয়। এই হল অবস্থা। আমার বিশ্বাস ও ইচ্ছা হল এখনই হোক এর সংশোধন"। (৪) নূতন

১ Words of the Mother, P. ২

২ Sri Aurobindo and His Ashram, P. 6১

৩ Cf. K. D. Sethna's "A Personal Preface" to his Adventure of the Apocalypse

৪ Letters of Sri Aurobindo (2nd series) Pp. 67-68

সবদয়ের মধ্যে ভড় ও আবার দুই শ্রেণীকে গ্রহণ করে নিতে হবে, আবার অতিক্রমও করতে হবে তাদের :

ওই বেগ, ঈশ্বরের হুটি বিপ্লব জগৎ—

আত্ম ও অনুভূতির—

তাদের পরিণয় হল

এই সঙ্গীর্ণ বাসর-সম্ভার

দাঁ, কুস পতনের গভন উঠন

সেবদ্বয়ের উত্তর নিয়ে

স্তোমহ দেহের প্রাণ পায় হয়ে। (১)

এ ভাবে মনকেও অতিক্রম করতে হবে এবং এক নতুন তরকে—অতিনানস পত্রিকে—অবতরণ করতে হবে ও তাকে ভড় চেতনার সাথে অসারী সম্বন্ধে বীধতে হবে। এ কি বিখ্যা অথু ছাড়া আর কিছু নয়? অস্বেরতা বিজয়ী, আর দেবতার পঞ্চাঙ্গপদপদই করে চলেছে। “বিগ্ণাস ক্রিয়ের গিয়েছে, কৃতজ্ঞতার জন্ম হয় নি”; কুস বৃহত্তর দায়িত্ব পালন করে চলেছে; পঞ্চাঙ্গপদপদই হল কালের নীতি। কিন্তু শ্রীনাথ আকাশভেদী বাণী উঠেছে বিধাবীন নিতীক

“এগিয়ে চল এগিয়ে চল নিরন্তর।

হৃদয়ের শেখপ্রান্তে আছে আলো...

যুদ্ধের অস্ত্র বিজয়।”

(৩)

পূর্বের অধ্যায়গুলি লেখা হয়েছিল ১৯৪৯ সালে নভেম্বর মাসে এবং যদিও তারপর মাত্র দুটি বছর কেটে গিয়েছে কিন্তু তারই মধ্যে শ্রীনার বিস্তীর্ণ কর্মরাজি আগ্রবে ও তার বাইরে আরো প্রসারিত ও প্রসংসিত হয়েছে। তবে এটি মাঝের একটি ঘটনা মাঝে বিধুকে প্রচণ্ডভাবে আনোড়িত করেছে। এই ডিসেম্বর সকালে খবর ছড়িয়ে পড়ল আকাশে বাতাসে শ্রীঅরবিন্দের মহাসনাধির। অদ্ভুতের কঠোর পরিহাস যা তা “সাবিত্রী”তে পূর্বের ই বলা ছিল, অবশেষে তার বিকাশ হল এই নর্ত্যো :

অনন্ত নিশীথের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে তাকে,

বেশন জানে তার সূর্য্যকে ভেদনি জানতে হবে বিধাতার অচকারকে

এরই অন্যে গরুরের ডলার বেনে বেতে হবে তাকে,

এরই অন্যে সে দুঃখের অগীর দুর্গ সব আক্রমণ করবে।

অক্ষর, জ্ঞানী, জ্ঞানী
 মর্হকে জ্ঞান করতে সে মরকেও প্রবেশ করবে।
 নান্দিত জ্যোতি নিরে আবিস্কৃত হবে সে
 যেখানে বহু বিশ্বের গীতানা এসে বিশেষে...
 তখন উৎপাটিত হবে সব বাতনার মূল...
 এ মরমীলন হবে অসীমের আনন্দ-নিবাস।
 অনুভব পূর্য পাবে অস্তরের স্বাদ
 বিশ্বজ্ঞাতের তপনি হবে কর্ণের সবাণি। (১)

নীতের সত্যের আপাত প্রত্যাহারের পর পূর্বে নির্ধারিত সমুদ্র বসন্তের পদক্ষেপ অবশ্যস্বাধীন। তন্মুখ সাধারণ মানুষ এ ঘটনাটির নিজের বতন অর্থ অনুমান করে নিল, শোকাগ্নিত হতবুদ্ধিও পরে শান্ত হবে উঠল—কিন্তু একেবারে আশ্রবের মধ্যে এক স্বচ্ছ নিস্তরর ভাব ছিল। যদিও আপাতদৃষ্টিতে জীবনধীন নিষ্ঠারূপিত হয়েছিল স্বাত ১-২৬ মিনিটে, কিন্তু কয়েকদিন ধরে শ্রীমদ্রবিশ্বের দেহ নিশ্চল হয়ে ছিল “বিভবের শান্তির বিশালতা নিয়ে, যা সহস্র সহস্র মর্মান্বী মর্মান করেছিলেন।” (২) শ্রীমা বোধবা করলেন যে “শ্রীমদ্রবিশ্বের দেহ অতিমানস-জ্যোতির বর্ণচ্ছটার উদ্ভাসিত এবং পচনের কোন চিহ্নই নেই,” তাই প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিতে বাদ্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যাহত করা হয়নি। ৯ই ডিসেম্বর বিকাল ৫টার সময় শ্রীমদ্রবিশ্বের দেহ আশ্রবেরই প্রাঙ্গণে সমাধিস্ত করা হয়েছিল। (৩)

মানুষ অন্য শোকে শোকাভূত বখন তখন শ্রীমদ্রবিশ্বের সাধনাপূর্ণ এই সব বাণী এসেছিল মন-জীবন-গীতি সজ্ঞাপন করে। ৭ই ডিসেম্বর বললেন :

“ভগবান আজ প্রাতে আমার কথা দিয়েছে নিশ্চয় করে, যতদিন তোমার কাজ পূর্ণ না হবে ততদিন তুমি থাকবে আমাদের কাছে, শুধু দিশারী আলোককারী চৈতন্যরূপে নয়, তুমি উপস্থিত থাকবে কর্ণেরও মধ্যে আগ্রজভাবে। অমাত্র কক্ষয় তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তোমার সমাধি থাকবে এখানে, পৃথিবীমণ্ডল পরিভ্রাণ করবে না যতদিন পৃথিবী ক্ষান্তগতি না হয়।”

৯ই ডিসেম্বর বললেন :

“হে, আমাদের ভগবানের অঙ্ক আশ্রণ, তোমাকে আমাদের অপেক্ষ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। তুমি যে আমাদের জন্য এত করেছ—এতখানি কাজ করেছ, যত করেছ, কষ্ট করেছ,

1 Savitri—Book VI, Canto 2

2 K. D. Sethon's "The Passing of Sri Aurobindo," P. 5

3 লেখক নীরবরণের “ঐশ্বর্যবিশ্ব : এই যে জ্ঞানি এখানে, এই যে জ্ঞানি এখানে” ও কে. ডি. সেথনের “ঐশ্বর্যবিশ্বের মহাদেবগণ ও ইয়ার নিম্নত্ব ও পরিণতি” পুঁকি বই দুইখানির প্রতি পৃষ্ঠা আকর্ষণ করেছেন, ঘটনাটির রাসনিক ও বিশ্বজনীন পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণ অর্থো জ্ঞেয়।

জাণা করছে, সযা করছে, জুনি যে সব কিছু সম্বল করছে, চেষ্টা করছে, তৈরী করছে, সংস্কার
করেছে আনাদের জন্য ; তোমার সম্বন্ধে প্রণত আনন্স, আর এই প্রার্থনা তোমার কাছে, আনন্স
যেদ কখন জুলে না বাই, এক মুহূর্তের জন্যও, তোমার কাছে সবকিছুর জন্যে কত আনন্স
ধনী ” ।

১৪ই ডিসেম্বর আবার আনালেন :

“ শ্রীঅরবিন্দের জন্য শোক করা অর্থ শ্রীঅরবিন্দকে অপমান করা—তিনি এখানে
রয়েছেন আনাদের সঙ্গে আগ্রত জীবন্ত । ”

এবং ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৫০ সালে বললেন :

“আমরা তাঁর স্যাগুণ্যে ধাঁড়িয়ে, বিনি আপন মূল জীবন বলি দিয়েছেন তাঁর রূপান্তর
কাজটি আরো পূর্ণতরভাবে সম্পন্ন করার জন্যে ।

তিনি সর্বদা আনাদের সঙ্গে রয়েছেন, জানছেন আনন্স কি করি, জানছেন আনাদের
প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি অনুভব, প্রতিটি কর্ম । ”

শ্রীঅরবিন্দ কথা দিয়েছেন নিশ্চয় করে, যখন তিনি ছিলেন “দৃষ্টতঃ” আনাদের
সঙ্গে, যে তাঁর এবং শ্রীনারের চেতনা এক ও অভিন্ন এবং বাস্তবিকই যদি “কেউ
শ্রীনার চেতনা অন্তরে অনুভব করে তবে তাঁর জানা উচিত যে তাঁর পিছনে আবিও
আছি । ” (১)

সেই এক ভোগ্যতিকে অবতরণ করার জন্য বহু সব বিরুদ্ধ তান্দ্রী শক্তির বিরুদ্ধে
যে একক সংগ্রাম শ্রীনা চালিয়েছেন সে পুণ্য সব প্রত্যক্ষবাদী মনের কাছে দিব্য-সংগ্রামের
প্রতিকল্প পরিগ্রহ করে, যে সংগ্রামের কথা গুরুদেব নিজেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন
নিম্নলিখিত পৃষ্ঠা ও পৃষ্ঠা বাণীর মারফতে :

এ বিরাট বিঘ্নে একলা ধাঁড়িয়ে

নীরব আশ্রয় প্রবল এষণায়

মূর্ত্তভাগী অস্ত্রাশ্রয় জীব আবেগে

নিঃসঙ্গ এক সে-ই তাঁর কর্মের যোগ্য । (২)

শ্রীঅরবিন্দের এই আপাত “প্রত্যাহার” এক অদ্ভুত মনে পরিণত হয়েছে যা তাঁর
অপূর্ব উপস্থিতির বাস্তবতাকে আরও প্রকট করে তুলেছে । নীরদবরণ লিখলেন এই প্রসঙ্গে :
“শ্রীঅরবিন্দের সমাধিবক বিদীর্ণ করে আঙনের সহস্র জিহ্বা উঠেছে, চতুর্দিকে ছড়িয়ে
পড়েছে, আশ্রমকে আবৃত করে, তা প্রত্যেক সাধকের বকে মলছে এক অনির্বাক উচ্ছ্বাসী
আহ্বান । আর শ্রীনার অন্তর ও বাহির বিরে, চেতনার প্রদীপ্ত হয়ে, সেহে এক হয়ে রয়েছে

1 Letters of Sri Aurobindo on The Mother, P. 10

2 Savitri Book VI, Canto 2

ভীর বিমোহ। তখনতে পাই আনন্ডা ভীর সন্ধ্যা-আগ্নাত দিনেবন পদসন্ধ্যা এ মাটিতে, সেখণ্ডে পাই ভীর উজ্জ্বল সুবর্ণ দেহ, তখনতে পাই ভীর কুণ্ড গভীর ভাষা।” (১)

ইতিমধ্যে রূপান্তরের কাজ অবিস্মৃতিভাষে এগিয়ে চলেছে। শ্রীনারায়ণের শক্তি এখন পৃথিবীতে নিখিঁটে লক্ষ্যের যে সহস্রাবিক কর্মাবলী তার উপর পূর্বের চেয়েও সক্রিয়ভাবে দিব্যত। আশ্রমের নানাবিধ কার্যাবলী ও শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীনারায়ণের আশ্রমসুখাবলী পূর্ণবোধের পথানুসরণের সঙ্গে সঙ্গে আত্মজাতিক “বিশুবিদ্যালয় কেন্দ্র” সংগঠিত হচ্ছে এবং ভীর ঘাটা পরিচালিতও হচ্ছে।

২৪শে এপ্রিল ১৯৫১ সালে শ্রীঅরবিন্দ মৃত্যু সন্ধ্যায় শ্রীনা বাণী বলেন :

“শ্রীঅরবিন্দ আমাদের মধ্যে উপস্থিত এবং এই বিশুবিদ্যালয় কেন্দ্র স্থাপনে তিনি ভীর সন্যাস সূচনী শক্তি দিয়ে পৌরহিত্য করছেন এবং তিনি বহুদিন ধরে স্থির করেছিলেন যে এক্ষণ কেন্দ্রই প্রকৃতির একমাত্র উপায় যার দ্বারা সন্যাস মানবজাতি অতিমানস জ্যোতিষে গ্রহণ করতে পারে, যে জ্যোতিষ মানবসমাজের প্রবৃত্ত মানবের রূপান্তর ঘটাবে এবং যা সৃষ্টি করবে এক নব জাতি, প্রকাশ করবে এক নব জ্যোতিষ, শক্তি ও জীবন।”

পৃথিবীতে বিশুবিদ্যালয়-কেন্দ্রের উদ্দেশ্য শ্রীনা করছেন এবং এই নূতন শিক্ষার গবেষণার কাছেই মানুষের আকাঙ্ক্ষিত অতিমানস রূপান্তর লাভের চাবিকাঠি। এখানকার পাঠ্যক্রমে কিছু বাক নেই যা সত্য একদেশশ্রুতি নেই; কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানের মধ্যে অথবা পরস্পর-বিরোধ ভাষেব আনন্ধ্যাও নেই; তবুও সত্য পরস্পরে অর্থভাষে অবিস্মৃতি এবং এখানে যে শিক্ষা দেওয়া যা নেওয়া হয় তা আধুনিক নির্ভুল ব্যবহারী ভাষাপন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেক উন্নততর প্রকৃতির। বুদ্ধিগত ও বিজ্ঞানগত নিয়মানুবর্তী অনুশীলন থাকবেই; আবার কলাবিদ্যার নানুধীকরণের প্রভাবও থাকবে; তবে সকলে একযোগে শ্রীঅরবিন্দ-উৎস থেকে আকন্ঠ পান করে আবার প্রসারিত ও স্বজনশীল একত্বতার বৈশিষ্ট্য উপভোগ করবে। নানীকান্ত গুপ্তের ভাষায় বলা যায় যে এ বিশুবিদ্যালয়-কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হল “পৃথিবীতে নূতন মানবের প্রজাবনা—নূতন জীবন, নূতন চেতনা নিয়ে। এ সব কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব এবং সম্পন্নও হবে এ প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। শ্রীনা আমাদের মধ্যে অবিস্মৃতি, তিনিই প্রতিশ্রুতির সার্থক পরিপূর্ণতা দান করবেন।” ব্যর্থতার দীর্ঘ রাত্রি নিশ্চয়ই শীঘ্র সন্ধ্যা হবে; অসম্ভব জ্ঞানের অর্ধ-আলো উজ্জ্বল ভব দীপ্তির দ্বারা অভিভূত হবে; তারপর শক্তি জ্ঞান সৌন্দর্য ও আনন্দের সাথে বিশে হবে বিশেষ বস্তুিত :

এ ভাবে বস্তু নিজেই খুলে ধরবে সেবতার কাছে

এবং সাধারণ প্রকৃতি বিরাট উজ্জ্বল অনুভব করবে;

সাধারণ কর্ম আবার দীপ্তিতে হবে উজ্জ্বলিত

১ “Sri Aurobindo : I am here, I am here” P. 24

এবং ইষ্টকে দর্শন করবে সাধারণ বস্তুর মাঝে।
 প্রকৃতির অস্তিত্ব হবে ঐশ সেবতাকে প্রকাশ করতে,
 আশ্রয় গ্রহণ করবে মানবনীলা
 এই বর্জ্য জীবনই হবে দিব্য-জীবন। (১)

বাসবদত্তা

[অঙ্কব্যয়]

ঐজয়বিদ্য

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাসবদত্তার ঘরোয়া একটি কক্ষ।

বাসবদত্তা, যত্নালিকা

বাসবদত্তা। তাহলে সাহস করে আসতে পেরেছ এখানে।

যত্নালিকা। পেরেছি।
তুনি যেন পার সাহস করে
আনার চোখে চোখ রেখে তাকাতো।
পার না।
তাহলে ?

বাসবদত্তা। শাস্তির ভয় তোমার এতটুকু নেই ?

যত্নালিকা। স্বর্গের সঙ্গে তোমাকে বন্দী রাখার জন্যো ?
না, এতটুকুও না।

বাসবদত্তা। কী করে ও-সাহস পেলে ?

যত্নালিকা। গাধিনী বালা,
তুনি কী করে সাহস পেলে
স্বামী স্বামকন্যাদের ধরে এনে দাসদাসী রূপে রাখতে ?
কোন সাহসে ছিনিয়ে নিয়ে এলে এখানে
সৌভাগ্যলিপিনীকে,

তাকে তোমার দাসী রেবে
 উপহারে আনিদনে তিরস্কারে ও হুকুমের ভারে ঢেকে
 করলে তোমার বধুর দুনিবার ইচ্ছার পুতুল ?
 ভাবছ হৃদয় তখন আমার উষ্ণ হয়ে ওঠেনি ?
 এমন তোমার ও সকলের উপর নিলান প্রতিশোধ ।

বাসবদত্তা । প্রতিদ্বন্দ্বিপার বিশ্বাসঘাতক, তোমাকে দেব নাঠোঁগোবদি ।

বহুলিকা । নাও,
 তবে হাসব আমি
 আর দ্বিভ্রাণা করব তোমাকে
 কী করলে হাতটি দিবে তুনি ?

বাসবদত্তা । নাও, এই ধর শান্তি ।

(বহুলিকাকে হয়ে নিম্নের কটব্যের দ্বারা দিবে এবার)

বহুলিকা । ধান । আর সহ্য করব না ।
 কী কাজ করেছ
 আর কী নিম্নের ভাগ্যে আছে
 ঘেনেতনেও খেলার মত থাকতে
 নতুন করে না তোমার ?
 বরং একটু ভাবো
 ভয়ানক আগামী কালের সাননে কী করে বঁড়াবে ।

বাসবদত্তা । তুনি যেন কর
 আমার আশ্রয় আর-সকলের দুষ্টির অগোচর করে
 রাখা সম্ভব ?
 তাহাড়া আমার অন্য পরিচায়িকায়া রয়েছে ।

বহুলিকা । তোমার বিশ্বাসঘাতকতা করবে এমন কেউ নয় তারা ।
 এ-ব্যাপার আনানানি হলে
 তোমার পিড়ার স্বর্ণ
 গিরে পড়বে তোমার স্বাক্ষর উপর ।

বাসবদত্তা । বরং আমার উপর ।

নাথখানে থাকবে আমার হৃদয় ও দেহ
তার বিগ্ৰহ বর্ষ হয়ে ।

মহালিকা । সত্যকালে তোমাকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে দুই,
আর বৎসকে বন্দী রাখা হবে কোনো অতল গর্ভে
কিন্তু নির্বন মানুষটির হস্তমান হৃদয় তুচ্ছ করার জন্য
অন্য কোনো কঠিনভর ব্যবস্থা হবে ।

বাসবদত্তা । সর্বনাশ ।

বুদ্ধিবন্তী তুমি ;
যে-বিপদ তুমি ঘটাইবে
তার অবসান করবে না তুমি ?

মহালিকা । খুব যদি অনুরোধ কর
তবে পারি এবং করব তা ।

বাসবদত্তা । অনুরোধ করব তোমাকে ।

মহালিকা । নিজের সহায় নিজে হও, অহঙ্কারিণী ।

বাসবদত্তা । কখনো যদি তোমাকে বাপে পাই ।
ধাঁড়াও ! শ্রিয় মহালিকা, পারে বরি তোমার...

মহালিকা । আরো নত হয়ে ।

বাসবদত্তা । ওঃ !

(নতমান হয়ে) ভাই, এই তোমার পারে ধরেছি,
একান্ত বিনতি করে বলছি তোমার—
ভাবো, উপায় কর,
আমার জন্য ব্যর্থ কর সব চিন্তা তোমার ।
স্মরণ কর তোমার দুর্বল কত শাস্তির আমি করে দিয়েছি—

ভা হতে পারত কী কষ্টকর।
 খেলার মাঝে তুনি হয়েছ,
 হয়েছ আমার আনন্দ, আমার দানী, আমার ভগ্নী,—
 সদাসর্বদা সহায় হও আমার, বাঁচাও তাঁকে,
 আর বার্থ কর পিতার জেদ,—
 তারপর বল কত কী পুরুষের জোনার চাই।

বহুলিকা। কিছুই না।
 জোনার পিতা এবং গোপালকের উপর
 প্রতিশোধ গ্রহণই যথেষ্ট বধুর।
 এবার আনি পরিতুষ্ট।
 তবে প্রথমে কথা দাও
 বৎস হুল না হওয়া পর্যন্ত
 সর্বক্ষেত্রে তুনি আমার আদেশ বেনে চলেবে।

বৎস। কথা দিলাম।
 তুনি আমার দিশারী
 আর নিবিবাহে জোনার পদাঙ্ক অনুসরণ করব আমি।

বহুলিকা। তাহলে জেনে রাখ কার্য সমাধা হয়েই গিয়েছে।

বাসবদত্তা। (একেবারেই ২৭শের প্রতিবেদে)
 বৎসরাজ, তোমাকে তো ডেকে পাঠাই নি।

বৎস। নিশ্চয় ডেকেছ।
 আমি শুনলাম তোমার হৃদয়ের হুকুম।

বহুলিকা। চুপ।
 রাজসভায় ও কী সোরগোল ঘটছিল?
 ওই দেখ, ওই দেখ হাস্যকর বুড়ো কুঁচো।
 জানুনতীর খেল।

বৎস । ও চোখছোড়া ভো বশ চিনি ।
বহুলিকা, ও আনাদের বহু ।
ওকে আনাদের কাছে এখানে
নিযে আসতেই হবে ।

বহুলিকা । বাহুকন্যা, এস আনরা ওকে ডেকে আনি ।
চবংকার বিন্দুক ও ।

বাসবদত্তা । ধিক তোনাকে ।
এই কি ঠাটা বহুতা করবার সময় ?

বহুলিকা । (অর্ধমুখ দৃষ্টি লিখন কর)
ইয়া ।

বাসবদত্তা । আচ্ছা, ডাকো ওকে ।

বহুলিকা । আর তুনি অন্তঃপুরে যাও ।

বাসবদত্তা । কেন, অন্তঃপুরে ?

বহুলিকা । আচ্ছা বেয়ে !
কথা দিয়েছ না আনার আদেশ যেনে চলতে ?

বাসবদত্তা । নিশ্চয় । (ভিতরে প্রবেশ । অহুতিকাঃ সিঁড়ি ধরে নামা ।)

বৎস । যৌগন্ধরায়ণ একে পাঠিয়েছেন ।
এ বলে দিচ্ছে সব উপস্থিত,
সব যেন এক দেবতার পরিকল্পিত ।
এই বিশ্বচরাচর এক নীরব সৈবইচ্ছার হাড়ের পুতুল,
আনাদের কর্ন ও চিত্তার অন্তরানে অনেকো চলে সে ;
বিরাগ ঘটনাস্রোত ভারই নির্দেশে বয়ে চলে,
ভারই নির্দেশে ঘুটে বার বেখানে জুটবার ।

এই বকবেই না তুমি,
 ওগো আনাদের স্বর্গরাজ প্রভু,
 চালনা কর তোমার রাজত্ব ?
 চল কোনো ভাবনা চিন্তা না করে,
 কারণ কানাড়ীত তোমার মধ্যে তোমার আনন্দ ও শক্তি ?
 (হস্তবশী বসন্তকে নিয়ে মল্লিকা আসেন)
 এই প্রাচীন যে নৃত্তিকে নিয়ে এলে
 এ কে ?

মল্লিকা । জানতে ইচ্ছা হয়
 এর কুম্ভের নতুন
 এর জিহ্বাও বিকট ও বিসদৃশ কি না ;
 এটুকু জানবার জন্যেই একে আনা ।

বসন্ত । এ যুগের অনন্যা রমণী কোথায় ?
 রাজপুত্র কিবা দাসদাসী আপনারা...

মল্লিকা । উত্তরেরই কিছু, মশাই ।

বসন্ত । তাহলে, যে রাজপুত্রদের অধিপতিগণ,
 ভাববেন না আপনার অধিকতর পবিত্র রাজমর্যাদাকে
 আনি ভাঙিছল্য করছি ;
 কিন্তু এখন কেউ যদি এই কুণ্ডল বৃদ্ধ কুম্ভটিকে
 অবস্টার বিশুবিশ্রুত স্থানবাসীদের সঙ্গে
 পরিচয় করিয়ে দেয়
 তাকে পুরস্কার দেব আমার সবচেয়ে স্বর্ণসিক্কর ।

মল্লিকা । অবস্টার শাসনকর্তা এবং কারাগারের সঙ্গে কেন নয়,
 বৌগদ্ধসম্প্রদায়ের গুপ্তচর ?

বসন্ত । (মল্লিকাকে তাকিয়ে)
 এ কি ? এ কি ?

মহানিকা। তরুণ বৃদ্ধের জন্য বনকারক পানীয়।

বৎস। অসহ্যেতে বল ত্রোনার বাণী;
শ্রোতারা এখানে সব বন্ধ।

বসন্ত। (মহানিকার দিকে দৃষ্টি কটাক করে বৎসের উদ্দেশ্যে)
সবয় ত্রোনার বৃথা যায় নি।
কিন্তু প্রগলভ কুমারী,
আপনি আমার তুচ্ছ তরুণ কেশওচ্ছ
ডয় দেবিয়ে সত্যসত্যই শাস্য করে দিবেছিলেন প্রায়।
তবে ওনুন কেন আমি নুশ্চভাবে বহন করছি
এই শব্দভার
আর এই কুশল রাজকীর নাছন,—
না, আর পরিহাস নয়।
বৎসরাজ, ত্রোনার বেশে প্রজারা জুনেছে দাবি;
তারা ত্রোনার নরীদের ঘিরে ধরেছে
রাজপ্রোহের অভিযোগ করে;
তারা চায় ত্রোনাকে,
তাদের ক্রোধ শাস্ত হবার নয়।
হুতরাং সবরে কর
যা করতে চাও তুনি,
অবিলম্বে পালাও
নতুবা যুদ্ধ ত্রোনার সন্ধান
ত্রোনার দুঃস্বপ্নের সাননে এসে ঝাঁড়াবে।
ত্রোনার বাণী তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি আমি,
অবস্তীর গিরিপ্রান্তে লুকিয়ে তিনি।
আর যদি সাহায্য কিছু চাও তা দিতেও আমরা প্রস্তুত।

বৎস। তিনি বেন আমার সৈন্যদের ঠেকিয়ে রাখেন
অরণ্যের অন্তরালে,
যেখানে সুপ্রশস্ত বন বনানী সীমান্ত চেনে দিগেছে
উজ্জয়িনীর উপকণ্ঠে,
অবস্তীর গৈরিক কটিবেশের পাশ দিগে।

লোকনাথের গিরিকন্দরে অপেক্ষা করুন তিনি,
আনার বৃথ দেখা না দেওয়া পর্যন্ত
সীমান্ত বেন অতিক্রম না করেন।

বসন্ত। আর কিছু?

বৎস। আর সব নিষেধ বলে সমাধা করব।

বসন্ত। উত্তম, তাহলে বাই আদি।

বৎস। হ্যাঁ, তবে তোমার পারিশ্রমিক সোনা নিয়ে,
তোমার প্রস্থানকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে রহীন করে যেতে।
শ্রিত বহু, সোনা এনে দাও একে
কিনা বাসবদত্তার কাছে চাও
একটুকরো হীরে বানিক অথবা কিছু অনভার
যা সাবধানী দৃষ্টির কাছে
এ'র ছদ্মবেশের সঙ্গে বেশ মানানসই মনে হবে।
(যক্ষদিকার অশ্রু বহলে প্রবেশ)

বসন্ত। ওটুকু আনার উপর ছেড়ে দাও।

বৎস। আনার জন্য অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়েছ তুমি।

বসন্ত। বেচারা অনর্ক আসবে বলে ব্যস্ত হয়েছিল,
কিন্তু এসব কাজে বুদ্ধির দরকার,
আর ওর তো সম্বল জোতা সাবস আর একখানা বীণা।
বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করি
কিন্তু ওঃ এই কুঁজ!
শীঘ্র আর লোভা হয়ে হীটতে পারব না,
তোমার জন্যে বদন করছি সর্বদা অনুগত মত বেদনা
ভার থেকেও সহসা মুক্তি পাব না।

বৎস। বন্ধু, ধরা পড়লে
তীব্রতর যন্ত্রণা তোমার ওপর দূর করে দিত।
আমার স্মরণে থাকবে।

(বর্ষ ও অনন্দের নিয়ে যত্নলিলাঃ প্রবেশ)

ধর এই অলঙ্কার সব ;
এই মুহূর্তে যথাসীম্র পাল্লাও,
ঠিক তোমার পরেই আমি আসছি।

(দশমের প্রস্থান)

যত্নলিকা। তোমার মতনবাটি খুলে বল।

বৎস। এই সব কঙ্কের চারদিকে কড়া পাহারা।

যত্নলিকা। কিন্তু প্রবেশদোয়ান রয়েছে জো।

বৎস। বাসবদত্তাকে বল একদিন সন্ধ্যায় তার জাইদের উপ্যানে ডাকতে
তারপর স্ত্রীর শ্রোত্রি বেন দায় হয়ে।
এখন গুরুপক্ষের রাত।
সিংহদার কটি ?

যত্নলিকা। তিন,
তবে দক্ষিণদার প্রাকারের সবচেয়ে কাছে।

বৎস। সেখানে ক'জন পাহারা ?

যত্নলিকা। তিনজন কিরাত-রমণী সে-দার রক্ষা করে।

বৎস। ওদের আঘাত করতে পারি না।
অন্য কোনো উপায় বের করতে হবে তোমাকে।

যত্নলিকা। স্ত্রীর জুবে থাকবে ওয়া।
বাহিরের রাজা সব ?

বৎস। একটি রথ,—
 ঠেঁকী রেখো আবার জন্যে।
 বাসবদত্তাকে বুকে নিয়ে ভেঁা আর যুদ্ধ করতে পারব না।

বহুলিকা। বনে হচ্ছে বোগাড় করতে পারব একটা।

বৎস। অবশ্য করো।
 দাকী সব সহজ—
 এক নিকরুণ যুধুর্ভে
 নগর ধারীদের বাহু ভেদ করা,
 তারপর বাহিরে এবং বহু দূরে।
 প্রাসাদে অস্ত্রপত্রে অভাব নেই।

বহুলিকা। সে অস্ত্রপত্র নাথে নাথে আনি ব্যবহার করি।

বৎস। ওসব লুকিয়ে রাখ মাটিতে।
 না, আবার জন্য রখে অপেক্ষা করুক তাজা।

বহুলিকা। এ যুদ্ধে দুটি হাতেরই জোনার দরকার পড়বে।
 বৎসরাত্, আনি চালাব জোনার রথ।

বৎস। পার তুমি?

বহুলিকা। জোনার রাখে দক্ষতর কেউ নেই কোনো।

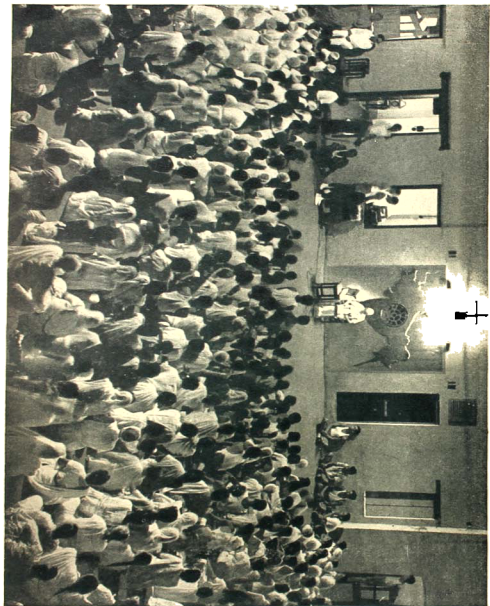
বৎস। আবার রণসন্ধিনী তবে।
 আনাদের মধ্যে আর কথাই প্রয়োজন নেই।

(মহান)

বহুলিকা। কার্ণোদ্ধারের আগে
 জোনার কাছে তার চেয়েও বেশী কিছু হবে আনি।
 পৌজ্য্য করিন বিনিস সহযতন করে তোলে;

সেবতারা যে আসেন অঙ্গলিভরা হাতে ।
 যে অমৃত কথা রাণী কাণে কাণে বললেন আবারে
 তার মৰ্য্যে যদি সভা থাকে
 তবে বিকর্ণের রথ
 তার ভগ্নীকে নিয়ে বলাবে গিরে তার আনন্দে ও রাজসিংহাসনে ।

(ক্রমশঃ)



মায়ের সঙ্গে কথা

[প্রস্তোত্তর]

(১)

“অজ্ঞান মানবের বেদাধারে যে ব্যক্তিগত প্রেম জাগে, বন তার রহস্যের কোনো হৃদয় পায় না, সেই রহস্যের ওহাভর হলো বেহাশ্রিত ভগবান। অনন্ত বেধানে অতীন্দ্রিয় রূপে রূপনয়, আনন্ড তারই নাগাল পেতে পারি আনন্দের এই হৃদয় দিয়ে, হৃদয় থেকে স্কুরিত নির্বল অনুভবগেয় হারা। তারই দিক থেকে আকর্ষণ আসে, আনন্ড সেই আকর্ষণকে বলি বাঁওরিয়ার বাঁশির ডাক, অনন্যাত্মনের অনোষ আহ্বান। ওহা প্রেমের বাঁধনে সেই আনন্দের বাঁধতে পারে, আর আনন্ডও তাকে বাঁধতে পারি। সেই প্রেমের চানে নিরাকার ও সাকার এক হয়ে যায়, ভাব ও রূপ সমান হয়ে পড়ায়। সেই প্রেমের ওহা ভাগিদেই এখানে এই অজ্ঞানতার অন্ধকারে একমন প্রেমাম্বলকে খুঁজে খুঁজে হাতড়ে বেড়াচ্ছে; এই ব্যক্তিগত মানবপ্রেম বহন শেষ পর্যন্ত পর্ববসিত হয় বিশেষ রূপায়িত অনন্ত ভগবানের প্রতি দিব্যপ্রেমে, তখনই আসলে প্রেম হয় চরিতার্থ।”

কঞ্চই হলেন সেই দিবা বাঁওরিয়া, তিনিই বিশেষ বৃত্ত অনন্ত ভগবান, মূল আকর্ষণশক্তি নৃত্ত বিগ্রহ; আর রাধা হলেন ব্যক্তিস্বাভা, ব্যক্তিগত চৈতন্য সত্তা, বাঁওরিয়ার বাঁশির আহ্বানে তিনিই ছোটেন তাঁর অতিপারে। আর জোনকা আবার কাছে গুনতে চেষ্টা সেই রাধা-চেতনার কথা, অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাভার চেতনা কেমন করে ভগবানের ডাকে সাড়া দেয়। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পুস্তকের এই অধ্যায়টিতে সেই কথাই বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন; ওর অর্থ আর কিছুই নয়, ভগবানকে ছেনে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করা ও তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে সর্বত্রই তাঁর উপস্থিতি অনুভব করে সব কিছুতেই আনন্দ-লাভের সম্ভা অর্জন করা। এর বেশী কিছু আমার বলবার নেই; এর চেয়ে আরো ব্যাখ্যা করতে গেলে এই অনুভূতির সবগ্ৰ-ডাকে ধাক্কা করা হবে।

সে এমন অনুভূতি যাতে সব কিছুই রূপায়িত হয় কেবল অমূল্য স্নানিকায়; কারণ তখন কোনো কিছুতেই তুমি বিকৃতি বা অসঙ্গতি দেখতে পাওনা, কারণ তিনিই যে সর্বত্র বিরাজিত, তাঁরই দিবা ইচ্ছা ও তাঁরই স্পন্দ সব কিছুতে দীপ্যমান; প্রত্যেকটি জিনিস, প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি বৃত্তান্ত যেমন ভাবে তার চেদায়া বদনাচ্ছে তাঁরই প্রত্যেক

মুটিনাটির ভিতর দিয়ে আরো বনিতর ও নিবিড়তর ভাবে তুমি সেই ভগবানকেই প্রত্যক্ষ করছ। যা ছিল অপূর্ণতা তা হুচে যাচ্ছে, যা ছিল বনিনতা তা অদৃশ্য হচ্ছে। সকল কিছুতে তাঁরই প্রেমেব দ্যুতি, চতুর্দিকে আলো বিকিরণ করছে তাঁরই উজ্জ্বল উপস্থিতি।

অথবা এমন উচ্চ অনুভূতির অবস্থার যদি অক্ষুণ্ণভাবে নিরন্তর অবস্থান করতে চাও, তাহলে বাহ্যের রাক্ষো অশান্তির আবহাওয়ার মধ্যে নিজেকে যেতে না দেওয়াই সুযুক্তি। হয়তো সেইজন্যই যারা চাইত ঐক্য অবস্থাতে গিয়ে পৌঁছতে, তারা সংসার থেকে সরে যিশুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে প্রকৃতির ভিতর দিয়ে।

মানবজাতির নবন আঘাত দিতে চাই না, কিন্তু এ কথা বনতেই হয় যে ঐক্য সত্যচেতনা আসার পক্ষে মানুষের পরিবেশের মধ্যে থাকার চেয়ে গাছপালা ও ফুলফলের রাক্ষো বা এমন কি পশুদের মধ্যে বাস করাও অনেক ভালো, তাতে ঐ উপনতি সহজে আসতে পারে। কিন্তু সে রাক্ষো সহজ হলেও তাই যে নিত্যন্ত অপরিহার্য এমন কথা নয়। ঐ উপনতিকে যদি পূর্ণ করতে চাও তবে সকলের মধ্যে থেকেই এবং সব কিছুর ভিতর দিয়েই প্রতি মুহূর্তে তা আসা চাই।

সেই প্রবাস ও পুরাণ-কাহিনী অসংখ্য আছে। যেমন প্রজ্ঞাবাদের উপাখ্যান, সেদিন সিনেবাতে অন্নরা যা দেখলান, তাতেও রয়েছে এই কথা। কেবল গল্প শুনে বিশ্বাস করা নয়, প্রত্যক্ষ প্রবাস থেকে আমি নিজেও দেখেছি যে কোনো বাধা, বিপত্তি, বৈরিতা বা অনিষ্টকারীদের মধ্যে বসবাস করেও যদি তুমি সকলের মধ্যেই ভগবান রয়েছেন বলে দেখতে থাকো, তাহলে সকল বিপদই ব্যর্থ হয়ে যাবে, অনিষ্টকারী কিছুই তোমার করতে পারবে না, শত্রু ধাঁড়াবে নিজে হয়ে নতুবা সে সরে যাবে। এ একবারে অস্বাস্ত সত্য।

কিন্তু এখানে একটি বিশেষ দাবী কথা আছে। কোনো কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে যদি ঐক্য চেতনা পেতে আকিরন করো তাহলে তা ব্যর্থ হবে, আপন নিরাপত্তার জন্য বা কোনো বিষয়ের সাহায্যলাভের জন্য যদি তা চাও তাহলে চলেবে না। চাইতে হবে বিনা উদ্দেশ্যে, স্বতঃস্ফূর্ত ও ঐকান্তিক ভাবে, এবং সর্বক্ষেণের জন্য; সেই সাধনাই হবে তোমার স্বাভাবিক জীবনধারা, সহজ গতিতে ও চেষ্টাবেগপূন্য হয়ে—ওরই তাতে ফল পাবে। নতুবা তুমি যদি কাউকে অনুকরণ করতে যাও, কিংবা যদি তোমার মধ্যে এমন আকাঙ্ক্ষা কিছুমাত্র থাকে যে এই কাঙ্ক্ষা অভ্যাস করলে আমি অনেক রকমের ফল পাবো, তাহলে আশানুরূপ ফল কখনই নিলেবে না। তখন হয়তো অজানতা হেতু তুমি বলবে: “নাঃ, যেমন কথা আমি শুনেছিলাম তেমন তো কই কাছে হলোনা।” কিন্তু হয়নি তার কারণ তোমার ঐকান্তিকতার অভাব ছিল কোনোখানে; নতুবা প্রকৃতই যদি ঐকান্তিকতা থাকে আর পূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে অনুভূতি পোষণ করো, তবে জানবে তা সর্বশক্তিসম্পন্ন।

কারণে চোখের দিকে চেয়ে সহজেই যদি সেখানে দেখতে পাও ভগবানের উপস্থিতি, তাহলে কোনো কিছু বশের চিহ্নবাহী সেখান থেকে চলে যাবে, প্রবল কোনো প্রতিরোধ থাকলে

তাও বুঝ হয়ে থাকে; অনীন আনন্দের শিক্ষা জন্মতে থাকবে ভোঁতারও মধ্যে এবং তারও মধ্যে। সে ব্যক্তির মধ্যে যদি কিছুমাত্র অশুভ কামনা থাকে—কীক দিয়ে তা ধরে পড়বে।

★

প্রশ্ন : অনেক রকম অধ্যায়নার্থে আর বিশেষত বৈকল্য রচনাগুলিতে প্রায়ই পোনা হার নানারকম দৃঃখভোগ বিরহবাখা ও অশ্রুপাতের কথা ; রাজা সারাদীঘন কীদলেন, তু ভগবানকে পেলেননা...ভগবান কতই যত্না দিলেন...এ সবের অর্থ কি ?

উত্তর : এগুলি যাত্রাপথের কথা, লক্ষ্যে পৌঁছবার আগেকার কথা। যাত্রা যাত্রা শুরু করেছে তাদেরই যখন হয়, ঐগুলোই তারা চায়, কারণ...তারা চায় তাদের যাত্রাকে আরো দীর্ঘতর করতে ; এগুলো তারা উপভোগ করে, কারণ আগেই বলেছি, জীবনের সঙ্গে যাত্রা জড়িয়ে আছে তাদের কাছে জীবনের স্বৰূপে প্রভৃতি অনুভূতির কিছু আপেক্ষিক মূল্য আছে। ভগবানের সঙ্গে বিদায় আর নান অভিমান করে তারা বুশিই হয়, বিরহের কষ্টকে তারা উপভোগ করে, তাতে সম্পর্কের একটা সাধুর্ষ বাড়়ে। তারা হয়েছে মানবীয় চেতনা দিয়ে, তারই মধ্যে তারা থাকতে চায়।

কিন্তু যখন পূর্ণ একান্তবোধ আসে তখন সব কিছুই নুচে যায়। তবু বোধ হতে থাকে যে ওর থেকে নাট্যরসটুকু বাদ পড়ে গেল। জীবনের কতক আশ্বাস, অর্থাৎ মোহের বিকটা ছুটে গেল। বোধ তিনিমটা কিছু তখনও তাদের থাকা চাই; সোচ্ছাত্তি ধুচেতনার মধ্যে তারা প্রবেশ করতে পারেনা।

বস্তুত বিরহের না অভাবের বেদনাবোধ যদি না চাও তবে নিছকই মধ্যে পূর্ণ একান্ত-বোধ উপলব্ধি করতে হবে ; একবার সেই উপলব্ধি এসে গেলে তখন সকল গল্পই ফুরাবে, বলবার মতো কিছুই থাকবেনা।

সেইজন্যই বলা হয়েছে যে সাত্তা অগং যদি পূর্ণ ভগবৎ একান্ততা উপলব্ধি করে তাহলে স্ফটী বলতে কিছুই থাকেনা। সবই যখন একান্ত হয়ে গেছে, পার্থক্যবোধ কিছুই নেই, এমন উপলব্ধি বিশ্বব্যয় হলে বিশ্বও লোপ পাবে, তখন হবে প্রলয়।

অতএব ওর মধ্যে আনন্দকে বুঁজে পাওয়ার কৌশল হলো বৈত ভান নিয়ে দেওজা-নেওয়ার লীলার মধ্যে থাকা ; বৈকল্য ও বরবিদ্যাপরীরা তাই এই বৈতভাবের আবাসটি বজায় রাখতে চায়। একান্তবোধ এলে তাঁরই সঙ্গে একান্ত হলে, তিনিবোধ আর রইন না।

আগেই একবার বলেছি, একান্ততার আনন্দ হতে ভাবং সকল কিছুর সূত্রপাত, তারপর সনগ্র স্ফটীকর ঘুরে গিয়ে শেষে মিলনের আনন্দে তার সমাপ্তি। এই চক্রে মোহা না থাকলে যখন মিলনের আনন্দ সম্ভবই হয়না ; কেবলই থাকে একান্ততার আনন্দ।

কথাটা হয়তো সূক্ষ্মভাবের হয়ে গেল, কিন্তু প্রবৃত্ত ব্যাপারই তাই ; এই চক্রে ঘুরে

বাওয়ার নিয়মটি করাই হয়েছে ঐ কারণে, যাতে একান্ততা তার পুরোপুরি চরিতার্থতা পায় গিয়ে সেই বিনয়ের আনন্দে।

কিন্তু পূর্ণ একান্ততায় বিনয় নেই, তার অনুভবও নেই; যেখানে একান্ততা পুরোপুরি নেই সেখানেই হতে পারে বিনয়। সম্পূর্ণ বিনয় সম্পূর্ণ একান্ততা নয়।

বাক্যগুলির অর্থ ধরে যা বাখ্যার বুদ্ধিতে এগুলি বুঝতে যেওনা, যা বলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ঠাট্টা স্বভাব অনুভূতির কথা। কিন্তু তার কল একই; কেবল একের মধ্যে যে সম্পদ, অন্যের মধ্যে তা নেই—তা হলো সামগ্রিক অনুভূতির সম্পদ, বিশ্বব্যয় অনুভূতি।

★

প্রশ্ন : বিনয়ের অনুভূতি যদি সচেতনতাই বোলে, তবে বরনিরা সাধকরা কেন সাধারণ জীবনের নতো আবেগের বশে কান্নাকাটি করে ?

উত্তর : হয়তো বিনয় তাদের দিরঙ্গরের হয়না।

★

প্রশ্ন : কিন্তু সাধার আত্মতা তো সম্পূর্ণ ঐকান্তিক।

উত্তর : কি জানো বাপু, আমার বোধ হয় ও সব কেবল স্মৃতি। মানুষের জীবনে বেদন হয়ে থাকে তাই চিত্তগুলি সাধকে নিয়ে ঐভাবে লাফানো।

★

প্রশ্ন : বৈষ্ণব-তর এই উপর প্রতিষ্ঠিত।

উত্তর : প্রাণ-চর্চাতের লোকে তাই পছন্দ করে। কিন্তু তোরাদের পক্ষে সে কথা নয়, কারণ—এখানে পোনো আরো এক প্রশ্ন এসে শাখির হয়েছে, হোতো প্রশ্ন হলোও তার যথেষ্ট গুরুত্ব।

কেউ একজন অতিমানস চেতনাকে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে গিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যা বলাচ্ছে তা খুবই অকপট ও নিষ্ঠুর। সে কি বলাচ্ছে পোনো—

“আমি যখন ধ্যানে বসি, নিবিড় অনুরাগের সঙ্গে আত্মরিকভাবে প্রার্থনা করতে থাকি; আমার আত্মতা থাকে খুবই প্রবল, প্রার্থনা হয় পুরো ভক্তিসুখের; কিন্তু অকপাধিক সবরের মধ্যে আত্মহাটি হয়ে গাঁড়ার মধ্যে মতো গভ্যনুগতিক, প্রার্থনাটি হয়ে গাঁড়ার ওই বৌবিক। এর কি করা যায় ?”

এ প্রশ্নটি শুধু ব্যক্তিগত নয়, এটি পুরোপুরি সর্বজনীন।

আমি অনেকবারই বলেছি(নানা কথার মধ্যে) যে প্রত্যহ যারা ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্যানে বসে থাকার ভান করে, প্রার্থনাদি নিয়েই সারাদিন কাটার, তারা নিশ্চয়ই ওই ভিল ভাগ সবরটা

যত্নের নজর কাজ করে যায়, অর্থাৎ ঐকান্তিকতা জিনিষটি তখন লোপ পায়। মানুষের প্রকৃতিও তেমন নয়, মনের গঠনও তেমন নয়।

পেশীপুষ্টির জন্য যেমন কিছু কসরৎ করতে হয়, ধ্যানে যগার সনয়েরও তেমন কিছু কসরৎ করতে হয়, যাকে বলা যায় “মানসিক একাগ্রতা পুষ্টির” কসরৎ। তেমনই ব্রহ্মনের চোঁটাই করতে হবে, যেমন কবে কোনো ব্যায়াম রত্ন করতে গিয়ে, ভারী জিনিস ত্রোনা অভ্যাস করতে গিয়ে, তবেই ত্রোনার একাগ্রতা কৃত্রিম না থেকে ক্রমে ক্রমে ঐকান্তিক হয়ে আসবে।

প্রাৰ্ধনাকে আগাবার বেলান্তেও সেই কথা : অকস্মাৎ তার একটি অনন্ত শিখা উঠবে ঊৰ্ধ্বমুখী হয়ে, ত্রোনার মধ্যে জেগে উঠবে এক আগ্রহের বেগ, প্রবল এক ব্যাকুলতা আগবে এবং ব্যাক্যের উচ্চারণে তা বেরিয়ে আসবে আপনা হতে, তবেই তা হবে সত্যিকার প্রাৰ্ধনা। সেটি সত্যসরি আসা চাই হৃদয় থেকে বেরিয়ে, হৃদয়ের পূর্ণ অনুভূতি নিয়ে, বহির্কণের মারফতে নয়। এই হবে প্রাৰ্ধনা (যদি মাথার মধ্যে তার কথাগুলোই তিড় করতে থাকে তবে তা আর প্রাৰ্ধনা হলেনা)। এই প্রাৰ্ধনার শিখা জলে উঠবার পরে তুমি যদি সেই আগুনে ইচ্ছন না যোগাও, তবে কিছু পরে সে আগুনটি নিতে হবে।

আর, ষাটানোর পরে পেশীপুষ্টিতে যদি বিশ্রাম না দাও, তার কাছে একটুও ঢিলা না দাও, ত্রাহলে তার সম্প্রসারণশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। অমবরত ষাটান্তে থাকলে কিছুকাল পরে তার ক্রিয়ার জোর থাকেনা, অপরিহার্য নিরবেই তা হ্রাস পায়।

জরুর উদ্বোধন করতে যে অভ্যাস হয়েছে সে অভ্যাসের চেয়ে অনেককণ পর্যন্তই তা ধরে থাকতে পারে। এখানেও সেই কথা : অভ্যাস করলে অনেককণ পর্যন্তই একাগ্রতা বজায় রাখা যায়, কিন্তু বিনা অভ্যাসে তা হয়না। কিন্তু সকলের পক্ষেই এই নিয়ম যে একাগ্রতার পরে একটা সময় আসবে যখন ত্রাতে ঢিলা দিয়ে স্বগিত রাখতে হবে, পরে আবার নতুন করে তা শুরু করতে হবে। অতএব যেমনি সেখানে যে ভিত্তিকার ক্রিয়াটি যত্নবৎ হয়ে পড়ছে, তা মাত্র কয়েক মিনিট পরেই হোক বা কয়েক ঘন্টা পরেই হোক, তখনই জানবে যে ক্রিয়ার অবসন্নতা এসেছে, অতএব ধ্যানের বিখ্যা জান নিয়ে থাকার সবকার নেই : তখন ধ্যান ছেড়ে অপর কোনো প্রয়োজনীয় কাজে নিবৃত্ত হওয়াই ভালো।

মনের পরিশ্রমের ক্রান্তি পূর্ণ করার জন্য যদি কোনো দৈনিক পরিশ্রম করা সম্ভব না হয়, তবে তখন কিছু পড়তে চেষ্টা করবে, কিংবা ত্রোনার মধ্যে যে তার আসছিল সেটি নিখে ফেলতে চেষ্টা করবে। এতেই বেশ বিশ্রাম পেয়ে যাবে। কিন্তু ধ্যানের কাজ কতকণের জন্য হলো এ প্রশ্ন আপেক্ষিক মাত্র ; ত্রাতে কেবল এইটুকুই বোধায় যে কতকণের নজর তুমি অভ্যাস হয়েছে।

অবশ্যা ধ্যানের সময় যথেষ্টই বাড়ানো যায়, তবু তার সীমা একটা থাকবেই ; সীমার শেঁটলেই তা থেমে যাবে। তার পরেও যে তুমি পারলেনা, তা ত্রোনার ঐকান্তিকতার

অভাবে নয়, শক্তির অভাবে। স্বয়ং যখন ধ্যান আসছেন তাখাপি ধ্যানের ভান করছ, কিংবা সাধারণের নতো মন্দিরে বা গির্জায় গিয়ে সকলের নতো প্রার্থনার আভিষর করে তুমিও পজা-পাখির নতো দিনের পর দিন প্রার্থনার কথাগুলো আউড়ে যাচ্ছ, তাই হবে কপটতা, ঐকান্তিকতাবঞ্চিত। তা প্রার্থনাও নয়, বা ধ্যানও নয়, কেবল একটা পেশাদারী। তার কোনো দান নেই।

(২)

প্রশ্ন : দুর্গা ও কালীনাডাকে যে পূজা করা হয়, তার কিছু আধ্যাত্মিক মূল্য আছে ?

উত্তর : তা নির্ভর করে যে পূজক তারই উপর।

যোগের বা পূর্ণ আদর্শ ও পূর্ণ সত্য সেখিক থেকে সেখলে আপন আশ্পূহাকে ভগবানের কোনো একটি বিশেষ আকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা ঠিক হয় না। তবে আধ্যাত্মিক মূল্যের দিক থেকে যদি দেখি, তাহলে পূজা নিবেদন সেখানেই করা হোক, সে পূজা যদি প্রকৃত ঐকান্তিক হয়, সেখানে আরদান যদি পুরোপুরিভাবে হয়ে থাকে, তাহলে তার একই রকম ফল হবে ; কারণ যাকেই তুমি লক্ষ্য ধবে থাকো (এমন কি বিপরীত আদ্যার লক্ষেও) তারই ভিতর দিয়ে তুমি মূল সত্যার গিয়ে পৌঁছবে, এবং ত্রোনার আরোংসর্গের যেনন রাজ্য তেননি ফল পাবে।

তাই বলা হয়ে থাকে যে ভগবানের যে-কোনো অংগকেই ধবে তুমি পূজা করো, কিংবা যে-কোনো ঙ্গকেই তুমি বেছে নাও, ত্রোনার নিজের তরফের নিবেদন যদি সম্পূর্ণ ঝাঁটি এবং ঐকান্তিক হয়, তবে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি নিশ্চয় বিলবে।

কিও পূর্ণযোগের উপলব্ধির জন্য সে কথা নয় ; সে ক্ষেত্রে নিজেকে কোনো কিছুতেই একান্ত সীমাবদ্ধ করা চলবেনা, এমন-কি নিবেদনের রাজ্যতেও নয়। কারণ দুই জিনিস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

আধ্যাত্মিক সিদ্ধি বনতে সাধারণত তখনও বোঝাতো এবং এখনও বোঝায় ভগবানের সঙ্গে নিলিত হওয়া, পরমাযায় বিলীন হওয়া, আপন ব্যক্তিত্ব প্রায় লোপ করে দেওয়া। তা সম্পূর্ণই নির্ভর করে ত্রোনার ঐকান্তিক ও সম্পূর্ণ আত্মদানের উপর, কাকে আরদান করছ তা নিয়ে কোনো কথাই নয়। ত্রোনার নিজের ঐকান্তিক আশ্পূহাই সকল সীমাকে পার করিয়ে পরব্রহ্মে নিয়ে যাবে, কারণ ত্রোনার নিজের মধ্যেই তা আছে।

তুমি ষাইরেই ধোঁজোঁ বা ভিতরেই ধোঁজোঁ, আকারেই ধোঁজোঁ বা নিরাকারেই ধোঁজোঁ আশ্পূহা হওয়া চাই আত্মিক, সংকল্প থাক। চাই অটল, তাহলে নিশ্চয়ই নক্যে পৌঁছবে। কিন্তু শ্রীঅধিবিশ্ব তার পনের সময়ে যে কথা বলেছেন, অর্থাৎ সিদ্ধিলাভের পরে বাধ্য

চেতনাত্তে ও বাহ্য জগতে যির এসে দেখানে রূপান্তর ঘটানো, সে উদ্দেশ্য থাকলে কোনো একটি রাজ্যতে সীমাবদ্ধ থাকা চলবেনা, থাকলে ঐ কাজ ত্রোনার সকল হবেনা।

আলন কথা ভগবানের সঙ্গে বিনন চাই সর্বভোভাবে, তাঁর সকল স্বরূপ ও সকল দিক নিয়ে, তাঁর কাছে পৌঁছবার বত রাজ্য আছে সকল রাজ্যতেই। এবং তা ছাড়াও সকল রাজ্য পার হয়ে ত্রোনার নূতন রাজ্য বের করতে হবে।

অন্তঃস্থ ত্রোনারের পক্ষে প্রথম কাজ হলো নবের মধ্যে হৃদয়ভাবে স্বেনে রাখা (এটি বিশেষ দরকার) যে : পূর্ণযোগ স্বতন্ত্র আর অন্যান্য আধ্যাত্মিক সিদ্ধি স্বতন্ত্র, সেগুলি হতই উচ্চতরের হোক, সারণ আর গতি একটাই সীমাবদ্ধ গভীরতার দিকে।

আশুহার মোর থাকলে ত্রিনি সকল কিছুকেই ভেব করে একেবারে নূন গভীরে চলে যেতে পায়ে ; সবই নির্ভর করে আশুহার তীব্রতা ও ঐকান্তিকতার উপর (অর্থাৎ ত্রোনার আশ্রয়ান কতটা পুরোপুরি হলো তারই উপর)। কোন নক্ষা বস্তুকে তার জন্য নেছে নিলে তাতে কিছু যায় আসেনা, যাকে নিতে বাধ্য হয়েছ তাকে বদেই উত্তীর্ণ হয়ে যাবে।

কিন্তু ওর বদনে যদি চাও সত্যকে ও প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করতে, যদি চাও নূতন জগৎ-স্বর্গের কাছে অংগ্রহণ করতে, তাহলে সেখানে ঐরূপ একমুখী একধারা আশুহা নিয়ে থাকা যথেষ্ট হবেনা। তার জন্য চাই সামগ্রিক আশুহা, সকল কিছুকেই গ্রহণ করতে হবে আপন চেতনার মধ্যে।

এ-কাজ পূর্বেক্ত সাধনার চেয়ে আরো কঠিন বৈকি।

*

প্রশ্ন : মানব-প্রকৃতির ভিতরকার কোন্ বিশেষ দিবা অংশটি নিতাই জাননা করে একটা কিছু প্রতীক, যাকে অবলম্বন করে সে আধ্যাত্মিক তৃপ্তি পায় ?

উত্তর : তা যে আজই পড়ে শোনান *The Synthesis of Yoga* থেকে।

তা হলো সত্যর ভিতরকার সেই অংশ যা কেবল বিগুচ্ছ বিবিজ্ঞানায় নিয়ে খুশি হয় না, জীবনকে যা বাব দিতে চায় না, জীবনের দিকটা এড়াতে চায় না ; সে-অংশ চায় যে সবগ্র-ভাবেই রূপান্তর আহুক, বা অন্ততপক্ষে অভ্যন্তরীণ সাধনার আনার সবত্তটাই সবগ্রভাবে যোগ দিক।

এ প্রয়োজন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকরূপেই রয়েছে—ভিতরে যা বোধ করছে বা কামনা করছে, বাইরে তাকে সার্থক করে তুলবে। আধ্যাত্মিক আয়োপনটির জন্য রাজ্য জীবনের দিকটা এড়াতে চায়, তাদের আমি বলি অস্বাভাবিক ও অপূর্ণ ; প্রকৃতি তাদের মনেই পূর্ণ। কিন্তু তাদের মধ্যে শক্তি ও ত্রেজ আছে, সকল দিক দিয়ে একটা স্বপ্ন ভরসায়া আছে, তারা চাইবে বাস্তবের জীবনে অধ্যায় সিদ্ধি ; মেঘের মধ্যে উড়ে যেতে তারা কখনই

চাইবে না, যেখানে রূপ ও আকৃতির কোনো স্থান নেই। তাত্রা চাইবে বৈহব চেতনা, পরম অনুভূতিতে দেহও যেন স্থান পায়।

এখানে একটা বক্তব্য আছে এই যে কোনো একটা ধর্মকে বেড়ে নিয়ে তারই নিয়মে চলা, বাঁধা অনুশাসনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকা, এটা আসে মানুষের "গোষ্ঠী"-প্রবৃত্তি হতে।

প্রত্যেকের পক্ষে সব চেয়ে সত্যিকার জিনিস হবে ব্যক্তিগত প্রবণতা অনুযায়ী আপন আপন ধর্মপ্রীতি বা সাধনপদ্ধতি খুঁজে ঠিক করে নেওয়া, যার ভিত্তি নিয়ে ভগবানের সঙ্গে বিশিষ্ট ব্যক্তিগত সম্বন্ধটি সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্থাপিত হতে পারবে। প্রত্যেকের পক্ষে সব চেয়ে আদর্শ পন্থা হবে তাই।

অপরপক্ষে তুমি একটি বিশেষ ধর্মের মধ্যে জন্মেছ বলে যদি সেই ধর্মকেই গ্রহণ করো, কিংবা তোমার আপনার মনেও কোনো ধর্ম প্রীকৃত হয়েছেন বলে তুমিও সেই ধর্ম প্রীকৃত নাও, কিংবা বহুজনের সঙ্গে বিনে একযোগে পূজা প্রার্থনা করলে ফল ভালো হয় ভেবে তাই করতে থাকো, তবে তা হবে দুর্বল মনের পরিচয়, অন্ততপক্ষে তাতে তোমার নিজের কোনো বৈদিক্য রইল না।

কিন্তু যদি তুমি নিজের আশুহাকে ও সাধনাকে ব্যক্তর জীবনে মূর্ত করতে, তাই হবে তোমার পক্ষে ন্যায় ও সত্যিকার জিনিস। যার নিম্নেই দুই ভাগে ভাগ করে এক ভাগ দিয়ে সাধারণ জীবনযাত্রা চালাতে থাকে, আর অযোগ্য পেনে বা বেখান হলে তার থেকে সরে অন্য ভাগ দিয়ে উচ্চতর আধ্যাত্মিক আনন্দ বোধে, তাদের চেয়ে তোমার ঐ স্বাক্ষর ঐকান্তিক হবে।

যে চাইবে আপন বাস্তব জীবনকেও সর্বোচ্চ আশুহা হাঁচে গড়ে তুলতে, সে নিশ্চয়ই মনে প্রাণে অনেক গাটি এবং ঐকান্তিক। আর যে নিম্নেই দুটো জিনিসে ভাগ করে নিয়ে বলবে যে বাহ্য জীবনটা যেমন আছে তাই থাক কারণ ওকে আর বদলাবে যায় না, এবং তাতে কোনো লাভই নেই, ভিতরের দিকের কাজটাই হলো আসল, তার সাধনার দান পূর্বোক্ত অনেক চেয়ে অনেক কম।

(৩)

প্রশ্ন : আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে কোন গুণটি থাকে সব চেয়ে বেশী দরকার ?

উত্তর : বহুবার তা মনেছি, আবারও বলছি, শুধু ঐক-জ্ঞ-ক-তা।

এই ঐকান্তিকতা থাকবে পুরোজীবন ও নির্মুক্তভাবে, কারণ শুধু তাই হতে পারে

তোমার ভিতরের অধ্যায় সত্তার প্রকৃত অবলম্বন। ঐটি যদি না থাকে তাহলে প্রধান পদক্ষেপের পরে যেননি বিষ্টাভ্যাস পা বাড়াবে অননি হোঁচট খেয়ে পড়ে নাক ভাঙবে। চারিদিকে ওৎ পেতে রয়েছে অনেক বকবের সত্তা ও শক্তি ও বিরুদ্ধ ইচ্ছা ও কুপ্রভাব, তোমার ঐকান্তিকভাবে সানানা একটু দ্রুত পেনেই তার ফাঁক দিয়ে ঢুকে তোমাকে নিয়ে ছেঁড়াহেঁড়ি শুরু করবে।

হুতরাং কাম আরম্ভ করার আগে এবং চেষ্টা শুরু করার আগে প্রথমেই সেবে নেবে যে তুমি যথাগত সত্যিকার ঐকান্তিক হতে পেরেছ কিনা, যদিও অবশ্য তারপরে সেই চেষ্টাতে উত্তরোত্তর আরো বেশী রত থাকতে হবে।

কেনে রাখবে যে এই মিনিসটাই তোমার একমাত্র সহায়।

★

প্রশ্ন : এই ঐকান্তিকতা গুণের কি সবটুকুও তাতে অনুশীলন হতে পারে ?

উত্তর : নিশ্চয় পারে। আগেকার কালে এক এক আদর্শে দীক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই চেষ্টাই করা হত। এখনও বিশেষ বিশেষ গুণ ও সীমাবদ্ধ সম্প্রদায়ে তাই করা হয়, যাতে তারা একযোগে বিলে সামগ্রিক ঐকান্তিকতার সঙ্গে তাদের কোনো ন্যেকার সাক্ষ্য আনতে চেষ্টা করে, তা বেন ব্যক্তিগত না হয়ে সম্প্রদায়গত হয়।

অবশ্য তাতে স্বাভাবিকতা অনেক বেড়েই যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই সকলে যখন একমুঠে হয় তখন বিশেষ চেষ্টা করতে হয় যাতে সকলে সনান ঐকান্তিক হয় ; একটি গুণকে সকলের মধ্যে সনানভাবে ছাটিয়ে তুলতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। তথাপি তা একেবারে অসম্ভব নয়।

(৪)

সে কথা ভুলবার নয়

একটি সূক্ষ্ম ধরনের প্রশ্ন এসেছে, সূক্ষ্ম হলেও তার গুরুত্ব কম নয়। কেউ একজন জানতে চেয়েছে যে ভগবানকে পাবার ইচ্ছা কি তাতে এমন তীব্র করা যায়, যাতে ভগবৎ নিলন হতেই হবে। আরো সে বলছে যে তার আশুয়া যখন খুব প্রবল হয়ে ওঠে তখন তার মধ্যে থাকে দুটি বিভিন্ন ভাব ; একটিতে আগে তীব্র বেদনা, বেন অসহ্য দৈনিক ব্যর্থতার যজ্ঞ ; আর একটিতে ব্যাকুলতা থাকলেও তার সঙ্গে একটা আনন্দ।

এ অনুভূতি একেবারে নির্ভুল।

এখন প্রশ্ন এই : তীব্র আশুহার কোনটি হয় বেদনাবিশ্রিত আর কোনটি হয় আনন্দবিশ্রিত ?

আনিয়া তোমরা এ সকল অনুভব করছ কিনা, কিন্তু যা বলা হয়েছে তা খুব সত্য ও সরল কথা। আর এ প্রস্তাব উত্তরও খুব সহজ।

আম্মুহার সাথে সাথে যখন চৈতোর ভিতরকার চেতনাটিও খেঁদে উঠেছে, তখনকার তীব্রতা হয়ে দাঁড়ায় অন্যরকম, যেন কোনো অপূর্ণ আনন্দের আশ্বাসে ভিতর বাহির ভরে গেল। সত্যের বাকী সকল অংশে যেন সে আনন্দ ভরাই ছিল। জোনার আম্মুহার বাহ্য বৃত্তার বেরনই হোক, তাকে যেননই বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হোক, আনন্দে কিন্তু সবই ভরে গেছে, বাধাবিপত্তি সবচেয়ে তার নধোই জুবে গেলে।

এটি চৈতোর আগরণের অস্বস্তি লক্ষণ। অর্থাৎ জোনার সেই অন্তর্গত চেতনার সঙ্গে সম্পর্ক ঘটেই ছিল, ঠিক সময়টিতে স্বয়ং চৈতাই বেরিয়ে এসে জোনার আম্মুহাকে দখল করে নিয়ে তাকে আরো আনুকূল্য দিয়ে সার্থক করলে। সেই সার্থকতাই আনন্দে পর্যবসিত হলো।

কিন্তু সেই আনুকূল্য যখন নেই, তখনও আম্মুহা আগতে পারে সত্যের যে-কোনো অংশ থেকে—নয়, প্রাণ, দেহ থেকে, কিংবা তিন দিকেরই নানানরূপ বিশ্রুণে। যে আম্মুহা তীব্র হয়ে ওঠে তা সাধারণত প্রাণের তরফ থেকেই আসে, প্রাণসত্যই তাকে তীব্র করে তোলে; কিন্তু আবার প্রাণই হলো বস্তু কিছু বিপ্লবের স্থান, কাজেই সেখানে আম্মুহার তীব্রতার সঙ্গে বিপরীত জিনিসের তীব্রতার বিরোধ বাধে, সেখানেই হয় বেদনার সৃষ্টি।

কিন্তু তাই বনে সেই আম্মুহাকে নিবৃত্ত করার প্রয়োজন নেই।

বেদনার হেতু কোথায় তাই জানতে হবে, সেই কথাটাই বুঝে দেখতে হবে। তার উপর, জোনার আম্মুহার মধ্যে যদি একটি জিনিস ঢুকিয়ে দাও, অর্থাৎ ভগবৎ কৃপার উপর আস্থা, ভগবান জোনার বেদনার স্রোত সেখানে সে সম্বন্ধে অটল বিশ্বাস, তাহলে তাতেই বেদনা জুড়োবে, তুনি নির্ভয়ে নিঃশব্দে আম্মুহাকে ধরায় রাখবে।

এখানে একটি কথা বলি, ঠিক এই প্রস্তুতি নিয়ে নয়, কিন্তু তার যে জবাব মিলান তারই ব্যাখ্যা হিসাবে। বনতে চাইছি ঐ কৃপা সম্বন্ধে।

ইতিপূর্বে আমি বনেওছি এবং নিঃশব্দে থাকব যে, ভগবানের কৃপার উপর জোনার বড়ই বিশ্বাস ও নির্ভরতা থাক, জীবনের সকল মুহূর্তে তার সুস্থ ক্রিয়াকে লক্ষ্য করার কাজে সক্ষম হতে জোনার থাক, তথাপি তার অভাবমীর্ণ রকমের ব্যাপক ও সুনিশ্চিত ক্রিয়াকে কিছুতেই ধরতে পারবেনা, বুঝতে পারবেনা যে জ. কেনন ভাবে নিঃশব্দে সক্ষম করছে। জা যে কেনন ভাবে অন্তরাল থেকে সবই নিঃশব্দে নিঃশব্দে করছে, অগতির অবস্থানুযায়ী সর্বোপেক্ষা শাস্ত্রভর ও পূর্ণতার ভাবে উপলব্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, জা জানবার সাধ্য জোনার নেই।

কিন্তু যেননি কৃপার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাবে অবনি দেখবে যে তার উপস্থিতি ও ক্রিয়ার মধ্যে এক মুহূর্তেরও ফাঁক নেই, সর্বক্ষণই জা উদ্ভবরূপে প্রতিজ্ঞাত হচ্ছে।

একবার জা দেখতে পেলো সে কথা আর ভুলবার নয়, সর্বোচ্চে উঠে গিয়ে দেখায়

প্রশ্নই সেখানে সেই, তখন আর ভয় ভাবনা কিংবা বেবনা বস্তুর কিছুমাত্র থাকেনা। কৃপার সংস্পর্শ মিলে গেলে তুমি সর্বত্রই তাকে সেববে, স্বীকরণ হবে নির্ভর, আনন্দনয়, নক্তিপূর্ণ।
(মনেকক্ষণ নীরব থেকে)

ভগবানের কাছে সর্বোত্তম সহযোগিতা এই ভাবেই হবে।

(৫)

“...আনাদের ভিতরকার যে নিভৃত চৈতন্যসত্তা, সেই যোক স্বীকরণের সর্বপ্রধান হোতা, তাই হওয়াই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন; কারণ এই সর্বাপেক্ষা গভীরতম সত্তাই সকল ক্রিয়ার মধ্যে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করতে পারে, আরাই সেখানে শক্তির প্রতীকরূপে কাজ করে। আধ্যাত্মিক চেতনা অপরূপ দ্বন্দ্বের মধ্যেও এই সত্তাই শুধু পারে তার সত্যের সৌন্দর্য ও ইকাক্তিকতার দ্বারা অক্ষুণ্ণ রাখতে, তাকে কখনই নিভেজ বা নলিন হতে কিংবা ঝাঁক ভেলিকর ছিনলি হতে দেয়না; সে তার ক্রিয়ার বেগবস্তা ও জাৎপর্ষ বরাবর অস্থান রাখে। আনাদের সত্তার অন্য যে সকল অংশ মন, প্রাণ, মেহচেতনা, সনতই অজ্ঞানতার পুরোপুরি স্বীকরণ, তাই সেগুলি আসল কালের প্রকৃত বহনরূপ হতে পারে না বা অস্বাভাবিক পৰ্যনির্দেশ ও দিতে পারে না। এই সকল অংশের পঞ্জিগুলির লক্ষ্য এবং ক্রিয়া আপন গতানুগতিক ধারাকেই যাকড়ে থাকে, প্রকৃতির যত নিরুক্রিয়াকে সমর্থন করতে থাকে প্রত্যাহার ইচ্ছা দিয়ে, যখন আনাদের কাছে সত্তার উন্ময়ন ও প্রকৃতির বিস্তারের জন্য কোনো উচ্চশক্তির আদান আসে তখন এরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বিস্তার প্রকাশ করে কিংবা জড়তার সাহায্যে বাধা জনায়। আর লাড়া আগলেও অধিকাংশ ঘনবেই তা হয় বিরুদ্ধতার লাড়া কিংবা সানয়িক বা আংশিক সম্মতি; যদিবা সম্মতি দিলে—তা পুরো সচেতন নয় কিন্তু একটা যান্ত্রিক অভ্যাসের বশে—তখন যাও-না আধ্যাত্মিক ক্রিয়া করে তার মধ্যে চুকিয়ে দেয় নিজেদের যত কিছু ক্রটি ও ভ্রান্তি। দেখা যাবে যে আধ্যাত্মিক ও চৈতন্য ভাবের মধ্যেও তারা প্রতি মুহূর্তে আবিষ্কারের সন্ধানের সন্ধান নিয়েছে, এবং যা কিছু শক্তি বা আলো বা আনন্দ মিলছে তাকে কাছে লাগাচ্ছে নিম্নতর উদ্দেশ্য-গুলির চরিতার্থতার জন্য। এমন কি সাধক যখন অবশেষে পরাংপর দিব্যাপ্রবেশ বা বিমুখ-প্রবেশে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তখন সে যদি তার লক্ষ্য চেতনাকে এই স্বীকরণের কেহে নাহিয়ে আসতে চায়, যখন সেখানেও ঐক্য বাধা ও বিকৃতি জনাতে থাকে নিম্নপ্রকৃতির শক্তি। এরা সর্বদাই চাইবে বাণ্য কেনেতে, উচ্চ ভেদকে দখলে দিতে, আর যে উচ্চশক্তি বেনে এনো তাকে নিয়ে স্বার্থপর মন-প্রাণ-মেহের কাষনা ও অহং চরিতার্থতার যত্নে পরিণত করে বীন বাহাদুরি দেখাতে। যে দিব্যাপ্রবেশ আনবে নূতন স্বর্ণ ও নূতন সত্য ও জ্যোতির্ভর নূতন জগৎ, তাকে নিয়ে এরা পুরোনো পৃথিবীর পাকের উপর সোনারি স্নাতো চাপা দেয়, আগেকার স্বাভাবিক বোধ ও প্রাণ বনের কল্পনা ও ভাবাবেগের উপর গোলাপী রং রাখায়। এই সব

নির্যাসকে প্রাধান্য দিলেই উচ্চগতি তার আলো ও আনন্দ নিয়ে অন্তর্ধান করে, তখন আবার ফিরে আসতে হয় নিরন্তরে ; কিংবা সেই সিঁড়ি বিশ্রিত হয়ে মাথপথে আটকে থাকে। কিংবা এমন নিরন্তর উত্থানের নীচে চাপা পড়ে যা আসেই আনন্দই নয়। এই সকল কারণে মূল নির্যাসের সকল স্রষ্টার হেতু এবং উৎস হয়েও পাণ্ডিত্য জীবনে প্রকাশ্যভাবে সক্রিয় নয়। মানুষী প্রকৃতি এই বিচ্ছিন্ন নির্যাসেরকে সহ্য করতে অক্ষম, কারণ তা হলো সব চেয়ে প্রচণ্ড ও প্রদীপ্ত ভগবৎশক্তি ; তারই অতি সান্নাধ্য একটু নিয়ে অনেক বাদ বিশিষ্ট তাকে প্রাণপণে ধর্মানুরাগে পরিণত করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন নিশ্চিত আশ্রয় ও অতীন্দ্রিয়তার জানে একত্রণ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, তার মধ্যে অনেক গোলাপা বঃ বিশিষ্টে যোনাটে প্রাণপূর্বৃত্তিকে তৃপ্ত করা হয়েছে এবং যে নিগূঢ় যজ্ঞাধিশিখা সারা জগৎকে নৃতন রূপ দিতে পারতো, তাকে সইতে না পেয়ে তার বদলে ঐটুকু নিয়ে বহু খাচা হয়েছে। তাই কেবল যদি ঐ পতীরতন চৈতন্যতাকে তার পূর্ণ বীর্ষে প্রকাশ হতে দেওয়া যায় তবে সেই পারবে সকল ধানানন্দ পার করিয়ে যজ্ঞযাত্রা সার্থক করতে ; অনেক ও প্রাণের নিখ্যাভনিকে সে প্রতি নুদুর্ভে ধরিয়ে দেবে, নির্যাসের ও নির্যাসতাকে অনেক প্রাণের দ্বাষ্ট উন্নাদনা থেকে পৃথক করে দেবে। কিন্তু মন প্রাণ ও দেহের মধ্যে যা কিছু সত্য বস্তু থাকবে তাকে বাদ না দিয়ে বঃ সাধী করে নিয়ে তুলে দেবে তার চরম উৎকর্ষে ও নবতর গুচ্ছতায়।”

(“The Synthesis of Yoga,” VI.)

অনেকের নাথার মধ্যে অনেক রকম প্রশ্ন গওগোল পাকায় যা তারা মুখ তুলে বলতে সাহস করে না, সেই সকল প্রশ্নের এই হলো সব চেয়ে জোরালো এবং পুরোপুরি জবাব, এর চেয়ে বড়ো জবাব আর কিছু নেই।

অনেকে শরণ পেয়েও সন্দেহ করে, পথ দেখিয়ে দিলেও তা নিরাপদ বোধ করে না, যেহেতু তারা দেখে যে কেউ কেউ পথ ছেড়ে বিপথে ফলে গেল। তাদের আনিতটুকু নিয়ে তারা ভয়ে কাঁপতে থাকে, কিন্তু এইনাত্য যে কথা জ্ঞানীদের পড়ে পোনালান সেইদিকের কথাটা কেউই একবার ভেবে দেখে না ; অখচ ছোটো বড়ো সকল রকম দুর্গতির ঐ হলো আসল কারণ, অর্থাৎ যারা বিচ্ছিন্ন ও ঐকান্তিক হবার বিষয়ে বিশেষ গ্রাহ্য না করে এই যোগের পথে পা দিতে যাবে তাদের পক্ষে গুরুত্ব দুর্গতি হওয়া খুবই সম্ভব।

বিশুদ্ধ অপরিহার্য, যারা এ কথা মানতে চায় না, কারো শরণ যা কোনো কৃপাই তাদের দ্বকা করতে পারে না।

এর সঙ্গে আরো বলি : ভয় ভিনিসটাই সব চেয়ে ধারণা অসুচ্ছতা, এবং অতি সাহসিক, এটি আসে সরাসরি অদ্বিত্য শক্তির কাছ থেকে, তারা চায় যে পৃথিবীতে ভগবৎ প্রচেষ্টা নিষ্ফল হোক। যারা প্রকৃতিই চাইবে এই যোগ গ্রহণ করতে, তাদের প্রধান কর্তব্য হবে সহিষ্ণুতা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে যথাসাধ্য চেষ্টার দ্বারা চেতনা থেকে ভয়ের চিহ্নমাত্র নিমূল করতে।

এ পথে আসতে বীড়িবত সাহস থাকে চাই। পিছনদিকে চেয়ে কোনোমতেই উর পাওয়া নয়, কারণ তা হবে অতি হীন দুর্বলতার কাজ। ভিতরে থাকা চাই অমনা শৌর্য পূর্ণ ঐকান্তিকতা, অকুণ্ঠ আত্মদান,—কোনো দিগন্তে যাবে না, পাবার মন নিয়ে সেবার কথা ভাববে না, সাহায্য পাবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নিম্নে নৈবেদন করবে না, আর বিশ্বাস করার জন্য প্রার্থনা চাইবে না—এইগুলি এ যোগে নিতান্ত অপরিহার্য, আর এগুলি থাকলে সকল বিপদ হতে নিশ্চিত রক্ষা পাবে।

(৬)

প্রশ্ন : দর্শনের দিনে এখানকার আবহাওয়া বদলার কেন? আর কেনন আচরণ সেদিন করা উচিত? (এ প্রশ্ন করা হয় শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন ১৫ই আগষ্ট তারিখে, সেটিও দর্শনের দিন। প্রতি দর্শন দিবসে ভক্তেরা ও দর্শকেরা একে একে মায়ের সম্মুখে গিয়ে—পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ ও থাকতেন—তাদের প্রত্যেক আশীর্বাদ লাভ করে।)

উত্তর : আবহাওয়া কেন বদলার? এই জোনার প্রশ্ন?

বহু অমানিত ও বিভাতীয় সত্তা এখানে এসে একত্রিত হয়, তারা হয়তো ভালো মনেই আসে, কিন্তু অজ্ঞানতা সঙ্গে এনে তাই চারিদিকে ছড়ায়; তাতেই যার গ্রহণ-প্রবণতা থাকে সে ঐ অজ্ঞানতার চাপে অধির হয়ে ওঠে।

এখানেও যে অজ্ঞানতা নেই তা বলছি না। কিন্তু তার মাত্রা অন্যরকম। আর জ সব্ধেও এখানে চেতনার নিত্য আদানপ্রদান হচ্ছে, দৃশ্য ও অদৃশ্য দুই রকমেই। কেউ চাক কিংবা নাই চাক তার কিছু নিতেই হয়, এবং সনয়বত তা ক্রিয়াও করে।

অল্প লোক যখন আসে তখন এখানকার আবহাওয়া যদিও কিছু বদলায় কিন্তু ততটা কষ্টদায়ক হয় না। কিন্তু বুঝ বেশী জড় হলে অনেক মানুষ একসঙ্গে জোঁতাতে চেতনার মন কিছু সেনে যায়; তখন যদি তুমি নিম্নের মধ্যে সরে না থাকো আর ওর চেউএর উঁচুতে রাখা তুলে না রাখো—তাহলে তো অবিরত আসবেই।

*

প্রশ্ন : তা নয় না, আমি বলছিলাম আনন্দের আবহাওয়ার কথা।

উত্তর : ও, আনন্দের আবহাওয়া অনুভব করো।

সেটা তাহলে ব্যক্তিগত জিনিস, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। তাকে নিম্নের মধ্যেই রেখো।

হয়তো জোনার মধ্যে তখন অনেক স্মৃতি জেগে ওঠে, একরকম ধরনের একাগ্রতা

আসে। আর এও হতে পারে তুমি থাকে আনন্দ বলাহ তা শ্রাবের বুনি, তাই নয় কি ?
তার মধ্যে একটা উত্তেজনার ভাব থাকে নাকি ?

★

প্রশ্ন : আনন্দ মর্শনের পরে তেমন ভাব এসেছিল।

উত্তর : অনেকের অনুবদিন উপস্থিত হলে সেদিনও তাদের গ্রহণ-প্রবণতা বেড়ে যায়, কিংবা হয়তো কোনো ঘটনার কথা স্মরণ হওয়াতে তা বেড়ে যায়, এও বোধ করি সেই ধরনের ছিল।

আগেককার দিনে শ্রীঅরবিন্দ যখন মর্শন দিতে আসতেন, তার আগের থেকে তিনি কিছু শক্তিকে বা উপলব্ধির চেতনাকে কেন্দ্রীভূত করে নিতেন, তাই তিনি সকলকে দান করতেন। সেইজন্য প্রতি মর্শনেই এক ধাপ অগ্রগতি হতো, নতুন কিছু যোগ করা হতো। কিন্তু তখন মর্শকের সংখ্যা খুবই কম থাকতো। তার জন্য ব্যবস্থাও থাকতো তেমন, তাই ছিল আয়োজনের একটা অংশ।

তেমন বিশেষ ভাবের কেন্দ্রীকরণ এখনকার মর্শনে আর হয় না ; বরং তা হয় অন্যায়র অন্যায় দিনের উপলক্ষে। আনন্দের কাল এখন পরাশ্রিত করতে হয়েছে, অগ্রগতির পথে আরো তাড়াহাড়াই পা বাড়িয়ে চলতে হচ্ছে। হয়তো তার সঙ্গে সবার ভালো চলা কঠিন হচ্ছে, কিংবা তা করতে না পেরে অনেকখানি পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে। তেমনাধের হলে হচ্ছে নৃত্যের সেরি করে ফেরান কিংবা বাধ পড়ে গেলান। পরিবর্তন চলছে এমনি ক্রমেবেগেই।

তবে এ কথা দিক যে মর্শনের সময়কার ভিড়ে আত্মস্বরূপ উদ্ভূতি (আশ্রনের দিক থেকে ততটা হয় না। কিন্তু কাল হয় বাইরে ছড়ানোর দিক দিয়ে। এ দিনগুলির ত্র্যম্পর্ষ একটা আলাদা প্রকর ; ভেত্রে হয় আরো বেশী কেন্দ্রবিন্দুর, আরো দূরদূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছানো। কিন্তু চেতনার কেন্দ্রীকরণ হয় কম। বেশী ভিড়ের অস্থিবিধাই তাই, বরাবরই ছিল, কিন্তু এই করেক বছরে আগের চেয়ে আরো বেড়েছে। আগেকার দিনে এত বেশী ভিড় হতোনা, এবং তার প্রকৃতিও ছিল এর চেয়ে একটু স্বতন্ত্র।

তুমি যে আনন্দের কথা বলছ তা হয়তো বুনির চেউ ওঠা কিংবা ঐরূপ চাকলা বুদ্ধির লক্ষণ ; কিন্তু বৃহত্তর উপস্থিতির ফল এমন নয়। হয়তো তেমনাধের গ্রহণ-প্রবণতা বেড়ে যায়, অনেক কিছু তখন গ্রহণ করে ফেল, কিন্তু তবৎ উপস্থিতির হতো গভীরতা নয়, স্বতন্ত্র-পক্ষে আবার তা জানা নেই।

অতএব তেমনাধের আনন্দের কারণ যদি থাকে তা তেমনাধের নিম্নেরই মধ্যে, তাকে ধরে রাখবার কৌশলও তুমি নিজেই খুঁজে নেবে।

★

প্রশ্ন : প্রত্যেক বর্শনদিন উপলক্ষে আপনি প্রতীকবস্ত্র বা বেন তার মধ্যে ভাবপূর্ণ কি থাকে ? এই বেনন আমনই দিলেন একটি ফুলের ছবি, অতিবাসন অভিব্যক্তির প্রতীকবস্ত্র ?

উত্তর : হ্যাঁ, আগেই ভোবাসের বসেছি এর হাডার হাডার কপি কেমন ভাবে অগভীর সর্বত্র ছড়িয়ে বাবে । তা হলো এই প্রতীকের বার্তাটিকে এবং তার যা প্রভাব তাকে অগভীর বহুদূর দূরত্বে পৌঁছে দেওয়ার উপায় । এই বার্তাতে যে কথা বলা হয় তার সত্যটিকে আগের থেকে মেনে বুঝে ও পরীক্ষা করে নেবে নেওয়া হয় । তারপর বর্শনদিনে সেটি বিভ্রম করা হয় । আগে নিজে পরীক্ষা করে নিই তারপর তা সাধারণের মধ্যে প্রচার হতে দিই । ওর প্রথম ক্রিয়া হলো ব্যক্তিগতভাবে পড়ে তোলা, পরে বর্শনদিনে হয় তারই বাহ্য প্রকাশন ।

শ্রীঅরবিন্দ বরাবরই বলেছেন এই দুইরকম ক্রিয়ার প্রয়োজনের কথা ; আগে ব্যক্তিগত গঠনের সাদাঘোষে নিজে পৌঁছাও গিয়ে নকো, তারপরে অগতঃ তার জন্য প্রস্তুত করে তোলা ।

কারণ যদিও ব্যক্তিগত সিদ্ধি সনষ্টগত অবস্থার দ্বারা ব্যাহতও হয় না কিংবা উপকৃতও হয় না, তথাপি দুইএর মধ্যে একটা ভারসাম্য থাকে । ব্যক্তিগত ক্রিয়াটি হয় স্বভাবতই ক্রম ও অভ্যন্তরভেদী, তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া যায় অনেক গভীরে । আর সনষ্টগত ক্রিয়া এক একটা ধাপ নিয়ে ধেনে ধেনে চলে, কিন্তু তার দায়িত্ব বহাল থাকে । এই দুইএর মধ্যে একটা ভারসাম্য রাখতে হয় । তাই ভূমি ব্যক্তিগতভাবে যত তাড়াতাড়ি এগোতে পারবে, ততই তোনাকে চেষ্টা করতে হবে নীচ সানগ্রিক অবস্থাকে বাড়িয়ে উঠতে তুলে ধরতে পারো ।

*

প্রশ্ন : এই নিষ্ঠি ১৫ই আগষ্ট তারিখটির কোনো কি বিশেষ ওহা (বা সাধারণ) গুরুত্ব আছে ? ইতিহাসে জানা যায় যে এই তারিখেই অনেক স্মরণীয় ঘটনা ঘটে গেছে ।

উত্তর : ভূমি সঠিক কোন কথা জানতে চাও ? এ তারিখ হলো শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন । পৃথিবীর জীবনের ইতিহাসে বাস্তবের দিক থেকে এর একটা পরন গুরুত্ব রয়েছে । তা ছাড়া আর কি বলছ ?

*

প্রশ্ন : এই ১৫ই আগষ্ট তারিখে আরো অনেক স্মরণীয় ঘটনার কথা...

উত্তর : ভারতের মুক্তি ? এই তারিখেই ভারত স্বাধীন হয়েছে, সেই কথা । আর পরে আবার বিজ্ঞাসা করবে, কেমন করে সেটা হলো,—নিজে কি সে কথা বুঝে নিতে

পারোনা ? তাও আনাকে বলতে হবে ? শ্রীঅরবিন্দ কি স্বয়ং তাঁর ঐ দিনের বাণীতে (১০ই অগষ্ট, ১৯৪৭) সে কথা বলে সেননি ?

(কিছুক্ষণ নীরব থেকে)

হী, তিনি যা বলেছেন তাই ঠিক কথা ।

আনি আর একটা উপহারনিপি (Greeting Card) পেলান । অনেকই পূজা বা দশবর্ষের উৎসব উপলক্ষে এমনি নানারকর কার্ড পাঠায় । এই কার্ডখানির মধ্যে যা লেখা আছে তা অনেকটা এই ধরনের কথা (ছবয় কথাগুলি আবার স্মরণ নেই, ইংরেজীতে দেখা)—“আনাদের জাতির এই স্মরণীয় দশবর্ষের জন্মদিনে শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন ।” যে লোকটি এই কার্ড পাঠিয়েছে, সে বছরদিন পূর্বে নিম্নে থেকে শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য বলে প্রচায় করেছিল ।

মানুষ তার বোঝানির ফলে যে কতখানি বুটভা করে, এই তার এক নোকন দৃষ্টান্ত । সে যদি বলতো, “শ্রীঅরবিন্দের এই জন্মদিনে আনাদের জাতিরও জন্মদিন,” তাহলে কথাটা খুবই ভালো শোনাতো । কিন্তু এখানে আসলটাকে বাস দিয়ে বলা হয়েছে তার পনের যা ফল তারই কথা ; তাই হবার ছিল, তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে অন্য কিছু হতে পারতনা ।

কিন্তু লোকে এননি তুলই করে থাকে, মূল কারণটাকে বাস দিয়ে তার নৈবিত্তিক ফল-টাকেই বড়ো করে দেবে, তারই বাহানা নিতে থাকে ।

সারা অগষ্টেই তাই, পা দুটো আকাশের দিকে তুলে নাটিতে বাধ্য দিয়ে দাঁটছে । একই বোঝানির কারণে, অন্য কিছু না ।

(কিছুকাল নীরব থেকে বা অন্য প্রসঙ্গে এলেন)

আনার কাছে অনেকগুলি প্রশ্ন এসে জ্ববেছে । আদ্যও পেলান কতকগুলি । এই একটি প্রশ্ন রয়েছে, এতে বিভ্রাঙ্গা করা হয়েছে অগষ্টের সর্বাধিক কঠিন সমস্যা নিয়ে । আদ্য দশম দিনের এই আবহাওয়াতে এমন ধরনের সমস্যার হাত দিতে বাওয়া ঠিক হবে কিনা জানিনা । বিষয়টা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ । এর সমাধানজনক অবস্থা পাওয়া খুবই কান্না, কারণ তার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রশ্নের শেষ দরজার চাবিকাঠি নিলে যেতে পারে ।

বিশ্ব অস্তিত্বের কি উদ্দেশ্য ? তার প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করতে যখনই মানুষ চেষ্টা করেছে তখনই তার ধারণার মধ্যে দুইরকম সম্ভাবনার কথা এসে পড়েছে । ব্যস্ততার দৃষ্টভঙ্গী থেকে এই কথা বলা যায় যে বিশ্ব যখন বর্তমান এবং এইরূপ অবস্থাতেই বর্তমান, তখন সব চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে যেনন আছে সেই ভাবেই একে নেনে নেওয়া ; তাতে খুশি না হও তো একে ভালো করে তোলো । এই নবোন্মেষ যদি নাও, তবে এর পরেই প্রশ্ন হবে, “কেনন করে ভালো করা যায় ?” তাতে আবার এক সমস্যা এসে জুটলো, যার সমাধান প্রশ্ন অসম্ভব বলে মনে হবে ।

এখন, যদি বলি ভগবানের ইচ্ছা—এবং তাঁরই অভিযাত্রি হলো ভগবৎকৃপা—সবই

জুনার কাছ, সেই জুনা সর্বশক্তির ; কোথাও এমন কিছু নেই যার মধ্যে সেই দিবা ইচ্ছা ও তার জুনার কাছ নেই। তাহলে আমাদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত মনোভাব হবে তাই, যে কথা বলা হয়েছে এই ছোট বইখানিতে, যার থেকে প্রতি গুরুনার আনি হোমানের পড়ে পোনাই ("Wu Wei" নামক একটি গল্পের বই, Lao Tser লক্ষনতর অবলম্বনে লিখিত) : এতে বলছে—অচঞ্চল চিত্তে ভগবানের কাছে পুরোপুরি সমর্পিত হয়ে থাকো ; তোনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা আর সেই অনুযায়ী চেষ্টাগুলোকে একেবারে ছেড়ে দিয়ে ভগবৎ ইচ্ছার হাতে নিজেকে উৎসর্গ করে দাও, যাতে তোনার ভিতর দিয়ে তারই ক্রিয়া চলতে থাকে।

অবশ্য কাম্বাট খুব সোজা নয়, শুনতে যেন সহজ কাজে তেমন নয়। কিন্তু ঐকান্তিক ভাবে যদি এই মনোভাবটি নিয়ে থাকো, তাহলে নিজের মধ্যে তখনই পাবে অনাবিল শান্তি, বাইরের জীবনে যদি কেন ঘটুক তার মধ্যেও অব্যাহত থাকবে তোনার অনিশ্চয় আনন্দ।

ব্যক্তিগত যুক্তিভাদের জন্য বসাবর এই উপদেশই বেওয়া হয়েছে ; আর এই স্মৃতিখিত বইখানিতে প্রাজ সাধু এইরূপ সমর্পিত অবস্থার তুলনা করেছেন পাশ্চাত্যের নীল সাগরের সঙ্গে, যার অতলগভ শক্তিশ্রা ভিতর থেকে তাকে পরিচালিত করে, তারই প্রয়োজননত কখনো বা সাগর কঁপে ওঠে আবার কখনো বা নেবে নিখর হয়ে যায়। কিন্তু বস্তুতাত্ত্বিক মানুষের মন তখনই প্রশ্ন করে বসবে, "তা না হয় হলো, কিন্তু সবুয়ে ঝড়ও ওঠে, তুফানও ছোটে, মাঝে মাঝে বন্যার ঢল উষ্মন হয়ে বীপগুলিকে ভুবিবেও দেয়। তাও হয়তো ভগবৎ ইচ্ছার অন্য এক দিক, কিন্তু তখন আর ঐ প্রাজ সাধুর বর্ণিত অনাবিল শান্তির কোনো সম্ভাবনাই থাকেনা। তেমন অবস্থাতেও শান্তি বজায় রাখতে হলে বিশেষ ব্রতনের চেতনা থাকা চাই ; তাহলে নিজেকে ঐ সাগরের সঙ্গে তুলনা করি কেনন করে।" তাহলে আবার এসে ছাঙ্গির হলো সমস্যারই কথা।

শ্রীঅরবিন্দ তার "দিবা জীবন" (Life Divine) গ্রন্থে সকল তথ্যেরই আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, জন্মবিবর্তনের কাজ যে জন্ম এগিয়ে চলেছে তার অস্বস্ত প্রমাণ রয়েছে। জন্মবিবর্তন মানেই কোনো এক নবোদয় দিকে অগ্রগতি, এবং তা যদি উত্তরোত্তর ঘটেতে দেখা যায় তাহলে ধরে নিতে পারি যে সবসময় হচ্ছে ভগবৎ ইচ্ছাতে এবং জুপাতে ; তথাপি বর্তটা হওয়ার কথা ভর্তটা হয়নি। সব কিছুই ঘটছে ভগবানের ইচ্ছাতে, অথচ সব কিছুই এখনও উচিতমতো পুরোপুরি ঘটেনি, এমন অবস্থা ছাড়া আরো অগ্রগতি জিনিসটাই হয়না।

তাহলে আবার সমস্যা।

যে প্রশ্ন আমাকে করা হয়েছে তা এই : "অভিমানের অভিব্যক্তি যখন ঘটে গেছে পৃথিবীতে, তখন জুপা এখানে এবার সর্বশক্তিতেই তার কাজ করবে, এটা স্বাভাবিক ; কিন্তু তাই কি হবে ?

জুপা ভো চিরদিনই তার সর্বশক্তিতে সক্রিয়।

কিন্তু তথাপি আমরা যে নিষেধা তুলনা করে এই দেখতে পাচ্ছি—আমাদের আশঙ্কায় অজ্ঞানতা জনন হুচে থিয়ে তার চেয়ে অধিকতর দ্বিধাচেতনার সৌমতে জানলাও করে আমরা দেখছি যে, আদর্শ জগৎ যেন হওয়া উচিত ছিল, তার চেয়ে এই বর্তমান জগৎ অনেকটাই তবৎ রয়ে গেছে—তা কেন হলো? কৃপা যদি তার সর্বশক্তিতে কাজ করে, তবে জগৎ ততখানিই ভালো হলো না কেন?

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের আদর্শের মাত্রাটা অনেক বাড়িয়ে বলা হয়েছে, বাস্তবের অবস্থার মাত্রার অনুপাতে যেন বলা উচিত তার চেয়ে অনেক বেশী—তাহলেই হয়েছে এই সমস্যা কষ্ট। জ্ঞানরা যে আদর্শের অভিযান্ত্রিক এখনই দেখতে চাইছে তা অনেক পরের কথা, ঠিক পরবর্তী ধাপটি নয়, যদিও হয়ে যাবে তা একদিন; কিন্তু সেই দূর আদর্শের ধূশাটি হোনার চোখে ভাসছে বলেই তুনি বলতে পারছে, “এখন যেন বলছে তার বলনে এমন হলোই তা অনেকটা দ্বিধা প্রকৃতির হবে; কৃপা যদি সর্বশক্তিতে কাজ করে তাহলে এখনই তা হয়ে থাক।” (আমি অবশ্য সমস্যাটিকে সাধারণ মানক-মনের দিক থেকেই দেখতে চেষ্টা করছি, যাতে আমি সেই মনোভাবটি ঠিক বুঝে নিতে পারি।)

কিন্তু সর্বশক্তিময় কৃপা ভিনিসটা কিরূপ? সাধারণ মনোভাবে বলবে যে, পূর্ণ সর্বশক্তিময় আমরা তাকেই বলব যার জোরে—আমরা যেননাট হওয়া চাই কিংবা যেননাট হওয়া ভালো মনে করি, তেননাট এখনই সম্ভব হবে। কিন্তু এ হলো অর্থাচিনের মতো কথা, এ কথা আমি যাদই দিলান, এই নিয়ে কিছুই বললান না। কিন্তু কারো কারো গভীরতর ও উচ্চতর দৃষ্টিশক্তি আছে বলে যদি মনে নিই, তাহলে তাদের ধারণা অনুযায়ী যে আদর্শ জগৎ হওয়া উচিত, তার মধ্যে এখনকার দিনের অনেক কিছু ভগাবৎ ব্যাপার না থাকারই কথা; সমস্যাটি এমন ঠাণ্ডাচুড় যার কোনো বীনা:সা নেই।

এই মননের নতুনাই সাধারণে মানাক্ষ নির্বোধ ও ছেলেনানুধি ভাষাতে করে থাকে; তারা বলে, হয় ভগবৎ-ইচ্ছা ভিনিসটা আমাদের পক্ষে ধারণাতীত (তা আশ্চর্যের কথা নয়) এবং এমনকার এই অবস্থাকে তা অনুমোদন করে থাকলে তাকে বলব অতিত্বনীর ও উৎকট, কিংবা বলব যে ভগবৎকৃপার কোনো ক্ষমতাই নেই।

কিন্তু এখানে আমি আমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি যে এগুলি হলো বিরোধী ভরকের বুদ্ধি, এর ফাঁদে যেন তোমরা পা দিওনা। এমন বুদ্ধির ফাঁদ সেই বিরোধীরাই পাতে, তোমাদের মনকে উত্তেজিত করে বিক্রোহ জাগিয়ে জোনার জন্য; একে খুব সুদক্ষ ফাঁদই বলতে হবে।

কিন্তু কেউ কেউ এমনও আছে যারা ও কথার জবাবে বলবে, “যা কিছু এখানে বিগুণ্ডানো দেখছে, সবই তোমার অজ্ঞানতার চোখ দিয়ে, তাই এমন দেখছে; নিজের ঐ অজ্ঞান চেতনাটিকে আগে বদলাও, ভগবৎ চেতনার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হও, তখন দেখবে সব কিছুইই চেছারা অন্যরকম।”

এটা ঠিকই কথা। এখনই তাই আমি বলছিলাম এবং আবারও বলছি যে অজানতায় বেড়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে যদি ভগবানের সঙ্গে নিজেকে একটুও মিলিয়ে নাও, তাহলে তোমার জীবনটাই এমন আনন্দময় হবে যে সেই আনন্দের প্রভাবে সবই লেখনে অত্যাশ্চর্য, সবই ভালো, সবেরই মধ্যে হচ্ছে কৃপার অভিব্যক্তি। সকল সমস্যার মীমাংসা তোমার কাছে তখন আপনা হতেই হয়ে যাবে, যদি অবশ্য ভেদন অবশ্য বরাবর বলায় রূপান্তর পাঠ্যে যদিও তা সহজ নয়।

অথচ তা সত্য। তবে তাতে তোমাকে জগতের বাইরে গিয়ে পাঁড়তে হবে, জগতের জীবননীলাতে কোনো অংশ নেওয়া থেকে নিবৃত্ত থাকতে হবে; আর ঐ উপায়ে জগতের সব কিছুকে যদি বলে ফেলতে চাও, তাহলে ভেদন পুরোপুরি জগতের আনার পক্ষে শাশ্বত কাণ্ডও হয়েই হবে না।

তাহলে আবার এসে পড়ল সমস্যা। যেমন তাই বাও, যে পথেই মীমাংসা হোঁচো, সমস্যা ঠিকই এসে পড়বে তোমার সামনে।

কিন্তু এর একরকম সমাধান আছে।

এখন শুধু ভাবতে থাকো, অন্য ব্যারে এই নিয়ে কথা হবে। ভাববার চেষ্টা করতে বলছি, কারণ তাতে তোমাদের উপকার হবে। চেতনার মধ্যে এ এক বন্ধনের চিহ্নাংগান, এতেই নিজেই কামের বিরোধিতার ভিত্তি গড়ে; এই সংগ্রামই সকলের মধ্যে (এমন কি জ্ঞানীদের মধ্যেও) বিস্তার এনে দেয় যে আধ্যাত্মিক জীবন মানেই বাস্তবের নিরূপণ, তা ছাড়া মুক্তির কোনো উপায় নেই। “বাস্তবের অগং থেকে পালানি চলো, তাহলেই সমস্যার হাত থেকে মুক্তি”—এই কথাই তাতে বলবে, জীবনকে এড়িয়ে গেলে সমস্যার কোনো প্রশ্নই রইল না।

কিন্তু সমাধান একটা রয়েছে, সে কথা হবে পরে।

পুনঃ—স্রাসের শেষে আশ্রমে ফিরে না বললেন :

মীমাংসাটা কিন্তু বলেই দিয়েছি, না জানিয়ে তা দূরার বলেছি।

*

প্রশ্ন : তার সঙ্গে ১৫ই অগষ্ট তারিখের কোনো সম্বন্ধ আছে কি ? রোমান ক্যাথলিক ধর্মের Assumption উৎসবের দিনও এই ১৫ই অগষ্ট, তার সঙ্গে শ্রীমদবিশ্বের জন্মদিনের কিছু সম্পর্ক আছে কি ?

উত্তর : হাঁ, তিনি নিজেই সে কথা বলেছেন। কুমারী বেরীর আবির্ভাবের মানেই হলো জড়ের দিব্যপ্রাপ্তির সুযোগ। আর এই শেখ অবতারের আবির্ভাবের উদ্দেশ্যও ঠিক তাই।*

* S. A. I. C. E. Bulletin থেকে। অনুবাদক—ঈশ্বরপতি অট্টাচার্য।

যোগসম্বন্ধ-প্রসঙ্গ

অমির্বাণ

[দ্বিতীয় পদ—স্বাধ-জ্ঞানযোগ]

১৩

মনেন্ন বাধা

জ্ঞানযোগের দুটি লক্ষ্যের কথা বলেছি—আয়ত্জান আর ব্রহ্মজ্ঞান। সবার আগে চাই আয়ত্জান। জানতে হবে, দেহ-প্রাণ-মনের নুহতা আর চাকলা আবার স্বরূপ নয়, তাদের ছাপিয়েও আবার গভীরে এক প্রসন্ন-গভীর প্রোচ্ছন্ন বোধের ভূমি আবিষ্কার করা সম্ভব। এই বোধই আত্মবোধ—যা অকারহত, মুখে অবিলম্ব, হৃদয়ে অনুজ্জ্বলিত। তিতিকার পাই তার প্রথম পরিচয় আঘাতে চলি না, ভিতরে ওঠিয়ে গিয়ে স্বকৃত হয়ে বাই। এই স্বকৃত্যের যে অন্তর্ভূত সংবেদ, তা চেতনার গভীরে উদ্ঘাটিত করে এক অসদ নহিনার বোধ। দেখি, ভগ্নং থেকে আনি আরাগ্ন হই গেছি, আনি আনাতেই পর্বাণ।

এই আত্মবোধের পরিপাকের দেখা দেয় ব্রহ্মবোধ। অন্তর্ভূতীয় যো-চেতনা বিবিধ আত্মবোধে সংহত হয়েছিল, তা-ই আবার অনায়াস ব্যাপ্তিচেতনো বিক্ষিপিত হয়। বোধের আকাশে একটি যেন ধ্রুবতারার বিশুদ্ধতা, আরেকটি যেন সেই আকাশেরই প্রত্যাহারল অনেয় বিস্তার। যুগপৎ দুটি বোধই সম্ভব। তখন বলি, ‘অন্যথা ব্রহ্ম।’

বোধের এই প্রথম সনাদার। কিন্তু তারও নাশে আবার উজ্জান-ভাটা আছে। এ-বোধে ভগ্নং থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। প্রথমত প্রাকৃত ভগ্নংবোধের উজ্জানে থিটেই আনরা আয়-ব্রহ্মের বোধকে আবিষ্কার করি। তখন একসময় ভগ্নং নিলুপ্ত হয়ে যায়। বোধের আকাশে সূর্য চন্দ্র তারার ঝিকিঝিকি কিছুই থাকে না। আবার দেখি, সুপুষ্টির নাশে কেনন স্বপ্ন ফোটে, তেমনি অনানোকেয় রিক্ততায় ফোটে ভাবের বর্ণোজ্জল, ভাব পরি-পরিবর্তিত হয় বহুতর স্ফুটিতে। কিন্তু তখনও আকাশ আকাশই থাকে।

আকাশের বুকে আনো, আনোর বুকে বর্ণ-বিতর্ক, তিনটিকে যুগপৎ ধারণা করতে পারলেই পাই বোধের দ্বিতীয় সনাদার। এই সনাদারেই উপলব্ধির পূর্ণতা এবং তা-ই পুরুষোত্তমের স্বরূপ।

সেখতে পাচ্ছি, দেহ-প্রাণ-মন সব ছাপিয়ে নির্বর্ণ আকাশে যে তিনিয়ে বাওয়া, তা-ই উপলব্ধির শেষ নয়, যদিও পরম উপলব্ধির তা অপরিহার্য ভিত্তি। দেহ-প্রাণ-মনের উজ্জানে সচিচাসননের অনুভব নিশ্চয় : কিন্তু সেই অনুভব দিয়ে এদের যদি আবিষ্ট ভারিত এবং রূপান্তরিত করতে না পারি, তাহলে আবার সিদ্ধি অর্ধসিদ্ধি ব্রাহ্মে। পূর্ণসিদ্ধিতে আনি

যেমন বিশ্বাতীত তেননি আমার বিশ্বাসকণ্ড, যেমন আমি দেশ ও কালের অতীত অবাকের আনন্দা তেননি দেশ ও কালে তরঙ্গিত প্রপঞ্চের অকুরন্ত উল্লাসও। আমার ব্যুৎপাদনে সমাধিতে তখন বিশেষ নাই—আমি ব্যুৎপাদনেও সমাধিতে, আমার সমাধিতেও তেজস্বিতার দগ্ধিত এবং ব্যুৎপিত।

অবশ্য এমনিপ্রকার অশুভ অনুভব অভিব্যক্তির জ্বলন্তই সত্ত্ব। কিন্তু মানুষকে সাধনা স্তম্ভ করতে হয় নন দিয়ে। অভিব্যক্তিকে বোধবার পক্ষে নবের কতকগুলি বাধা আছে। এই বাধাগুলিকে ভাব করে চিনে নিয়ে তারপর অভিব্যক্তির প্রসার এবং অভ্যাস-যোগের অনুশীলনের দ্বারা তাদের জয় করতে হবে।

★

মনোময় পুরুষ আর চিন্ময় পুরুষের স্বরূপ আলাদা। প্রাকৃত মানব মনোময় পুরুষ—সেই প্রাণ আর মন নিয়েই সাধারণত তার বস্তু কারবার। আর চিন্ময় পুরুষ দিব্য-বভাব—অনন্ত সত্তা, অনন্ত চিন্ময়, অনন্ত আনন্দ আর অভিব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের অনন্ত সানন্দ্য তাঁর স্বর্গ। দিব্যপুরুষ অনুভবরূপ; আর প্রাকৃত পুরুষ বরষর্গ, যদিও অনুভবের নিপাশা তার আছে। দিব্য পুরুষের চেতনা সবাইকে অড়িয়ে, আমার সবাইকে ছাপিয়ে; আর প্রাকৃত পুরুষের জ্ঞান আশ্রয়ের সম্বন্ধে সঙ্কটিত—পরকে ভড়াতে গিয়ে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ আর অনুমানের উপর ভর দিয়ে হুঁড়িয়ে-হুঁড়িয়ে তাকে চলতে হয়। দিব্য পুরুষের আনন্দ সবাইকে নিয়ে, অশুভ কারও উপর তার নির্ভর নয়; আর প্রাকৃত পুরুষের নিয়ন্ত্রণে কেবল সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব। দিব্যপুরুষের অভিব্যক্তির চেতনার প্রজ্ঞা সত্ত্ব আর সিক্তিতে কোনও ব্যবধান মাই আর প্রাকৃত পুরুষের মানস চেতনার কেবলই জ্ঞানের সোড়াটানি, আর তাইতে সত্ত্বের সানন্দ্যও কুণ্ডিত। দিব্যপুরুষ অধৈর্যে প্রতিষ্ঠিত অতএব স্ববশ; আর প্রাকৃত পুরুষ সংহত বিকীর্ণ অতএব পরবশ। দ্বিটি চেতনার মাঝে যেন এক দূতর ব্যবধান।

সেইদিকে মানুষ তাই চেনে না, চিনতে চায় না, বা চিনতে গিয়েও ফাঁপার পড়ে। সেবত কান্নার নান, অনেক অনেক দুঃখের—এই তার মনের প্রথম সান্দ। তাঁকে পেতে হলে এককালে ভাসতে হবে; আর একবার ভাসলে পরে এককালে ফেরা যাবে না। তাঁকে শূন্য বল, সত্ত্ব বল, আর ঈশ্বরই বল—সবই ওকুলের পরিচয়, এককালের নয়। ওকুলে কেবলই আলো, আর এককালে আলো-ছায়ায় বৈশাখিণী—দুঃখের মাঝে নিল কই?

এই হল মনের মায়া। আর এ-মায়া ‘দুরতম্য’—অধ্যাক্ষ-চেতনার উদ্বুদ্ধে উঠেও এ-মায়ার ঘোর কাটিতে চায় না। দিব্যে আর অদিব্যে একটা ব্যবধানের কল্পনা নিয়েই মন সাধারণত তার সাধনা স্তম্ভ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধনার ভিত্তি হল দুঃখবাদ—আনন্দবাদ নয়। আর এককালে-এককালে ব্যবধানের সংস্কার এসেছে দুঃখবাদ থেকেই। দুঃখবাদী বলেন: এখানে যে দুঃখ আছে একবার কাটান নাই। এই দুঃখের হাত থেকে রেহাই চাই। সার্বকভাবে তা পেতে পারি একবার চেতনার মোড় হুঁড়িয়ে দিয়ে, নিষেধ

গভীরে ডুবিয়ে নিয়ে। তখন এক অবিচল চিন্তানন্দন সত্তার সাক্ষাৎ পাই। যতক্ষণ তার সাথে ডুবে থাকি, ততক্ষণই আমার অস্তিত্বের সার্থকতা। ওখান থেকে ফিরে এনেই আমার সেই সংসার সেই ধানেন্দ্র সেই দুঃখের আবর্ত। হুতরাং শাইই বেবতে পাচ্ছি, ওকুল দিবা আর একুল অদিবা। দুয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন অসম্ভব।

*

অথচ সেতুবন্ধন করতেই হবে। অথও সত্তাকে কেমন অন্যান্যবিরোধে খণ্ডিত করল, সেই মনই আবার অনুভব করে, এ-বিরোধের সমাধান কোথাও আছে। মনও অশেষ-কেই চায়। এখন প্রশ্ন এই অশেষ কি শৈতকে বাদ দিয়ে, না শৈতকে নিয়েই? ব্রহ্ম কি জীৱজগৎের অতীত, না তিনি জীৱজগৎবিনিষ্ট? অশেষের স্বরূপ কি?—তার পর্যবেক্ষণে কি বিনাশে, না সমন্বয়ে?

এ নিয়ে দার্শনিকদের সাথে ঝগড়ার অবশ্য নাই। ঝগড়াটা অবশ্য বনগড়া। মনের স্বভাব হল একটা-কিছুকে একান্ত করে দেখা। তার কাছে যখন জগৎ আছে, তখন ব্রহ্ম নাই; আবার যখন ব্রহ্ম আছেন, তখন জগৎ নাই। তাই অশেষতাবিনায় স্বভাবতই তাঁর বৌদ্ধ পড়ে বিনাশের দিকে।

কিন্তু মনই অশেষতাবিনার একমাত্র সাধন নয়। মনের পরেও আছে বোধি। তার সাথে আছে সমন্বয়ের একটা সহজ দৃষ্টি। এই দৃষ্টি বিনাশ আর সমন্বিতিকে একসঙ্গে দেখতে পার বলে পূর্ণত্বের স্বেচ্ছা সাধন। মনের অশেষ আর বোধির অশেষ—অশেষসাধনার এই দৃষ্টি দিক দিয়েই আয়োচনা করছি পর-পর।

মনশ্চেতনা হল প্রাকৃত জীবনের বনিয়াদ। মনের ভাবনা (thinking) বিকিষ্ট, বেদনা (feeling) দুঃখ-দুঃখে দিপল। জীবনে তাই এত অশান্তি। এই অশান্তির নোক্ষন প্রতিকার হতে পারে, যদি মনকে বেবে ফেলা যায়। বোধী তাই মনের নিরোধের পথ। প্রসূতির বেশে মন বাইরে ছোটে, এখন প্রশ্ন টেনে তাকে অন্তর্নুভব করতে হবে। তার জন্য চাই বিশ্বের বৈরাগ্য, কর্মে অনীহা, ইন্দ্রিয়ের ধাররোধ। এমনি করে বাইরের ব্যাপারকে শাস্ত করে আন্তর ব্যাপারকেও শাস্ত করতে হবে। বুদ্ধিনিরোধের ফলে চিন্তা-শক্তি একাগ্র হবে এবং তাতে নানা অন্তত্পূর্ণ দর্শন ও নিকৃতিরও উদ্দেশ্য হবে। কিন্তু বোধী জানবেন, এগুলিও মনের নায়। তাঁর লক্ষ্য অনবীভাব, কৈবল্য। সমাধির প্রত্যয়ে এসে তাঁর চেতনার আর কিছুই ভালবে না। তখন বন্ধও নাই, জাবও নাই—আছে এক অব্যর্থ শূন্যতা।

কিন্তু ঐ-অব্যর্থ বোধীকণ থাকে যায় না। মাটির চানে বোধীকে আগার নীচে নেবে আসতে হয়। তখন তাঁর মনে হয়, মাটির চান মনেই দেহের চান। যতক্ষণ সেহ আছে, ততক্ষণ পিছতান আছে, হুতরাং বন্ধনেরও সম্ভাবনা আছে। তাই সমাধিতে চাই শুধু মনের নিরোধ নয়—প্রাণেরও নিরোধ, প্রপঞ্চের উপশম শুধু নয়—জীবনেরও উপশম। বিশেষবুদ্ধিই বোধীর পরম পূজ্যার্থ, জীবনবুদ্ধি তাঁর কাছে ঘের।

যোগচেতনার পরন উদ্যানে এই শূন্যতার বোধ। আগেও বলেছি, ঐ-মনুভব নিপাণ নর কিংবা পূর্ণযোগের সাধনাগ উপেক্ষণীয়ও নয়। কিন্তু এ যদি মনের দুঃখগ্রহ বা সাধনার মঠকারিতার পরিণাম হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে পূর্ণযোগীর নালিশ আছে।

প্রথম নালিশ নিরোধবাসের দার্শনিক উপপত্তির বিরুদ্ধে। জীবনের মূলে কেবল দুঃখ, একথা সভ্য নয়। জীবনে বেদন দুঃখ আছে, তেমনি সুখও আছে, আর জীবনের প্রবৃত্তিকা শক্তি সেই-ই। শ্রাণ আর আনন্দ অবিনাশুত। কে-মর্শন আনন্দকে প্রত্যাহ্বান করে, সে একদেশপশী। তাছাড়া দুঃখের উচ্ছেদ করতে গিয়ে চেতনার বিন্যাপ ঘটানোই যদি একমাত্র পথ হয়, তাহলে ব্যাপারটা ঠাঁড়ার নাখা কেটে ফেলে নাগবাখা আরাম করার মত। আর দুঃখকে এত ভয়ই-বা কেন? তার মূল্য কি কেবলই নেতিবাচক? তার কি রূপান্তর ঘটে না? প্রবৃত্ত পৃথক্যের চিত্তে সে কি বীর্য আগায় না? বিপ্রনদের বেদনায় বহা-প্রভুর দিব্যোন্মাদ, পুণিবীর বিন্দু আভিতে সমাক্ষমবুদ্ধের মহাকল্পনা—এ কি মোকোত্তর চেতনার দুঃখেরই বহাৰ্য রূপান্তর নয়?

দ্বিতীয় কথা, অসংস্কৃত বনকে ছোৱ করে নিরুদ্ধ করলেই যে তা পবনচেতনায় সনাপনু (absorbed) হবে, তার কোনও প্রমাণ নাই। প্রাচীন যোগীরা একথা জানতেন। তাঁরা তাই জড়সনাম্বির ফলে প্রকৃতিলয়ের সত্তাবনার কথা বলেছেন। ব্যাপারটা একবকন তানবী যোগনিষ্ঠা। সাধারণ ধূমেও বনোলের হয়ে একধরনের সনাম্বি হয়, কিন্তু তাতে চেতনার কোনও রূপান্তর হয়না—মুনের আগে মানুখ যা ছিল, মুনিয়ে উঠেও তা-ই থাকে। অসং-দত্তির সনাম্বিও এইধরনের। হুইচ্ ভুলে মনের আলো নিবিয়ে দিয়ে সনাম্বি আনা—অভ্যাস-বলে এমনটা সম্ভব হয়। কিন্তু সনাম্বির পর শ্যাবনে কিরে এলে পর দেখা যায়, মানুখটার প্রাকৃত স্বভাবের কোনও বদল হয়নি। তাই প্রজ্ঞাপূৰ্ণক সনাম্বির পরিপাক না হলে তাকে যোগ বলা চলে না। আর হঠের দ্বারা বিদেহ হতে পারলেই যে সাধক ভবচক্রের আবর্তন হতে নিস্তার পাবে—যা নাকি তার লক্ষ্য—তার কোনও প্রমাণ নাই। কেননা কে-অবিদ্যা হতে এই আবর্তনের ফল, একমাত্র বিদ্যাতেই তার নাশ বা রূপান্তর সম্ভব। সাধক সে-পথের দ্বার দিয়েও গেল না। হুভবাং অবিদ্যার সংস্কার তার মধ্যে কায়েনই থেকে গেল। এক্ষেত্রে চক্রাবর্তনের নিবৃত্তি কি করে সম্ভব হবে?

★

মনকে পরবচেতনার দিকে ঠেলে তোলা যেমন যোগের একটি পথ, তেমনি সেই চেতনা-কেই এই মনের মাঝে নানিয়ে আনা হল আরেকটি পথ। এই পথটিই অপেক্ষাকৃত সহজ এবং নিরাপদ।

এক্ষেত্রেও সাধনা শুরু করতে হবে বনকে ধরেই। কিন্তু তাকে ব্যবহার করতে হবে আরেকধরনে। মনের একটা ধর্ম হচ্ছে আয়নার মত—সে শাও থেকে সব-কিছুই প্রতিবিম্বকে নিষেব মাঝে গ্রহণ করতে পারে। আমরা কোনও ছায়াকেই তার বক থেকে

মুহে ফেলতে চায় না, যা আসে তাকেই সে নিবিদানে গ্রহণ করে। সে জানে, ছায়া আসবে আবার চলেও যাবে; সে কাউকেও আঁকড়ে ধাক্কেবে না। সে অনাগস্ত।

এমনিতর চেতনার পারিতোষিক নাম হল সাক্ষিচেতন্য। সাক্ষিচেতন্য। খুব দূর্বত নয়, আনন্দের প্রাকৃত জীবনেও আনন্ড তার দেখা পাই। একটু তাঁর থেকে একনজরে একটু ব্যাপারের সন্দর্ভ পরিধির উপর চোখ বুলিয়ে নিতে পারলে তবে তার একটা সুরাহা সম্ভব—এ অভিজ্ঞতা আনন্দের সবারই আছে। এ হল জীবনে সাক্ষিচেতন্যের সার্থক প্রয়োগ। অবশ্য এ-প্রয়োগ নিজের গরজে—যোগের জন্য নয়।

যোগের জন্য চাই বিজ্ঞ সাক্ষিচেতন্যের অনুশীলন। সাক্ষিচেতন্যকে তখনই বলতে পারি বিজ্ঞ, যখন দৃশ্য থেকে দৃষ্টির বোড় ফিরে যায় ঐশ্বর্য দিকে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক।

আমি নিম্নচাপ হয়ে প্রশান্ত মনে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। আনন্ড মনের আরনার বহিঃপ্রকৃতির ছায়া পড়েছে। চেতনা তখন স্বচ্ছ প্রশান্ত পরিব্রাজ্য এবং প্রসন্ন। এই ননকে আকাশের মতো তুলনা করা যেতে পারে। যে-আমি এমনি করে বাইরের দৃশ্যকে দেখছে, দৃষ্টিকে অত্যাশুত্ব করে যদি তার উপর নিবদ্ধ করা যায়, তাহলে বিজ্ঞ সাক্ষিচেতন্যের অনুভব পাওয়া যাবে। এই অনুভবকে আরও গভীর করে অস্তৃশ্যেরও সাক্ষী হওয়া যায়।

এমনি করে আনন্দের উপরভাগা ছটফটে আবার পিছনে আকাশবৎ প্রশান্ত ও প্রসন্ন একটা আনিকে সহজেই তাগিয়ে তোলা যায়। এই আনির বোধ কোনও ভাবনা নয়, আধারের সর্বত্র ব্যাপ্ত একটা স্বচ্ছ সংবিৎ (awareness)। অত্যাশে এই আনন্ডংবিৎ গাঢ় হলে পর অনুভব হয়, আনন্ড আনিকে ছাপিয়ে রয়েছে এক অনন্ত চিন্ময় মহাকাশ এবং তা তুমারপ্রপাডের মত আনন্ড মূর্খন্যচেতন্যকে অভিজ্ঞ করে আনন্ড নাথ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আনিকে আনিষ্ট এবং ভাবিত করছে। এক সুগভীর শান্তির সম্মগ্ধাণে (radiant bliss) আনন্ড চেতনা তখন নিশ্চল।

এই আবেশের ফলে যোগীর নাথ্যে একধরনের জাগ্রৎ-সন্যাসির আবির্ভাব হয়। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া তখন নিবৃত্ত হয়না বটে, কিন্তু মনের সঙ্গে তার কোনও যোগ থাকে না। বোধ আছে, কিন্তু মন নাই, মনের কোনও কর্তৃত্ব নাই, সবই চলছে মেন বয়েস মত—যোগীর তখন এই এক অনির্বচনীয় অবস্থা।

কিন্তু পূর্ণযোগের সাধকের কাছে 'এতো বাহ্য'। মনের প্রশ্নই (quiescence) তাঁর অতীষ্ট নয়, তিনি জান তার উদ্দীপন, অভিমানেসের আবেশে তার নাথ্যে নানসোত্তর ত্রুটি-সমূহের ক্ষুদ্রণ। মনের বিনাশ তিনি জান না, চান তার দিব্য রূপান্তর।

★

একবার উর্ধ্বেচেতনার আবেশেই রূপান্তর সিদ্ধ হতে পারে। বনোহি, উর্ধ্বেচেতন্যকে অবিগত করবার দুটি পথ : এক তার দিকে উন্মিষে যাওয়া, আরেক তাকে এখানে রাখিয়ে আনা। উন্মিষে গিয়ে আবার তাকিয়ে এলে পর চেতনা ঝানকটা আনিষ্ট হয়েই ফিরে

আসে—যদি না আনন্দের দ্বারের পথ ধরি। আবেশ এবং রূপান্তর অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, যদি উর্ধ্বচেতনার কাছে নিজেদের বেলে ধরে এখানেই তাকে নানিয়ে আনতে পারি।

কিন্তু এখানেও মনের বাধা সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। অণুও সং-চিন্তা-আনন্দের বোধই আমাদের লক্ষ্য। সে-বোধ একটি নিত্যের অথচ সর্বতোমুখ একরস প্রত্যয়—আমাদের সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনবোধেরই মত। কিন্তু অধঃক্ষে পতিত করা হল মনের স্বভাব। তাই সে কখনও বৌদ্ধ সেবে বুদ্ধের স্বেচ্ছাভাবের প্রতি, কখনও-বা চিদ্রস্বভাবের প্রতি, কখনও-বা আনন্দস্বভাবের প্রতি। যদি নোকোত্তরপন্থী (transcendence of cosmic existence) সাধনার লক্ষ্য হয়, তাহলে এর যে-কোনও একটি বিভাবকে ধরে চেতনাকে উজানে ঠেলে দেওয়া যায়। তার ফলে যদি চেতনার প্রলয় না ঘটে, তাহলে উর্ধ্বতন বিভাবের আবেশকে এখানে নানিয়েও থানা যায়। কিন্তু তাতে গতিচলনশেষের উপলব্ধি অর্থও এবং বিশুতোমুখ হয়না।

পূর্ণযোগের সাধক চান পূর্ণবুদ্ধকে—তার বিশেষ কোনও একটি বিভাবকেই নয়। তাই গোড়া হতেই তার চেতনাকে মনের একশেষদণ্ডিতার সংস্কার হতে মুক্ত রাখতে হবে। এইটুকু জানতে হবে, মনই চেতনার স্বেচ্ছাভাব নয়। মনের পিছনেই রয়েছে বোধি। মনের ধর্ম যেন কোনও-কিছুকে বাইরে রেখে আনন্দের চেষ্টা করা, তেননি এই বোধির ধর্ম হচ্ছেই হয়ে মানা। মন দিয়ে ‘জানি’—তা আভাস মাত্র। আর বোধে ‘হই’—তা হল বিজ্ঞান উদ্ভাস। যেনন মনের আয়নার আকাশের প্রতিবিম্বনে সাক্ষিচেতন্যের উদ্ভাস। এটি বিজ্ঞান বোধের রূপ। তাহলে আকাশকে জানিনা শুধু, আকাশ হই।

অষ্টমোপনিষদের তিনটি ধাপের কথা অন্যত্র বলেছি। প্রথম ধাপ হল বুদ্ধের মাঝে সর্ব-কিছুকে দেখা। বুদ্ধ তখন অবিষ্ঠান। দ্বিতীয় ধাপে সর্ব-কিছুর মাঝে বুদ্ধকে দেখা। বুদ্ধ তখন অন্তর্ধানী। এই দুটি দর্শনই হল এক আর বহুর মাঝে আপাতবোধের সমন্বয়। প্রাক্তনমনের মাঝে এই বিরোধের সংস্কার এতই পাকা যে অনুভবের উদ্ভূত ভূমিতেও তার জের চলে, বার ফলে বহুকে লুপ্ত না করে দিয়ে একের অনুভব সম্ভব হয়না। উপরি-উক্ত দুটি দর্শনে ভেদের সংস্কার অনেকটা শিথিল হয়ে গেলেও একেবারে নিশ্চিন্ত হয়না। অবিষ্ঠান আর অন্তর্ধানীকে মনে হয় যেন প্রপঞ্চ হতে কণ্ঠস্থ বিবিধ একটা-কিছু। এই হল মানস সংস্কারের শেষ বাধা। কিন্তু উর্ধ্বচেতন্যের আবেশের ফলে অবশেষে তাগ্রহণেই ভেদসংস্কার-হীন বিজ্ঞান অষ্টমোপনিষদের আবির্ভাব হয়। তখন বোধ হয়—এই সর্ব-কিছুই বুদ্ধ। যেনন সে-প্রাণ-মনের বিচিত্র অনুভব ও ক্রিয়ার অভিন্ন সমাহরণে (integration) আবার অভিন্নের এক অর্থও বোধ—এও তেননি।

আর একোষ আবেশের ফল। তার বোধে আবার বোধ—এই তার রূপ।

[ক্রম]

লেকঁৎ দ্য লীলের একটি কবিতা

ত্রিগমীরকান্ত গুপ্ত

লেকঁৎ দ্য লী লন ফ্রান্সবান রেইউনিয়ঁ (Réunion), ফ্রান্সবান ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ।
উনিশ বছর বয়সে তিনি আইন পড়তে যান ব্রেতাঁএ (Brétagne)। কিংবা বলতে পারা
যায় আইন পড়তে পাঠান হয়েছিল তাঁকে : কারণ, এ-ব্যবসাতে তাঁর অগ্রসরের কোনো ভাগি
ছিলনা। পাঁচ বছর পরে আইনজীবীর তকমা নিয়ে এসে বসলেন রেইউনিয়ঁ-তে। ভাগ্য-
ভাগে এমনি সবয়ে ফরাসীর নাজিকেন্দ্র থেকে প্রকাশিত এবং ফুরিয়ে-প্রতিষ্ঠিত একখানি
পত্রিকায় নিখবার জন্য তাঁর কাছে নিবন্ধণ আসে। Fourier-প্রতিষ্ঠিত ফুরিয়েরিষ্ট দলটি
সমাজতত্ত্ববাদের একটি আদি ও শিষ্ঠ রূপ। দ্য লীল প্রাণ বুলে সাহিত্য-সাহসনীতির বশী-
বুদ্ধ চানোতে লাগলেন। প্রতিকারি পত্র-তুণীর থেকে অল্পশ্রু শরবৃষ্টি হন পুরাতনের উপর।
দব আদর্শের উদ্দেশ্যে বসিত হন উচ্ছৃঙ্খলিত আলাপ। তারপর সেখা দিন ১৮৫১র রাষ্ট্র-
বিপ্লব (Coup d'Etat)। নুই নেপোলিয়নের হাতে (Napoleon III) প্রজাতন্ত্রের
আকস্মিক ভয়াব্রু প্রত্যাক করে ফ্লুবের্গার (Flaubert), তেই (Taine) এবং রেনোঁর
(Rénan) নতো শেষে তিনিও আপাতদের পরে উৎসাহবাদের পণ ত্যাগ করে নিরাশাবাদী
হয়ে উঠলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ Poèmes Antiques (প্রথম কবিতা) ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে,
এবং তখন Poèmes Barbares (বর্ষক কবিতা) ১৮৬২, Les Poèmes Tragiques
(করুণ কাব্য) ১৮৮৬, ও Derniers Poèmes (শেষ কাব্য) প্রকাশিত হয় তার
মৃত্যুর এক বছর পরে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে। তিনি ফরাসী আকাদেমি অনঙ্গত করেন ১৮৮৬
সালে ভিক্তর হুগোর স্থলে নির্বাচিত হয়ে।

দ্য লীল প্রাচীন খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে অধ্যয়ন করেছিলেন, নানা বিদেশী যুরোপীয় ভাষায়
ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন, বদেশের ও পরদেশের নানা কাহিনীর অবতারণায় রসনা তৃপ্ত
করেছিলেন, প্রাচ্যভারতের (Indes) সমভেদ ও সমর্দ নিসর্গদৃশ্যের অন্ধান বহনে বেশে
ছিলেন। তিনি আবার পরিচিত উনবিংশ শতাব্দীর পার্দাসী বলে—পার্দাসী গোষ্ঠির
(Les Parnassiens) অন্য দিকপালয় হলেন স্থানি প্রুধোম (Sully Prudhomme),
ফ্রাঁসোয়্য কপে (François Coppée) এবং জোসে মারিঅ দ্য হেরেদিয়া (José Maria
de Hérédia)। এদের পার্দাসী বলা হয় কারণ এদের সংকলন কবিতার গুচ্ছ (১৮৫৬ খৃঃ)
প্রকাশ করেন ল্যামেয়ার (Lemerre) 'সকল্যায়নরিক পার্দাস'—Parnasse Contemporain—নাম দিয়ে। (আনাদের হিবালয়, গ্রীকের অলিম্পাস আর বলিতবিদ্যার
নয়াট সেবী অধ্যুষিত পার্দাসাস)। পার্দাসী কাব্যানুজের দুটি বুলবল : একটি, কবিতা হবে

ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বা কবি-নিরপেক্ষ ; অন্যটি, কবি হলেন প্রথমত রূপকার, যদ্যপি কিম্বা আদিক তাঁর হাতে হয়ে ওঠে যেন নির্ণেয় নিচোন। সূত্র হিসাবে সূত্র ক'টি অভিনব নয়, তবে ফরাসী কাল্যের পক্ষে যুগান্তকারী—হাল্কা উপন্যাসে এবং অন্যথ উচ্চান রোমান্টিক কাব্যের পরে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে এর আবির্ভাব প্রয়োজন এবং প্রায় অপরিহার্য। রোমান্টিকের ধারাকে যেখানে বোদেলেরয়ার নিয়ে খিঁচিয়েছিলেন— সে একটা ধারার ও ধরণের চরমোৎকর্ষ, ও ধারায় ওকে আর ছাড়িয়ে যাওয়া যায় না, ওর পরে নির্বাণ। পাদাসীরা ফরাসী কাব্যের প্রোডকে এই সত্তাবনা থেকে অবস্থাত্ম্যর পথে ফিরিয়ে নিয়ে এস।

এবার যে কবিতাটি শোনাতে চাই তার বাংলা ভর্জনা এই

নাথবীলতা আর হুগুছি বকুলের মুকুট মাথায় পরে'
প্রগল্ভ নায়পরীরা ভূগান্তরপের উপর নেচে বেড়াচ্ছে।

কন্য হরিণীদের চিত্রাভাস্ত্র অরণ্যপথের উপর দিয়ে
কালো ষোড়ায় চড়ে এল এক ষোড়সওয়াস ।
অন্ধকার রাতে ঝকঝক করছে তার সোনার সেকান ;
চাঁদের ফিরণেরথা এক একটি পাখি হবার সবরে হঠাৎ আলোর খলকানিতে
প্রদীপ্ত হয়ে উঠছে মাথায় তার রক্ত-কিরীট ।

নাথবীলতা আর হুগুছি বকুলের মুকুট মাথায় পরে'
প্রগল্ভ নায়পরীরা ভূগান্তরপের উপর নেচে বেড়াচ্ছে ।

Couronnés de thym et de marjolaine,
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine.

Du sentier des bois aux daims familier,
Sur un noir cheval, sort un chevalier.
Son éperon d'or brille en la nuit brune;
Et, quand il traverse un rayon de lune,
On voit resplendir, d'un reflet changeant,
Sur sa chevelure un casque d'argent.

Couronnés de thym et de marjolaine,
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine.

নন্দোপন তনু ডায়া সকলে তাকে ঘিরে ধরল
নিঃশব্দ শূন্য ঘূর্ণিত্য করিতে নাগল বেন।
“এই ধীর রত্ননীতে এত দেবী করে,
হে ধীর অশ্রুবাহী, কোথায় চলেছ ?” শুধলেন তপসী রাণী।
“এ অরণো কত অদেহী শরু দানা,
তার চেয়ে এস, নয়নাভিরাম শ্যামল অঙ্গনে আনরা নাচি।”

নাথবীনতা আর হৃগছি বকুলের মুকুট বাধার পরে’
প্রগল্ভ বাতাপরীরা তৃণাক্তরণের উপর নেচে বেড়াচ্ছে।

“না, আবার বচছ ও নধুনয়নী বাগদত্তা আবার ডাকছে,
কাল আনাদের হবে পরিণয়।
পথ ছাড়, অরণ্যচারী বাতাপরীরা,
হোমনা যারা পুষ্টিত তৃণদল নেচে নেচে বসিত করছ ;
আবার প্রিয়াসঙ্গনে আর বিলম্ব ঘটিও না,
ওই দেখছ না ফুটে উঠছে দিনের আলো।”

Ils l'entourent tous d'un essaim léger
Qui dans l'air muet semble voltiger.
—Hardi chevalier, par la nuit sereine,
Où vas-tu si tard ? dit la jeune Reine.
De mauvais esprits hantent les forêts;
Viens danser plutôt sur les gazons frais.—

Couronnés de thym et de marjolaine,
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine.

—Non ! ma fiancée aux yeux clairs et doux
M'attend, et demain nous serons époux.
Laissez-moi passer, Elfes des prairies,
Qui foulez en rond les mousses fleuries;
Ne m'attardez pas loin de mon amour,
Car voici déjà les lueurs du jour.—

নাথবীনতা আর স্বগন্ধি বকুলের নুকুট নাথায় পরে
প্রগল্ভ নাগাপরীয়া ভূগাত্তরপের উপর নেচে বেড়াচ্ছে।

“গোন, অশুরগোহী, হোনার দেব সোনার বলয়
আর যাদুকরের নীলা পাখর,
আর দেব ধন ও মানের চেয়ে মহার্ঘ জিনিষ—
চাঁদের আলোর মতোয় বোনা আমার এই অঙ্গবাস।”
“না। দূর হও।” বলল সে। রাণী অবনি তার স্বপ্ন অতুলি দিয়ে
নিহরিত মোছার বুকে স্পর্শ করবেন।

নাথবীনতা আর স্বগন্ধি বকুলের নুকুট নাথায় প’রে
প্রগল্ভ নাগাপরীয়া ভূগাত্তরপের উপর নেচে বেড়াচ্ছে।

পলাক্শ-স্রাঙিত হয়ে ছুটল কালো ষোড়া।
ছুটল, লাফে লাফে এগিয়ে চলল সে অবিলম্বে;
কিন্তু আরোহী শিউরে উঠছে আর নুয়ে পড়ছে;
সে দেখতে পেল রাজা দিয়ে এক শ্বেত নৃতি

Couronnés de thym et de marjolaine,
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine.

—Reste, chevalier. Je te donnerai
L’opale magique et l’anneau doré,
Et, ce qui vaut mieux que gloire et fortune,
Ma robe filée au clair de la lune.
—Non ! dit-il. —Va donc ! — Et de son doigt blanc
Elle touche au cœur le guerrier tremblant.

Couronnés de thym et de marjolaine,
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine.

Et sous l’éperon le noir cheval part.
Il court, il bondit et va sans retard;
Mais le chevalier frissonne et se penche;
Il voit sur la route une forme blanche

নিঃশব্দে ধেঁটে আসছে তার বিকে দুই হাত বাড়িয়ে :
“নাগাবিনী, কুচকিনী, রাকসী, পথ ছাড় আমায়।”

নাগবানহা আর হুগছি বকুলের মুকুট নাখায় প'রে
প্রগল্ভ নাগাপরীয়া তৃণাস্তরণের উপর নেচে বেড়াচ্ছে।

“পথ ছাড়, বীভৎশ নাগাবিনী।
মধুনাকী প্রিয়র সঙ্গে পরিণয়ে চলেছি আমি।”
“ওগো, প্রিয় স্বামী আমার, অনন্ত সখাধি
হবে মানসের বাগর-শয্যা,” বলল সে,
“আনি বুড়ার হাতে।” আর তাকে অনন দেখে সেও
প্রেমে আর বেদনায় চলে পড়ল মরণের কোলে।

নাগবানহা আর হুগছি বকুলের মুকুট নাখায় প'রে
প্রগল্ভ নাগাপরীয়া তৃণাস্তরণের উপর নেচে বেড়াচ্ছে।

Qui marche sans bruit et lui tend les bras :
—Elfe, esprit, démon, ne m'arrête pas !—

Couronnés de thym et de marjolaine,
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine.

—Ne m'arrête pas, fantôme odieux !
Je vais épouser ma belle aux doux yeux.
—O mon cher époux, la tombe éternelle
Sera notre lit de nocce, dit-elle.
Je suis morte !— Et lui, la voyant ainsi,
D'angoisse et d'amour tombe mort aussi.

Couronnés de thym et de marjolaine,
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine.

কবিতাটিতে ছয়টি শব্দক এবং একই ধূম (Refrain) সাতবার উচ্চারিত—তবে তাদের পরিবর্তনে নিশ্চয় পরিবর্তিত হবে। ছয়টি শব্দক হলো এ র ঠাণ্ডা দুট প্রাণ একখানি পক্ষী রাগিক নাটকের মতোই। প্রথম শব্দকে ধূমপটের বর্ণনা, সেটি; ধরে দেওয়া। তার মধ্যে তিনটি বর্ণের প্রাধান্য—শাধা, স্বকনকে রূপ আর স্বননে চক্রিয়ার শাধা, বিশবিশে কানো, আর একই সোনালী চিত্র দুটি বেকাবে। রূপালী আভা আর চক্রালোক দিয়েছে একটা হালুকা ইথরীয় পরিবেশ, সুকৃ জালে বেরা আবহাওয়া, কানো গাতি আর কানো ছোড়া সেই ভবভাক প্রবল করে তুলেছে। হরিণের স্বীকৃতি আর অশুর বেগ তার মধ্যে সফল করেছে আপত্তার বিদ্যুৎ। দ্বিতীয় শব্দকে ভেগেছে একটা কৌতুহল। কে এই অশুরোহী? কোন লক্ষ্যে তার যাত্রা? ভাবের গঠন ও গতি সেনে এটুটি শব্দকে একত্রে ধরা যায়। দ্বিতীয় শব্দকে পরীক্ষা তাকে নৃত্যোৎসবে ডেকেছে। সে নিবন্ধন সমুদিত অশুরোহী দিন ফিরিয়ে—তার যে আত্ম অভিজ্ঞার-গতি। অচল পরীক্ষা বেন নাছোড়বান্দা। তাদের উৎকোচ উপলোকনের মোতদীয় ফিবিতি নিয়ে এগিয়ে এল তারা। বীর শব্দক অটল—সাঁড়াল কিন্তু কঠিন কাণ্ডে প্রত্যাখ্যান করল এসব। আর প্রতিহিংসার পরীক্ষণী অমনি কি জানি স্বী যাদুর অতুল দিয়ে স্পর্শ করল নবজীবনপ্রদায়ী বক্ষ। (এখানেই কি লুকানো ছিল তার প্রিয়ান প্রাণ?) পক্ষন শব্দকে ছুটে চলেছে অশুরোহী, তাকে ঘিরে ধরেছে উত্তরের হাওয়া। কান অপরীক্ষী রূপ সাননে লেখতে পেল সে হঠাৎ? শেষ শব্দকে নৃত্যর কোনে লুটিয়ে পড়েছে অভিবাত্রী। পরীক্ষা একটা বস্তুর মতো সাতবার ধূমটি পেয়েছে, শেষের বসনিকা ও তাকা চানল ওটি দিয়ে।

কাহিনীকার শৃঙ্খলায় পলিটিভিটি হয়েও কাহিনীটির শৃঙ্খলিত ব্যাখ্যা কিছু দিতে পারেননি, বাস্তববাদী হিসাবে তিনি তথ্যটি দিয়েছেন শুধু—একটি সত্যাবল্যপূর্ণ ভাবনের চরম ব্যর্থতা। অপরপক্ষে কাহিনীর পরিবেশ জনকানো পোমানটিক—স্মিটন কবির "টাম ও শ্যান্টারের" (Tam O'Shanter) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কবির অশ্রুতির অন্তরালেও একটা আবেগোন্মত্ত রোমানটিক স্পর্শকাতরতা রয়েছে—পূর্বসূরীদের কবিতোত্তমার ঋণিকতা—তার অবচেতনায় ছিল, তাই বেন দেখা দিয়েছে। তবে সবচেয়ে তিনি বেধে ধরেছেন শিল্পসংঘের বন্ধনে, কথা যা মিল কোথাও সাম্রাজ্যিক হরণি। একখানি ল্যাঙলুকেপের সঙ্গে কবিতাটির তুলনা করতে ইচ্ছা হয়—এবং ফর্মের হারননি সমগ্রের মধ্যে বিষয়ের অন্তরালকে তুলে দেখিয়েছে।

এই কাহিনীর গভীরতম লক্ষ্য তবে কিছু আছে? বোধহয় একটা অনন্য নাম করা বেত্তে পারে। দ্য লীন কিছুকাল ছিলেন এনিয়াথের ফরাসী সংশ্লিষ্ট প্রাচ্যভারতে, প্রাচ্যের স্বপ্নকথা কালক্রমে ধূমপ্রভাবে রোমানটিকের পোখাকে আবৃত ও আবৃত হলেও এখানে ওখানে গভীরতর প্রাচীনতর নিগটিক একটা অর্ধের ও সত্যের নুতি হঠাৎ কিছু বুনে ধরেছে। অতীতবৈবী বীরপুরুষের বা অভিবাত্রী সত্যের বুদ্ধিকে বর্ষ নিয়ে ঢেকে রেখেছে রূপালী শিরশ্রাণ

কিন্তু তার প্রাণশক্তির বাহন হন কালো ষোড়শা কিম্বা আবিল প্রেরণা—তাই লক্ষ্য তার আনন্দের প্রতি থাকেনও নব্যপথে ক্ষোভুলনের বশে ধানতে হয়েছে ডাকে, এমন কি শেষে একটা বিপর্যয়ের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়েছে। হরত কাব্য হিসাবে ভৌতিক আধ্যাত্ম ও গোবান্টিক ট্রাজিক অর্থই যথেষ্ট, তবে ভৌতিকের অন্তরালে প্রতীকী অর্থ যদি একটু থাকে তাতে অধিকন্তু ন সোম্যায় বলা চলতে পারে।

সাধনার পথে চলতে হলে তোমার বহুকার দুর্জয় চুঃসাহস, কখন নিজেই দিকে দিকে পাড়াবে না, তবে—এই যে বুদ্ধিটির মত হীন তুচ্ছ দুর্বল সূক্ষ্মিত আর কিছু নাই।

অন্য সাধন, পরিপূর্ণ আত্মরিকতা, অংশ আত্মদান—এতখানি যে তুমি কখন হিসাব কর না, বহনকর কর না, তুমি যাও না এই হেবে যে কিয়ে পায়ে, তুমি নিজেই উৎসর্গ কর না এই হেবে যে হুঃকিত থাকতে পায়ে, এমন বিশ্বাস রাখবে না যা নির্ভর করে প্রমাণের উপর। পথে চলতে হলে ত্রিক এই সবই অপরিহার্য—সকল বিশেষে এতাই তুমি তোমাকে আশ্রয় দিতে পারে।

শ্রী মা

তৈত্তিরীয় উপনিষদ

শিকাবলী

[ঐশ্বর্যবিশেষের শিক্ষা অবলম্বনে অহংকার ও বিরুদ্ধি]

ঐশ্বর্যবিশেষের শিক্ষা

প্রথম অনুবাক

হরি ও। হে ব্রহ্ম, আমাদের শাস্তিপ্রদ হও। স্বরূপ, আমাদের শাস্তিপ্রদ হও।
অবিনাশ, আমাদের শাস্তিপ্রদ হও। ইন্দ্র বৃহস্পতি, আমাদের শাস্তিপ্রদ হও। উরুক্রম, সর্ব-
ব্যাপী বিষ্ণু আমাদের শাস্তিপ্রদ হও। (১)

পরব্রহ্মকে প্রণাম। হে বায়ু, তোনাকে প্রণাম; তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, তোনাকেই
প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলব। ঋত, ন্যায়ধর্ম বলব, সত্য বলব। তুমি আমাকে রক্ষা করুক, ব্রহ্মকে
রক্ষা করুক। আমাকে রক্ষা করুক, ব্রহ্মকে রক্ষা করুক। ও শাস্তি, শাস্তি, শাস্তি। ১।১

দ্বিতীয় অনুবাক

ও, শিক্ষা (বেদপাঠ, শুদ্ধউচ্চারণ) ব্যাখ্যা করব। [তার উপাদান] (অকারাদি)
বর্ণ, (উদাত্তাদি) স্বর, (হ্রস্বাদি) মাত্রা, বন (বা ধ্বনির পূর্ণতা), ও অবিচ্ছেদ্য উচ্চারণ।
শিক্ষা বিষয়ে (২) এই পাঠ দেওয়া হল। ১।২

তৃতীয় অনুবাক

আনন্ড (গুরুশিষ্য) উভয়ে বেন একযোগে বশ লাভ করি, একযোগে ব্রহ্মতত্ত্ব (পবিত্র-
তার দীপ্তি) লাভ করি।

এখন, 'সংহিতার' (বা গুচ্ছের) (১) গুচ্ছ বহুশা শিক্ষা দেব। পাঁচটি তার ক্ষেত্র :
লোক, জ্যোতিষ, বিদ্যা, প্রজা ও আত্মা সহস্রীর। এই পাঁচটিতে বহুসংহিতা বলা হয়।
এখন, লোক সহস্রে—পৃথিবী পূর্বরূপ, (প্রথম চোখে পড়ে) নভস্বল পর্বের রূপ, আকাশ
সংযোজক, বায়ু সংযোজন-গ্রহি। লোক সহস্রে এই বলা হল।

তারপর জ্যোতিষ সহস্রে—অগ্নি প্রথম রূপ, সূর্য পরবর্তী রূপ, অনলরাশি সংযোগকারক,
বিদ্যুৎ সংযোজনের গ্রহি। জ্যোতিষ সহস্রে এই বলা হল।

তারপর বিদ্যা—আচার্য প্রথমরূপ, শিষ্য পরবর্তীরূপ, জ্ঞান সংযোগকারক, প্রবচন বা আচার্যোক্ত উপদেশ সংযোগের গ্রন্থি। বিদ্যাসম্বন্ধে এই কথা হল।

তারপর প্রজ্ঞা—মাতা প্রথম রূপ, পিতা পরবর্তীরূপ, মন্থন সংযোগকারক, প্রথমন সংযোগের গ্রন্থি। প্রজ্ঞা সম্বন্ধে এই কথা হল।

তারপর আত্ম বা স্বদেশ—নিচের চৌরাস প্রথমরূপ, উপরের চৌরাস উত্তর রূপ, বাক্য সংযোগকারক, তিনটি সংযোগের গ্রন্থি। দেহসম্বন্ধে এই কথা হল।

এই হল পাঁচটি মহাসংহিতা। যেভাবে ব্যাখ্যা করা হল সেইভাবে যে এই মহা-সংহিতা ক'টি জানে সে প্রজ্ঞা, পঞ্চধন, ব্রহ্মভেদ, অম্মাদি ইত্য প্রাপ্ত হয় এবং স্বর্গে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। ১৩

চতুর্থ অধ্যায়

বেদের সূক্তসমূহের যিনি ব্যুত, এই বিশ্ব ব্যাপ্ত দৃশ্যমান রূপ, যিনি বেদের উৎসর্গে অব্যুত থেকে (অথবা অনুত্তর ছন্দ থেকে) সমুত্ত হইয়াছেন, সেই ইন্দ্র মেঘা দিগে আনাকে বন্য করেন। হে দেব, আমি যেন অনুত্তর আধার হতে পারি, আমার দেহ যেন নিপুণ কর্ণকন হয়, আমার জিহ্বা যেন পরম মধুযুক্ত হয়, কানে যেন আমি বহুবিধ বাণী সনগ্রহভাবে শ্রবণ করতে পারি। হে ইন্দ্র, তুমি বেদার দ্বারা আচ্ছাদিত পবনবৃক্ষের কোণ। আমার বেদ-বিদ্যা ব্রহ্ম কর।(৪)

লক্ষ্মী সর্বদা আমার পরিধেয় বস্ত্র, গোধন, অনুপান অচিরে যাতে বহন করে আনেন ও বৃদ্ধি করেন, সেইজন্য বহু সোমশ পঞ্চধন সহ শ্রীকে আমার কাছে নিয়ে এস। স্বাহা। ব্রহ্মচারীরা আমার কাছে আহুক, সব দিক থেকে আহুক, আমার কাছে আসবার জন্য যাত্রা করুক। ব্রহ্মচারীরা আহবান করতে শিশুক, শান্তি পাক। স্বাহা।

জন সনাত্রে যেন মনোহর করতে পারি, ধনবানদের মধ্যে যেন শ্রেষ্ঠ হই। হে ভগ-দেবতা,(৫) সেই জোনাতে (তুমি যার রূপ ভাঙে) যেন প্রবেশ করতে পারি। সেই ভগদেবতা, তুমি আমারে প্রবেশ কর। তুমি যে মহামুখ্য প্রবাহ, তাতে ধৌত হয়ে যেন নিম্নে পবিত্র করে নিতে পারি। স্বাহা।

নদীর জল যেমন চানু বয়ে যায়, বায়ু যেমন দিনে দিনে বসন্তের দিকে যায়, তেমন ব্রহ্মচারীরা আমার দিকে আহুক সব দিক থেকে, হে দেব। তুমি আমার প্রতিবেশী, আমাকে প্রকৃষ্ট আলোক দেও, আমার কাছে এস। ১৪

পঞ্চম অধ্যায়

ভূঃ ভবঃ স্বঃ—এই তিনটি হল ব্যাহতি, পরবের নাম বা মন্ত্র। জা ছাড়া ঐদি

মহাত্মানামা আনন্দের আর একটির কথা জানিয়েছেন, 'বহঃ' (৮)। সেই ব্রহ্ম, সেই আত্মা, আর সব সেবতা তারই অঙ্গ।

ভূঃ হল ইন্দ্রলোক, ভুবঃ হল অস্তরীক, স্বঃ হল ঐ লোক (স্বর্গ), আর বহঃ হল সূর্য। সূর্যের দ্বারা ই সব লোক বহীযান হয়, পৃষ্ঠী ও ঋদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

অথবা ভূঃ হল অগ্নি, ভুবঃ হল বায়ু, স্বঃ হল সূর্য আর বহঃ হল চন্দ্রমা। কারণ চন্দ্রের দ্বারা ই সব জ্যোতিষ্ক (বা সব জ্যোতির্জ্ঞান পদার্থ) বহীযান হয়।

অথবা ভূঃ হল ঋগ্বেদ, ভুবঃ সামবেদ, স্বঃ যজুর্বেদ, আর বহঃ হল ব্রহ্ম, কারণ বেদ সব ব্রহ্মের দ্বারা ই বহীযান হয়।

অথবা ভূঃ হল প্রাণ, ভুবঃ অপান, স্বঃ ধ্যান, বহঃ অনু। অনুের দ্বারা ই সব প্রাণ পৃষ্ঠী ও ঋদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

এই হল চারটি ব্যাহতি ; প্রত্যেকের ব্যাহতির চারটি করে রূপ। এই সব যে জানে, সে ব্রহ্মকে জানে এবং তার কাছে সব দেবতার পূজা উপহার আনয়ন করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এই যে মানুষের অন্তরের হৃদয়াকাশ, সেখানে নানাবয় পুরুষ বাস করেন। তিনি জ্যোতির্বিষয়, দিব্যময়, অন্তঃস্বরূপ। দুই তালুর মাঝে এই যে স্বনের মত পিণ্ড নথমান আছে, সেই হল ইন্দ্রের জন্মস্থান (৭)। সূর্যের যেখানে কেশান্ত আবর্তিত হয় সেখানে কপালের নীৰ্যমেষ ভেন ক'লে তা নির্গত হয়।

ভূরূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত অগ্নিতে, ভুবরূপে বায়ুতে, স্বরূপে আলিতো আর বহঃরূপে নিত্য ব্রহ্মে। তিনি দ্বালাভ্য প্রাপ্ত হল, মনের অধিপত্যকে তিনি লাভ করেন, তিনি হল স্বাক্যের পতি, শ্রোত্রের পতি, বিজ্ঞানের পতি। তার পরও তিনি হল পরম ব্রহ্ম, যার দেহ হল আকাশ, বাঁশ আত্মা হল মতা, বাঁশ আগ্নায় হল প্রাণে আর আনন্স হল মনে, বিনি পাণ্ডিতে সনুহ, অন্তঃস্বরূপ। প্রাচীন সাধনার অধিকারী তুমি, এই ভাবে তাঁর উপাসনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

পৃথিবী, অস্তরীক, স্বর্গ, দিব্ ও অবাস্তর দিক ঈশানাদি ; অগ্নি বায়ু সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র ; জন, ওষধি, বনশপতি, আকাশ ও এসবে অবস্থিত আত্মা—এই হল অধিভূত বা বাহ্য দৃষ্ট নবদীর তিনটি বর্গ।

তার পর, অধ্যায় সয়ছে ;—প্রাণ, অপান, মনান, উদান, ব্যান ; চক্ৰ, কর্ণ, মন, বাক্য, বক ; চর্চ, বাসে, প্রাণ, অগ্নি, নহুজা।।

এই ভাবে বাহ্য তৎগতকে [লৌকিকপক্ষ, জ্যোতিষপক্ষ, তুতপক্ষ—পাঁচের এই তিন প্রহে] এবং বাহ্যি সত্যকে [প্রাণ পক্ষ, ইন্দ্রিয় পক্ষ ও ধাতু পক্ষ পাঁচের এই তিন প্রহে] বিভাগ করে ঋষি বললেন, “এ বিশ্ব পাংস্ত্র বা পাঁচের ওচ্ছে বিনাশ ; পাংস্ত্রের দ্বারাই তিনি পাংস্ত্রকে সংযুক্ত করেন, অর্থাৎ তিনটি অধ্যায় পক্ষের দ্বারা তিনিটি দুই পক্ষের সংযোগ স্থাপনের বিধান করেছেন। (৮)

অষ্টম অঙ্কবাক

‘ও’ এই অক্ষরই ব্রহ্ম, ওঁকারই এই বিশ্ব। ‘ও’ উচ্চারণ করেই সমস্তি জ্ঞানান হয়। ‘ও’ শ্রবণ করাও, এই বলে আবৃত্তি আরম্ভ করা হয়। ‘ও’ বলে গানগান আরম্ভ করা হয়। ‘ওঁহো’ এই বলে শাস্ত্র উচ্চারণ করা হয়। ‘ও’ বলে অধর্নু উত্তর দেন, ‘ও’ বলে ব্রহ্ম স্রষ্ট করতে আরম্ভ করেন (অথবা, প্রধান পুরোহিত তাঁর অনুজ্ঞা দেন)। ‘ও’ বলে অগ্নিতে আহুতি প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়। ‘ও’ উচ্চারণ করে বৈশ্ব ব্রাহ্মণ বেদব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়ে প্রাৰ্ণনা করেন, “যেন আবার ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হই।” অবশ্যই তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন। (৯)

নবম অঙ্কবাক

[ওঁগুহে অধ্যয়ন শেষ করে সনাতনদের পর গৃহস্থের কর্তব্য লক্ষ্যে উপদেশ]—
ঋত (বিহিত কর্তব্য) এবং বেদ অধ্যয়ন-অধ্যাপন। সত্য এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপন। তপস্যা এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপন। ইন্দ্রিয়-সংযম (বশিষ্ট) এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপন। অস্তরের শাস্তি এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপন। গার্হস্থ্য অগ্নিরক্ষা এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপন। অগ্নিহোত্র এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপন। অতিথি সংকার এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপন। লৌকিকতা এবং অধ্যয়ন অধ্যাপন। সন্তান এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপন। পুত্রজনন এবং অধ্যয়ন অধ্যাপন। পৌত্র এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপন। স্বধীতরের পুত্র সত্যবাক্ (অথবা, সত্যবাদী পুত্র) বলেন, সত্যই প্রথম কর্তব্য। তপোনিষ্ঠা নামে (অথবা, নিষ্ঠা তপস্বী) পুরুষিষ্টের পুত্র বলেন, তপস্যাই প্রথম কর্তব্য। মুগ্ধনের পুত্র নাক বলেন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনাই প্রথম কর্তব্য। সেই হল তপস্যা, সেই তপস্যা।

দশম অঙ্কবাক

“আমি বিশ্বরূপ বৃক্ষের শ্রেণবিত্তা (অর্থাৎ, বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে একত্ব)। আমার কীৰ্ত্তি পিরিশৃষ্ঠের ন্যায়। আমি উন্নত ও পবিত্র, শক্তিমানের অন্তরে বহুর অন্তরে বড়।

দীপ্তিবান পাণিব ঐশ্বর্য আনি। আনি বনীবী, আনি নৃত্যহীন ভরাহীন।” এই হল ত্রিশত্বের উক্ত বেন নর, আত্মজ্ঞানের সূত্র। (১০)

একাংশ অনুবাক

বেদ অধ্যাপন শেষ ক’রে গুরু শিষ্যকে উপদেশ দেন :

সত্যাকা বলবে। ধর্ম আচরণ করবে। বেদ অধ্যয়নে অবহেলা করবে না। আচার্যকে তাঁর ঈপ্সিত দান (দক্ষিণারূপে) দান ক’রে তারপর (সংসার ক’রে) বংশধারা অনবচ্ছিন্ন রাখবে। সত্য থেকে ষ্টে হবে না। ধর্ম থেকে ষ্টে হবে না (বা কর্তব্যে অবহেলা করবে না)। নগ্ননের পথ থেকে ষ্টে হবে না। জুতি বা উনুজি-অভ্যায় অর্থনে অবহেলা করবে না। বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় অবহেলা করবে না।

সেবকার্য ও পিতৃকার্যে অবহেলা করবে না। মাত্র পিতাকে সেবতন্ত্রানে পূজা করবে। আচার্য অস্তিতিকে সেবতন্ত্রানে পূজা করবে। অনিশ্চর্য কর্ম অনুষ্ঠান করবে, নিশ্চর্য কাজ করবে না। সূচরিত বলে আনরা যে সব আচরণ করেছি, তুমিও তাই করবে, ইতর আচরণ করবে না।

আনাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ব্রাহ্মণ বীরা আছেন তাঁদের সম্মানার্থ আসন দিয়ে শ্রুনাপনোদন করবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করবে, অশ্রদ্ধা করে দান করবে না। শ্রীর সঙ্গে (সঙে চিত্তে, শৌভন ভাবে, অধ্বা সাধানত) দান করবে, লভুজা (বিনয় সঙ্ঘোচ) ভয় ও সহানুভূতির সঙ্গে দান করবে।

আর যদি কর্ম বা আচরণ সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে তাহলে সেখানে যে সব ব্রাহ্মণ আছেন বীরা বিচারকন, যোগযুক্ত বা ভক্তিবান, স্বতন্ত্র (অপরের অধীন নন), বীরা ত্রক বা নিষ্টুর নন, ধান, পূণ্যকান, তাঁরা সে অবস্থায় যে আচরণ করেন সেই ভাবে চলবে।

এই হল উপদেশ, এই হল বেদের শিক্ষা, এই হল বিধি, এই আদেশ। এই নিদেশ নেন চলবে।

ষাণশ অনুবাক

হে বিত্র আনাদের শান্তিপ্রদ হও। বরুণ, আনাদের শান্তিদান কর। অর্যমা, আনাদের শান্তি দাও। ইন্দ্র বৃহস্পতি আনাদের শান্তি দান কর। হে উরুক্রন বিষ্ণু, আনাদের শান্তিদান কর।

পরম ব্রহ্মকে প্রণাম। হে বায়ু, তোনাকে প্রণাম; তুমিই-প্রত্যক ব্রহ্ম, তোনাকেই প্রত্যক ব্রহ্ম বলব। ঐত (ন্যায় ধর্মের বধ্যার্থ বিধান) বলব, সত্য বলব। তু আনাকে রক্ষা করুক, বরুণকে রক্ষা করুক। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ—মন্তব্য

ঋগ্বেদের সাধনার নতই প্রাচীনতর উপনিষদগুলির, বিশেষ ক'রে এই তৈত্তিরীয় উপনিষদের সাধনার ধারায় বাহ্য জীবন বর্জন করে না। তার উদ্দেশ্য হল চেতনার এক স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে সত্যকে উপনীত করা, প্রত্যেক স্তরে বিশুব সঙ্গ এবং পুরুষ ও প্রকৃতি উভয় রূপে সচিচিদানন্দের সঙ্গ একত্র অতীকার করা, প্রত্যেক স্তরে উপনীত হয়ে নিবৃত্তির কার্যবলী উৎকর্ষিত স্তরের আনোকে নূতন বিধানে সুবিন্যস্ত করা, এবং এই ক্রমিক আত্ম-প্রসারণ ও আত্মরূপান্তরের ফলে অজ্ঞান মানবকে দিব্য মানবে পরিণত করা।

(শ্রীঅরবিন্দ, On Yoga পৃ ৪৫৭)

কৃষ্ণবসুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ৭ম ৮ম ও ৯ম প্রপাঠকই হল এই উপনিষদ। ১০ম প্রপাঠক মহানারায়ণ উপনিষদ নামে পরিচিত।

তৈত্তিরীয় নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা কৌতুকাবহ কিম্বদন্তী বিষ্ণু পুরাণে (তৃতীয় অধ্যায় ৫ম সর্গে) উদ্ধৃত আছে। যজ্ঞবল্ক্যের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে ওত্র বৈশম্পায়ন তাকে তার অধীত বিদ্যা প্রত্যাৰ্পণ করতে বলেন, যজ্ঞবল্ক্যও যজুর্বেদ সহ সব বিদ্যা স্থূলরূপে উৎসার করেন। তখন বৈশম্পায়নের অন্যান্য শিষ্যেরা তিত্তির পক্ষীর রূপ ধরে তাকে সংগ্রহ করেন। তাই নাম হল তৈত্তিরী, এ আখ্যানের ভ্রাতৃপথ যজ্ঞবল্ক্য বোধি দ্বারা ওত্র যজুর্বেদ সংহিতা পেয়েছিলেন, অন্য সঠাৎদেৱা চিরাগত বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা বিষ্ণু বিষ্ণু করে অর্জন করেছিলেন।

১। ঋগ্বেদ, ১-২০-১।

সেবতারা হোমতির শক্তি, অদ্বিতি বা আনন্ত্যের পুত্র। অজ্ঞান এবং পিত্তি, বিভ্রা-
জনের পুত্র অহুরদের বিরুদ্ধে চিরন্তন সংগ্রামে সেবতারা মানুষকে সাহায্য করেন, উৎসর্গতির
পথ স্থাপন করেন।

বিত্ত হল সূর্যসবিতার পরম জ্ঞান ও স্বষ্টিশক্তি, বৈজী-প্রেম, সননুদের রূপ, বরূপ তার আনন্ত্য ও বিতচ্ছ ব্যাপ্তির রূপ, অর্থাৎ তার ভূপঃশক্তিময় রূপ—সত্য নির্ধারণ ক'রে তার উদ্দেশ্যে অতীশা ও অধ্যবসায়ের বীৰ্য। ইন্দ্র সেবতার হলেদ দিব্য মনে অভিব্যক্ত শুদ্ধ-সৎএর শক্তি, বৃহস্পতি ব্রহ্ম বা পরমাত্মশক্তি। উরুহর, বিশাল বীর পদক্ষেপ, তিনি সর্বব্যাপী বিষ্ণু। আর বায়ু বিশ্ববর প্রাণশক্তি।

(শ্রীঅরবিন্দ On the Veda পৃ ৪৩৫-৪৩৬)

২। শিখা, বেদমন্ত্রের বিতচ্ছ উচ্চারণের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হত, বিশ্বাস ছিল ধ্বনিতরঙ্গের বিশেষ শক্তি অগতের বিভিন্ন ভূমিতে অভিলম্বিত ফল দেয়। তৈত্তিরীয় সংহিতার একটা কাহিনী উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশ্বকর্মা ভূটীর এক পুত্রকে ইন্দ্র বধ করেন। প্রজিশোধ সেবার ইচ্ছায় ষষ্ঠী বজ্র করলেন যাতে আর এক পুত্র

জন্ম নিয়ে ইন্দ্রকে শাসন করতে পারে। কিন্তু স্বর্ষের পার্বত্যের জন্য নব্বের অর্ধ হল থাকে ইন্দ্র বধ করবে। ফলে, বৃত্র জন্ম নিল বটে কিন্তু ইন্দ্রের হাতে নিহত হল।

৩। দৃশ্যমান বস্তু বিচিত্র বিশ্বের মধ্যে একই দেখবার শিকা সেওয়া হচ্ছে। সবদূর সূত্রে এইরূপ বর্ণীকরণের ফলেই বিখ্যাত সাংখ্যদর্শন পেয়েছেন মহর্ষি কপিল। উপনিষদে অবশ্য সবগুলি গুচ্ছকেই পরবের একত্বের বহুভাবে প্রকাশ বলে দেখান হচ্ছে।

৪। তাঁর Foundations of Indian Culture এ উপনিষদ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রবিশ্ব এই অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে বেদে সেবত্বের যে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তি ও স্বভাব স্বাধীনভাবে ভাষার পরিচ্ছদে সংগঠ রয়েছে শপটাক্ষরে তার প্রকাশ করেছে উপনিষদে। এখানে ইন্দ্রকে বলা হল ব্রহ্মের রূপ বেদার কোবে রক্ষিত,—পরিষ্কার, সংশ্লিষ্ট এ থাকে অর্থ।

৫। এখানে দিবা জ্ঞানের আলোক প্রাধান্য করছেন দিবা নবের কাছে, যাতে তিনি শিখার ঠিকমত শিকা নিতে পারেন।

৬। তাই হল সূর্যবিক্রান্ত সর্বাশ্রয়ী আনন্দের রূপ। সে আনন্দের শক্তিতেই নিম্ন প্রকৃতির সব মলিনতা দূর হয়। ‘প্রতিবেশ’ নামের অর্থ শক্তির করেছেন শ্রবাপনয়নস্থান, তার শরৎ দিনে পুনঃ পাপ দূর হয়।

৭। ব্যাহতি হল বিভিন্ন লোকে ব্রহ্মের আত্মপ্রকাশের ছন্দ। আনন্ড সাতটি স্তর, সাতটি লোকের উল্লেখ পাই। নিম্নস্তর দেহপ্রাপননের লোক তুঃ-ভুবঃ-স্বঃ, উর্ধ্বস্তর সংচিৎআনন্দের লোক ব্রহ্ম-তপঃ-সত্য, আর অন্তর্ভুক্ত সংযোগ সেতু বহু: বিজ্ঞানবয় লোক, শ্রীশ্রবিশ্ব ডাকে বনেছেন অতিমানস। নিম্নস্তর চারটিই কথায় এখানে বলা হয়েছে। সর্বত্রই হয় ব্রহ্মের আত্মপ্রকাশ, কিন্তু বহুলোক ব্রহ্মের সত্যরূপ, আর সব লোকের সত্যোক্তি: ও শক্তির উৎস সেখানেই। প্রত্যেক ব্যাহতির চারটি করে রূপ বলা হয়েছে, স্বাভাবিক আধিতোভিক (অড়বিশ্বসম্বন্ধে) আধিতৈবিক (বিশ্বজনীন আত্মিক শক্তি), আধিত্যগ্নিক (উর্ধ্বগতির সোপান) এবং আধ্যাত্মিক (মানব বিশ্বাস সম্বন্ধে)। অড়বিশ্বে সূর্যই সব শক্তির উৎস। আত্মিক ক্ষেত্রে অড়শক্তি, প্রাপশক্তি ও নবের শক্তি উৎস আধ্যাত্মিকতা, চন্দ্র যার প্রতীক আর আনন্দের শক্তি, সোন যার প্রতীক। ব্রহ্মের ক্ষেত্রে স্বর্গ নামে পাই তত্ত্ব জ্ঞাপক বস্তু, সানগানে স্বর্ষের শপনে প্রাপে তার অনুভূতি, স্বর্ষের বাহ্য ও আত্ম ব্রহ্মের ফলে স্বর্গ, উন্নততর চেতনা লাভ; আর পরম লক্ষ্য ব্রহ্ম।

সব লোকেই প্রকাশের ধারা নির্দিষ্ট হয় পরবের ওচ্চতমতার উচ্চাশ্রিত নব্বৈ। নবের দ্বারা ব্রহ্মকে ধারণা করবার এই প্রথম উপায়। শিকারীর পক্ষে এই বুদ্ধিগ্রাহ্য একবে বনসংযোগ ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গীভূত। এই বোড়শ কলাযুক্ত ব্রহ্মের কথা ছাশোপোও বলা হয়েছে।

বেদে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, সৌ এই তিন লোকের উপরের লোককে স্বর্ আখ্যা সেওয়া

হয়েছে, তাকে 'মহাপথ' বলা হয়েছে (যথা ঋগ্বেদ, ২-২৪-৭)। উপনিষদ-পুরাণে 'মৌ' ও 'স্বরে'র মধ্যে পার্থক্য লোপ পেয়েছে বলে এই সত্যঃ-ঋতঃ বৃহৎএর লোককে, 'মহনু' এই নুতন নাম দেওয়া হল। বৃহৎ ঋতুর সর্বাধিক বৃহৎ ঋতু থেকে এ পদ গঠিত হয়েছে। তার জন্য এ উপনিষদে শ্রদ্ধাসহকারে ঋষি মহাচানস্যের নাম স্মরণ করা হয়েছে।

(৭) ভূ-ভুবঃ-স্বঃ, পৃথিবী-অন্তরীক্স-স্বর্গ, দেহ-প্রাণ-মন ও তাদের অবিচ্ছিন্ন যেরাজা অগ্নি-বায়ু-সূর্য, সবই ব্রহ্মের অভিব্যক্তি; দেখা, শোনা, কথাবলা, জানা সব বৃত্তিই ব্রহ্মের শক্তি। এসবের মাধ্যমেই ব্রহ্মকে স্পর্শ করা যায়। তবে আচার স্বরূপে অধিষ্ঠান হল অস্ত্রের, ছন্দস্বাক্ষেপে, যদিও আকাশের মত তা সর্বব্যাপী ও নিরবয়ব। সেখানে প্রবেশ করে তাকে পাওয়া যায়।

মনোধর্মী মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের প্রতিভা হল মনোবর পুরুষ; তাকেই ইন্দ্র বলা হয়েছে; ইন্দ্রযোনি, যোনের তাঁর অধিষ্ঠান কঠ থেকে সহস্রার অবধি। তাঁর পুথন উপাসনা হল 'স্বাস্থ্যজা'—বাক্-মন-জ্ঞানের অধিপতিরূপে, (কেনোপনিষদের বা উপদেশ)। তারপর বিশ্বময় আকাশরূপী সত্যানর স্বরূপে—মন প্রাণ বাঁর আনন্দ গ্রহণের যার।

(৮) প্রাচীনযোগা, চিরাগত সাধনার ধারার যোগ্য উত্তরাধিকারী। তবে বৃহদারণ্যক বংশ ব্রাহ্মণে 'প্রাচীনযোগা' নামও পাওয়া যায়।

(৯) পবনব্রহ্মের কাচক শক্তিগর্ভ ময় ওঁকারের প্রপত্তি উপনিষদে ও অন্যান্য পাঠে বহুস্থানে আছে। শ্রীঅমরবিন্দও বলেছেন 'সাবিত্রী'তে—

The voice that chants to the creator Fire,
The symbolized OM, the great assenting Word, (III. 2)

(১০) এই সূত্র প্রচলিত ঋগ্বেদ সংহিতার পাওয়া যায় না। যেতাসুতরেও কতকগুলি বেদমন্ত্র উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাও ধরা হয় নাই। এই ব্রহ্মক কত সূত্র বে লুপ্ত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নাই।

উপনিষদের সবগ্ন শিকাতে ব্রহ্মের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়, উভয়ভাবেই সঙ্গে একাধিকার কথা বলা হয়েছে, ঋগ্বেদে সক্রিয় ভাবেই যোর, 'বিশ্বদেব' বিশ্বে বিবষ্ট আলোকের সব শক্তি অস্ত্রে রূপায়িত করে আররূপান্তরই তার শিক্ষা। এখানেও বলা হয়েছে সে সাধনার চরম পরিণতির কথা। দেবীসূক্ত ১০-১২৫ এবং বাবদেবের 'অহংবদুত্তরনু ৪-২৬ ইত্যাদি সূক্তেরও উল্লেখ করা যেতে পারে।

বৃক্ষরূপে বিশ্বাসুর ব্রহ্মের বর্ণনা ঋগ্বেদে অন্যত্রও আছে, (যথা ১০-৩১-৭ এবং ১০-১২৭-৪), উপনিষদেও আছে, যথা কঠ, ২।৩।১, ও যেতাসুতর, ৩।২। গীতার "উর্ধ্বকুলং অকাক্ষাণঃ এযোহমুখঃ সনাতনঃ" (১৫।১) ত স্থবিধিত।

‘বাকী’ অর্থে বলবান (অশ্ব অর্থও আছে, প্রাপকজিতে পূর্ণ) । বলবানে যে স্থ-অবত, বলা হয়েছে তাঁর কারণ বল না হলে আত্মলাভ হয়না,—“নাশ্বনাশ্বা বলহীনেন লভ্যঃ” এবং “আত্মনা বিশতে বীরঃ বিদ্যায়া বিশতে অবৃতঃ”—আত্মার দ্বারা হয় বীর্যলাভ এবং বিদ্যার দ্বারা হয় মুক্তলাভ ।

‘ঔশ্ব’ অর্থ চেতনার ঔর্ধ্বতন সব ক্ষরে প্রসারিত, দীপ্তিবান ঔশ্ব্য, (সবর্চস ত্রিবিধ) পার্শ্বিক ভীষনে অস্তরের অধ্যাক্ষসম্পদ । কিন্তু শব্দর তা স্বীকার করেন না বলে, ‘ঔশ্ব-পবিত্র’ অর্থ করেছেন, কারণ জ্ঞান প্রকাশ্য ব্রহ্ম, ‘বাকী’ অর্থ সুখ—তাঁর মতে গোড়ন আয়তন, ‘ত্রিবিধ’ অর্থ বোক্ষদেহু আয়তান ।

ভগবান সব করে দিতে পারেন—জয় ও প্রকৃতি পরিত্যক্ত হতে পারে, জন্তুর চেহারা প্রাপ্ত হতে পারে, বহনিকা অশাসিত হতে পারে—যদি বিশ্বাস ও নির্ভর করে ভগবানের কাছে নিজেকে যবে দেওয়া হয় : এ যদি অধিনেবে পূর্ণভাবে করা সম্ভব নাও হয়, তবুও বতই তা করা যায়, ততই অস্তর থেকে আসে সাহায্য আর নির্দেশ, ক্রমে ভগবানের উপলব্ধিও বৃদ্ধি পায় । তাত্ত্বিক মন যদি কম ক্রিয়ামূলক হয়, আর নতি এবং আত্মসমর্পণের সত্তর যদি বর্ধিত হয়, তা হলে কাজটি নিশ্চয় সম্ভব । আর কোন সাধর্থা বা গুণতার গুণন কিছু প্রয়োজন হয় না । কেবল এ জিনিষই যথেষ্ট ।

শ্রীঅরবিন্দ

পুনর্জীবন

মীরদ্বন্দ্ব

হে বিশাখা, তরুণিরে ধীপু চপলায়
নয়ন-অঞ্জন ঝাঁকি অরণ্য-প্রস্রাবতে,
অনিলে কি বিষহরা বিকাশ-বেলায়
মুগ্ধরিত কুম্ব-গীতিকা ? অপঘাতে
যার ক্ষণ-আত্ম মিলালো নিদ্রাস্থানি
চেতনার পরপারে আলোগত্হীন
অঙ্ককূপ মৃত্যুর মলিলে, তা'রি বাণী
শতবর্ষ নিমজ্জিত সমাধি-বিলীন
অবগুষ্ঠ চিরি' উঠিল কি বিব্রোহের
চক্ৰবর্তী ভূতঙ্গের মত ?

তীক্ষ্ণকণা

দঃখিল যেখানে, সেথা হতে নির্বরিত
কলকঠ-নির্নাদিত অনন্ত-শরণা
সুনীল সুধার শ্রোত বেগে বহে যায়,
সজীবিয়া বিটপীর সহস্র শাখায় !

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯନ୍ତ୍ର

ବସିକା

(୨୫୫ ଆମ୍ବେ, ୨୦୨୨)



ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଶାଳା

୨୫ ବସିକା ଗାଁ ଡିପ୍ଟ

କଲିକାତା—୨୨

১। আবেদন	শ্রীমা	১
২। ১০ই আগষ্ট, ১৯১১	শ্রীঅরবিন্দ	২
৩। চিন্তাবলি ও হৃদ্যবলি	"	৬
৪। বাসবদত্তা		১০
৫। শ্রীমা কলম	ডাঃ কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েয়ার (অনুবাদক—বিতানন্দ বহু)	২০
৬। মহামানবের সাগরতীরে	সমর বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮
৭। মায়ের স্তব্ধ কথা	শ্রীমা	৩৫
৮। বোম্বাই-বন্দর-প্রসঙ্গ	অনির্বাক	৫৬

বক্তিকার নিয়মাবলি

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক টাক: ৫২ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। টাক: ৬ চিহ্নিত সন্মানকীয় আলিস কিংবা কলিকাতা-লাহার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নতুন বৎসরের টাক: যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

স্বাক্ষর :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠসম্মিত
১০১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পরিচরিত

মূল্য—১২ টাকা

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠসম্মিত, ১০১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট, কলিকাতা—১২
মুদ্রক—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পরিচরিত



নিশ্চেতনা হতে ভাগবত চেতনার উৎক্রান্তি—

১৫ আগষ্ট, ১৯৬১

নিশ্চেতনার গভীরে অবধি অগভে ভাগবত চেতনা,
ভাবতী, চিরস্থনী।





ঐযরবিশ্বের কক্ষ

আবাহন

মা আবাহনের, ভারতের আবহাওয়া, মা তুমি, তোমার সন্তানদের কখন ছেড়ে যাওনি
জুনি, পাঁচডান অবসাদের দিনেও, এমন কি যখন তারা তোমার কথার কর্ণপাত করেনি, সেবা
করেছে অন্য ইষ্ট, অস্বীকার করেছে তোমার তর্কন পর্য্যন্ত—এখন তারা কিবে উঠে বাঁড়িয়েছে,
তাই ভেে এই বুদ্ধির উদ্যম, এই দিব্য বুদ্ধিতে যখন জ্যোতি ফুটে উঠেছে তোমার বুখনওনে,
প্রণতি জানাই তোমায় । পথ দেখিয়ে নাও আবাহনের,—যাতে বুদ্ধির উন্মুক্ত প্রসার নিয়ে যায়
সত্যাকার মহত্ত্বের প্রসারে, নিয়ে যায় জ্যাতিসমূহের সম্মেলনক্ষেত্রে তোমার সত্যাকার জীবন-
ধারায় । পথ দেখিয়ে নাও যাতে আমরা সর্বদা যেন মহৎ আদর্শের পক্ষে বাঁড়াই, মানবজাতিকে
যেখানে পারি তোমার সত্যাকার স্বরূপ,—অধ্যাত্মসাধনার পথে দিশাবী, সকল লোকের
মিত্র এবং সহায় ।

শ্রীমা

১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭

শ্রী স্বরূপ

১৫ই আগষ্ট স্বাধীন ভারতের জন্মদিন। এদিনে ভারতে একটা যুগের শেষ হল, আরম্ভ হল নূতন যুগ। কিন্তু কেবল আনন্দের জন্যেই নয়, এগিয়ার জন্যে, সনগ্রহ অগভীর জন্যে এ দিনের অর্থ রয়েছে। সে অর্থ হল নেশনগোল্ডির মধ্যে একটা নূতন নেশন শক্তির আবির্ভাব, অক্ষুণ্ণ যার ভবিষ্য-সম্ভাবনা, মানবজাতির রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ভাবিতব্য গঠনে যার থাকবে বৃহৎ অবদান। ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে এ ভিনিষটি নিশ্চয়ই প্রাতিফিক যে ফে-দিনটি আমার স্মরণীয় ছিল আমার নিজের জন্মদিন হিসাবে, আমার জীবন-সাধনা যারা গ্রহণ করেছে তাইই ফে-দিনটিকে উৎসব করে এসেছে, ঠিক সেই দিনটি আজ অর্থন করছে এক বিশাল অর্থ। অধ্যাক্ষ-পন্থী হিসাবে এই যোগাযোগটি আমি কেবল একটা হঠাৎ-যোগ বা আকস্মিক-ঘটনাক্রমে গ্রহণ করি না, তা হ'ল যে ফাল নিয়ে আমার জীবন আমি যুক্ত করি তাতে ভগবৎশক্তির সম্রতি ও তাঁর অনুবাদনসূচক অশৌর্বাদ। এই ভগবৎশক্তির নির্দেশই আমার প্রতিপন্ন চালিয়ে নিয়েছে। ফলতঃ যে সব ভাগ্যতিক আশো-নানের পূর্ণসাক্ষ্য আমি স্বেচ্ছা বেষ্টে পাবব আশা করেছি, একসময়ে যাদের নলে হত অসম্ভব বশু বলে, আজ দেখছি তারা তাদের গন্তব্যের নিকটে গিয়ে পৌঁছেছে, অস্ততঃ তাদের কাছ হুজ হবে গিয়েছে, সাক্ষ্যের পথে উঠেছে গিয়ে।

আজকার এই মহৎ উদ্দেশ্যে আমার কাছে বাণী চাওয়া হয়েছে, কিন্তু বাণী দেওয়ার মত সম্ভাবনা এখন আমার নেই। তবে আমি সকলকে জানাতে পারি আমার ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, শৈশবে বৌবনে যারা অধুরিত হয়েছে, এখন যাদের ফলোৎপন্ন হতে চলেছে—কারণ ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ, এইজন্যে যে সে-সব হ'ল আমার নতে ভারতের বা ভবিষ্য কর্তৃ, যাতে ভারত নেতৃস্থান না গ্রহণ করেই পারে না, তাঁর অসীমভূত। আমি চিরকাল বিশ্বাস করেছি, বলে এসেছি যে ভারতের অভ্যুত্থান, তাঁর নিজের মূল স্বার্থসেবার জন্যে নয় কেবল, নিজের প্রসার, বহু, শক্তি সন্নিবিষ্ট লাভের জন্যে নয়, যদিও এসকলকে অবহেলা করা তাঁর উচিত হবেনা—তবে তাঁর জীবনদায়ণ হবে ভগবানের জন্যে, অগভীর জন্যে, সকল মানবজাতির সমার ও নেতাক্রমে। এইসব আশা আকাঙ্ক্ষা তাঁদের স্বাভাবিক ক্রমানুসারে এইরকম : (১) এক বিশুব, যার ফলে ভারতের হবে মুক্তি ও ঐক্য, (২) এগিয়ার পুনরুত্থান ও মুক্তি—মানবজাত্যের ক্রোন্যুতিকক্ষেপে একসময়ে তাঁর যে ছিল হুদহৎ অবদান পুনরায় সেই ব্রত গ্রহণ করা, (৩) মানুষের জন্যে একটা নুত্তর,

বহুতর, উচ্চমানের, উন্নততর জীবনধারা—তার পূর্ণরূপ বাহ্যতঃ, প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আন্তর্জাতিক ঐক্যের উপর—প্রত্যেক দেশের অক্ষুণ্ণ রাখবে তার পৃথক স্বকীয় জাতীয় জীবন, সেই সূত্রেই সকলে সম্মিলিত থাকবে সকলের উপরে সকলের অস্তিত্বে রয়েছে যে অনিবার্য একতা তার মধ্যে, (৪) ভারত জগৎকে সেবে তার অধ্যায়জ্ঞান, আর জীবনকে আধ্যাত্মিক করে তুলবার সাধনা, (৫) সর্বশেষে এক উজ্জ্বল চেতনার মানুষের উত্থাপন, ফলে প্রকৃতির বিবর্তনে একটা নতুন পর্যায়—তখনই আরম্ভ হবে আণ্ডিতিক বাবতীয় সে-সব সমস্যার সমাধান, মানুষকে যা বরাবর বিনষ্ট আর ক্ষুধ করেছে, যেদিন থেকে মানুষ ব্যক্তিগত পরসোৎকর্ষের, সর্বাঙ্গসুস্থতার সন্ধানের চিন্তা করেছে, যশু সেখানেই।

ভারত স্বাধীন, কিন্তু একই সে লাভ করেনি, এ তার দীর্ঘ ঋতি স্বাধীনতা। এমনকি এক সময়ে প্রায় বোধ হয়েছিল হয়ত যা সে ফিরে চলেছে ব্রিটিশ অধিকারের অব্যবহিত পূর্বেরকার বিচিহ্ন রাষ্ট্রস্বাধীন বিশ্বখন্ডের মধ্যে। সূর্যের কথা, বর্তমানে বিশেষ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে এই সাংঘাতিক পুনরাবর্তন তার আর ঘটবে না। সংগঠনী-সমিতি (Constituent Assembly) তাঁদের কর্মব্যস্ততায় যে দৃঢ়তা ও হৃদ্বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তাতে বনে হয় অনুগত শ্রেণীর সমস্যার সমাধানই হবে, ভাঙ্গন বগুন কিছু ঘটবে না। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের সেই ভ্রূপ্রাচীন বর্গগত ঘন্ম এত গাঢ় হয়ে উঠেছে যে নবন যত তা দেশকে যেন স্বাধীভাবে ঋতিত করেছে রাজনীতিক হিসাবেও। তবে আশা করা যায় জাতীয় মহাগতা আর দেশের লোক এই আপাতবাস্তব সভ্যকে স্বাধী বাস্তব বনে গ্রহণ করবে না, সাময়িক ব্যবস্থার বেণী মূল্য একে সেবে না। কারণ, তা যদি স্বাধী হয় তবে ভারত সাংঘাতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে, এমনকি বিকল হয়েও পড়তে পারে। অতঃপূর্বের সম্ভাবনা সর্বদাই রয়ে যাবে, এমনকি নতুন এক বিশেষী আক্রমণ ও অধিকারের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। দেশের বিভাগ দূর দণ্ডা চাই—যে উপায়েই হোক। আশা করা যায় বিরোধের উগ্রতা সময়ে শূন্য হয়ে আসবে, কিংবা শান্তির সৌভাজের প্রয়োজন উভয়পক্ষ ক্রমেই জয়যম্ব করবে, অথবা একই কর্তে একসঙ্গে সহযোগে যে নিত্য প্রয়োজন, এমনকি এ উদ্দেশ্যে একটা ঐক্য সাধনের বহুও যে দরকার এ উপলব্ধি হবে। ঐক্য এইভাবে আসতে পারে যে আকারেই হোকনা—বিশেষ আকারটির প্রয়োজন কাজের সুবিধার দিক দিয়ে, তার নিজস্ব নিত্য মূল্য কিছু নাই। কিন্তু যে উপায়েই হোক, বগুতাকে যেতে হবে, যাবেই। তা না হলে, ভারতের ভবিষ্যৎ সাংঘাতিকভাবে ক্ষুণ্ণ হবে, এমনকি ব্যর্থ হতে পারে। কিন্তু তা ঘটতে পেওয়া হবে না।

এসিয়া উঠে পড়িয়েছে, তার অনেকানেক অংশ স্বাধীন হয়েছে কিংবা স্বাধীন হতে চলেছে—অন্যান্য অংশ যারা এখনও পরাধীন তারা যত ঘন্মসংঘর্ষই হোক না তার ভিতর দিয়েই মুক্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। সারান্যই একটু করবার থাকী আছে, আশা হোক, কাল হোক সেটুকু করা হবেই। এখানেও ভারতের করণীর কাজ আছে, এবং সে-কাজ

সে আবৃত্ত করেছে সানর্থ্য ও নৈপুণ্য সহকারে—তাতে ইতিবোধই নির্দেশ করে কতখানি তার ভবিষ্যৎ সত্তাবনা আর কোন দান সে অধিকার করতে পারে জাতিসমূহের আসরে।

মানবজাতির ঐক্যসাধনাও দৃষ্ট হয়েছিল, সুতরাপাত যদিও তার জটিলত্ব, বাহ্য-বাহ্য একটা পেয়েছে বটে কিন্তু বিপুল বিশ্বের বিরুদ্ধে তাকে চলতে হয়েছে। কিন্তু ভিতরের বেগ সে অর্জন করেছে, আর ইতিহাসের শিক্ষা দিয়ে যদি দিকনির্ণয় করা যায়, তাহলে বলা যেতে পারে সে-বেগ ক্রমে বৃদ্ধি পাবে এবং শেষে জয়লাভ করবেই। এক্ষেত্রেও ভারত প্রধান এক অংশ গ্রহণ করেছে—সে যদি অনুশীলন করে চলে সেই উদারতার রাষ্ট্রনীতি বর্তমানের ঘটনা আর আগু সত্তাবনার মধ্যেই যা সীমাবদ্ধ নয়—যার দৃষ্টি ভবিষ্যতের মধ্যে, এবং ভবিষ্যৎকে যা নিকটে নিয়ে আসে—তবে ভারতের উপস্থিতির অর্থই হবে নব্বির আর শক্তি গতির পরিবর্তে কিম্বা নিতীক গতি।

দুর্যোগ একটা অতিক্রমে অবশ্য এসে পড়তে পারে, যে কাজ করা হয়ে চলেছে তাকে ব্যাহত করতে পারে, তাকে ধ্বংস করতে পারে,—তাহলেও শেষ ফল সুনিশ্চিত। যাই ঘটুক না, ঐক্যসাধন প্রকৃতির ব্যায় একটা অবশ্যপ্রয়োজন, অপরিহার্য ক্রিয়া, এবং তার সংশ্লিষ্ট সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে ভবিষ্যৎ বাণী করা যায়। বৈশ্ববাসকনের জন্যে তার প্রয়োজন পাঠ, কারণ তৎকালিকের কৃষ্ণতর জাতিরা অতঃপর কখনও নিরাপদে থাকতে পারে না। আর ভগবৎপ্রতি যদি থাকে তবে তারও নিরাপত্তা সম্ভবাকূল। সকলের স্বার্থের দিক দিয়েই, ভারতের ঐক্য বাহ্যনীয়। কেবল মানুষের যোগ পদ্ধতি আর নৃচ আত্ম-পরতাই তাকে সার্থ্য করতে পারে—মানুষের এ ভূগণের বিরুদ্ধে শোনা যায়, দেবতাদের পর্যন্ত আশ্রয় লুপা : কিন্তু প্রকৃতির প্রয়োজন আর ভগবৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ ভিষ্ম ও কখনও দাঁড়াতে পারে না। এরকমই ভারতীয় পূর্ণ সার্থকতা লাভ করবে, তারপর প্রয়োজন হবে যাতে একটা আত্মতাত্ত্বিক ভাব ও দৃষ্টি গড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে আত্মতাত্ত্বিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান। এমনকি যে পরিবর্তন ঘটছে সেই ব্যায় একদেশের অধিবাসী দুই বা ততোধিক দেশের নাগরিক অধিকার লাভ করতে পারে, বিভিন্ন বৈশ্ববাসকনের সংস্কৃতি যেচ্ছায় পরস্পরে সম্মিলিত হবে একীভূত হয়ে উঠতে পারে। বৈশ্ববাসক তার যৌদ্ধভাব পরিত্যাগ করে, নিজের নিজস্বকে অকপ্ত রেখেও এসকল জিনিষকে বরণ করে নিতে পারে, সমস্ত মানবজাতি নূতন একটা ঐক্যভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে তখন।

জগৎকে ভারত তার আধ্যাত্মিক বিদ্যা দান করতে ইতিবোধই আবৃত্ত করেছে। ভারতের আধ্যাত্মিকবিদ্যা ইউরোপ ও আমেরিকার জন্যে অধিকতর পরিমাণে প্রবেশ লাভ করছে। এই গতি জনেই বৃদ্ধিলাভ করবে। এতুগের দুর্যোগের মধ্যে মানুষের দৃষ্টি আশার ভরসার তার দিকেই বৈশ্ব করে ফিরছে, কেবল তার শাস্ত্রই নয়, তার সাধনা, আত্মর ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন-পদ্ধতির আগ্রহ গ্রহণ করতে উন্মুখ হয়েছে।

অবশিষ্ট যা জা হল আবার ব্যক্তিগত আশার ও আদর্শের কথা। ভারতবর্ষে এবং

পাশ্চাত্যে যাদের নৃষ্ট ভবিষ্যতের মধ্যে কিছু নিয়ে পড়েছে—ভ্রাসা ধীরে ধীরে একে গ্রহণ করছে, অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্র অপেক্ষা এখানে বাধাবিশু অত্যন্ত বিপুল—কিন্তু বাধা বিশু হয়েছে জয় করার জন্যে—ভগবৎ-অনুজ্ঞা যদি থাকে, তবে এসব জয় করা হবেই। এখানেও এই বিবর্তন-ক্রমের আবির্ভাব-সম্ভাবনা যদি থাকে, তবে তা ঘটবে, অধ্যাক্ষমতার ও আন্তর চেতনার পরিণতির ফলে এবং এইজন্যেই সে-প্রেরণা আসতে পারে ভারতবর্ষ হতে—বাহিরের ক্ষেত্র পৃথিবী জুড়ে, কিন্তু উৎস হবে ভারত।

ভারতের স্বাক্ষর এই নৃক্তিবিশেষের মধ্যে আদি এই অর্থ দেখেছি—এ যোগাযোগ কত নৃক্তসঙ্গারী বা কতশীঘ্র বাজবে পরিণত হবে তা নির্ভর করছে এই নূতন ও নূক্ত ভারত-বর্ষের উপর।

• অনুবাদক—ঈশলিনীকান্ত ভট্ট

চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি

পূর্বাত্মক

ঐক্যবিশিষ্ট

কর্ম

নবজন্মের আলো যেমন পৃথিবীতে পৌঁছে গিয়ে নবজন্মটি নিজে বাহার শত শত বংশের
পরে, তেমনি ব্রাহ্মসমাজ যে ঘটনা সম্পাদিত করে রয়েছে আরও, তাই বর্তমানে প্রকাশিত
হয়ে চলেছে স্থূল পরিণতির মধ্যে।

*

রাজ-সংস্কার, সমাজ, রাজ্য, পুলিশ, বিচারক, প্রতিষ্ঠান, নগর, আইন-কানুন, স্বাধীনতা-
নীতি, সৈন্যসামর্য হ'ল সব সাময়িক প্রয়োজন, আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে
কয়েক শতাব্দী ধরে। কানন, ভগবান আমাদের দৃষ্টি থেকে অস্তিত্ব হ'লেন। ফিরে যখন
আবার তিনি দেখা দেন তখন তাঁর সন্তো ও সৌন্দর্য, তখন সেই আলোকে এ সবই মুছে যাবে।

*

অন্তে মানুষের সত্যিকার দিবা-যবন হ'ল—আদিতেও যেমন—অশাসন—কিন্তু
মাঝখানে সে ভিন্নম সোজা আমাদের নিয়ে যাবে পরভ্রমের কাছে, তার রাজ্যের মধ্যে।

*

বাস্তব-সর্বত্র সমাজব্যবস্থার চেয়ে সমষ্টিসর্বত্র ব্যবস্থা স্থূলত শ্রেষ্ঠতর, যেমন ঈর্ষা ও
পরস্পর হত্যার চেয়ে সৌভ্রাত হ'ল শ্রেষ্ঠ; কিন্তু ইয়োরোপের যত সমাজ-তত্ত্বী ব্যবস্থা কার্যতঃ
প্রণয়ন করা হয়েছে, তার হ'ল যুগকাঠ, উৎপীড়ন আর কারাগার।

*

সমষ্টিতত্ত্ব যদি কখন সমলভাবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাকে বাঁড়াতে হবে
অন্তরায়ের বৈদ্য আর অসংকলের বিনোদকে ভিত্তি করে—জোর করে সম্মেলন আর কলে
বাঁধা বিভাগী একটা পৃথিবী-ঝোড়া প্রহসনে পরিণত হবে।

*

সমষ্টিতত্ত্ব সমাজের একমাত্র কার্যকরী প্রতিষ্ঠা হবে ব্যবহারিক বোধ্য। এ হল
বৃষ্টবর্ষ, বোসনের ধর্ম, পৌত্তালিক হিন্দুধর্ম যে স্বপ্ন দেখেছে সেই সাধুসন্তর রাজত্ব।

*

“স্বাধীনতা, মান্য, সৌভ্রাত”—উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছে করালী বিপ্লবীরা—কিন্তু

কার্যাত: একমাত্র “স্বাধীনতা”রই প্রচেষ্টা হয়েছে, একটুখানি সান্নাঘরি দিয়ে—আর সৌভাগ্য ? সে সৌভাগ্য পাপিত হয়েছে, সে হন বৈমাত্রেয় সৌভাগ্য, তত্ত্বের সৌভাগ্য। কখনও তার নাম দেওয়া হয় সনবার বা বোধ উদ্যোগ, আর কখনও বা ইউরোপীয় আভিসঙ্গ (কনসার্ট)।

★

ইউরোপীয় চিত্তাবলির পুরোধাবশ্ব বনে উঠছেন “স্বাধীনতা” যখন ব্যর্থ হয়েছে, তা হ’লে এস চেষ্টা করা যাক সান্নাঘর স্বাধীনতা অর্থাৎ ও নৃত্যকে একসঙ্গে যুগবদ্ধ করা যখন সম্ভব নয় তখন ধরা যাক সাব্যাক স্বাধীনতার পরিবর্তে। আর হাতুড়, সে ত’ অসম্ভব, হুতরাং তার পরিবর্তে এস আনন্দের গ্রহণ করি ব্যবসাগত বিভাবী, কিন্তু এতে এবারেও আনন্দের বনে হয় ভগবান প্রভাবিত হবেন না।

★

ভারতে সংঘবদ্ধ জীবনের ছিল তিনটি ধূর্ণ—গ্রামাণ্ডো, বৃহত্তর বোধ-পরিবার আর সন্যাস-আশ্রম। তিনটিই ভেঙ্গে গিয়েছে কি ভাঙ্গবার উপক্রম হয়েছে সামাজিক জীবনের অহংপ্রতিষ্ঠা ব্যবস্থার প্রচলনে—কিন্তু এও কি একটা প্রয়াস নয় যাতে ও-সব অসম্পূর্ণ আদর্শ ভেঙ্গে কেলে একটা বৃহত্তর দিব্যতার সনষ্টিত্বের দিকে হয় অগ্রগতি ?

★

বাষ্ট পূর্ণ-সিদ্ধি লাভ করে না যতদিন না ভগবানের কাছে সে নিভের বনে বা জানে সব সর্পণ করে দেয়। ঠিক সে-রকমে নানবজাতি যতদিন তার সব ভগবানকে না দিয়ে দেয়, ততদিন পূর্ণ-সিদ্ধি সম্ভব হবে না।

★

ভগবানের চোখে ছোট বলে কিছু নাই, তোমারও চোখে তবে ছোট বলে কিছু বেন না থাকে। একটা নীচ নির্বাণে আর একটা সাম্রাজ্য গঠনে ভগবান সনান মাত্রায় তাঁর শেখ-শক্তি প্রয়োগ করেন। তোমার নিভের পক্ষেও বিনাশী ও অক্ষয় রাজ্য হওয়ার চেয়ে নিপণ পায়ুকার হওয়া বহুতর জিনিষ।

★

যে কাছ তোমার জন্য নিশ্চিষ্ট তাতে তোমার সামর্থ্য ও সফলতা যদি কনই হয় তবুও তা একটা কৃত্রিম যোগাযা ও অনুকৃত উৎকর্ষের চেয়ে শ্রেয়।

★

কর্ষের উদ্দেশ্য ফললাভ নয়, তা হ’ল ভগবানের সেই নাশুত আনন্দ যা রয়েছে তাঁর আনন্দাবনে, আনন্দধর্মে ও আনন্দজীভনে।

★

ভগবানের অগ্নং এগিয়ে চলেছে বাপের পর ধাপে, নীচেরকার কোচাট ধাক ধরে,

তবে উপরকার কোটে উঠবার সত্য চেষ্টা কর। প্রথমে স্থাপন কর নৃত্য জাতিসমাজ সব, যদি কখন তুমি সবও পৃথিবীকে একজাতিসমাজে পরিণত করতে চাও।

*

একটা রাষ্ট্রজাতি (নেশন) একই রক্ত, একই ভাষা, একই ধর্ম নিয়ে যে তৈরী হয় তা নয়—যদিও এ গবে অনেক সাহায্য ও সুযোগ সুবিধা লাভ হয়। কিন্তু যেখানেই জনগণ মিলিত হয় রক্তের সম্পর্কে নয় কিন্তু এক আশুহা এক হৃদয়ভাব নিয়ে তাদের পুরুষানুক্রমিক একই উত্তরাধিকার রক্ষা করবার জন্যে, তাদের সম্মান-সম্মতিদের জন্যে একই ভবিষ্যৎ লুট-প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে, সেখানেই রাষ্ট্রজাতি স্থাপিত হয়ে গিয়েছে।

*

নেশন হ'ল ভগবানের এক পাসকেপ যখন তিনি তাঁর প্রগতির পথে পরিবারকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছেন—তাই ত' গোষ্ঠীর উপর, কুলের উপর আগন্তি হ্রাস হওয়া দরকার নেশনের যদি জনমগ্রহণ করতে হয়।

*

পরিবার, নেশন, মানবজাতি হ'ল বিষ্ণুর ত্রিপাদ, খাষ্ট্রের একক থেকে সমষ্টির এককের দিকে। প্রথমটি পূর্ণ হয়েছে, দ্বিতীয়টি স্ফূর্তভাবে পূর্ণ করবার জন্যে আনন্ড এখনো সচেষ্ট, তৃতীয়টির দিকে আনন্ড হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, তার গোড়াপত্তন স্বত্ব হয়ে গিয়েছে।

*

মানবজাতির বর্ধনানে যে শিক্ষা-লীলা তা দিয়ে স্বামী মানবীর ঐক্য সম্ভব নয়—তবুও যদি প্রমিত আশুহা থাকে, থাকে অস্ত্রাস্ত্র চেষ্টা তবে পুরুষারবস্ত্রপ সামরিকভাবে তার নিকটের কিছু গড়ে উঠবে না এমন কোন কারণ নেই। ক্রমেই এ রকমে নিকটতর হয়ে আংশিক সিদ্ধি ও সাময়িক সাক্ষ্য ধরেই প্রকৃতির অগ্রগতি।

*

অনুকরণ অনেক সময়ে শিক্ষানবিশীর জাহাজনাত্র—নৌ-অধ্যক্ষের পতাকা সে উড়িয়ে চলতে পারে না।

*

আয়হত্যা বরং ভাল কিন্তু সাক্ষ্যবস্তিত অনুকারীদের দলে ভিড়বে না।

*

জগতে গহন কর্ত্তের গতি। অবতার শ্রীমান যখন বলিরাখাকে হত্যা করলেন, আর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন থেকে সবুহ রক্ষা করবার জন্যে আপন মাতুল কংসকে নিহত করলেন, কে বলবে তখন তাঁরা যা করেছিলেন তা পাপ না পুণ্য? কিন্তু তবু আনন্ড অনুভব করি যে ভগবতভাবে উদ্ভূত হয়েই তাঁরা তাঁদের কাছ করেছিলেন।

*

৮

প্রতিক্রিয়া ক্রমগতিকে নিম্নত করে, ক্রমান্বিত করে, তার অন্তঃস্থ শক্তিকে ধ'রে বাড়িয়ে তুলে, পরিশোধন করে। দুর্বল অনসারধারণ এই সত্য দেখতে পায় না—তার হতাশ হয়ে পড়ে, বলের আর পৌঁছা গেল না বলে, যখন জাহাজ তারের স্বত্বের মুখে অসহায়ভাবে ছুটে চলে যায়,—কিন্তু জাহাজ ছুটে চলে ভগবানের যথানিষ্টি বশবের দিকেই—বদিও তা বৃষ্টির ঝাঝ আর সাগরের উত্তির পিছনে ঢাকা।

*

একচ্ছত্র রাজা, রাজক সন্ত্রাস্য আর অভিশাস্তকূল—এই তিনের সম্মিলিত যে স্বেচ্ছা-চার তার বিরুদ্ধে নানাব্যায় প্রতিবাদ হ'ল সার্বজনিকতায় (ডেমোক্রেসি)।*

* Thoughts and Aphorisms থেকে। অনুবাদক—ঈশদীপাঙ্ক ৩৩

বাসবদত্তা

[অনুবাদ]

শ্রীঅরবিন্দ

পঞ্চম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

(উজ্জয়িনীর আশ্রমস্থানের একোচ্চতর)

গোপালক, বৎস, বিকর্ণ,

নৃত্যে গায়ের নীচে অস্বাভাবিক, বাসবদত্তা ও অধা

গোপালক । বৎস, যদিও আমার মগজে গান শুরু করে দিয়েছে,
চন্দ্রিনা প্রাণিত করেছে আমার অন্তরঙ্গতা ।
এরকম সুহৃৎ ই তো
শ্রবণ আর দর্শনেত্রির উপর থেকে
পর্বাণি যেন প্রায় ছিঁড়ে যায়—
আর আমার স্তনতে পাই
বায়ুকেশী গজবর্ষের গান আসছে
আশ্চর্য জ্যোতির্ময় আকাশলোক বেয়ে ।
বৎস, তুমি এমন জীব
যাকে কাগাগার ধরতে পারে নি,
হাসিনুখে বীণা বাজিয়ে বিশেষে সে সুখ জনতার সঙ্গে ।

বৎস । আনাকে এখানে টেনে এনেছে
তোমাদের পাখি জ্যোৎস্না,
আর স্বয়ং তুমি গোপালক,
বিজ্ঞাপিতবান
আর বাসবদত্তা ।
তুমি আমার সঙ্গে সুধায় পান করবে
জ্যোৎস্নাতরঙ্গ কৌশলীতে ।

গোপালক । বৎস, কখন ?

বিকর্ণ, কোন আশা অস্থির তুত
তোমার পায়ে ভর করেছে আশ্রয় রাতে ?

বিকর্ণ । হুঁহা ! তাহলে অপেক্ষা করি একটু ।

গোপালক । কী জন্যে ?

বিকর্ণ । (কষ্টচর্চা করিয়া) কেন, নদীর পারিণাম নির্ণয়ের জন্যে

গোপালক । বাসবদত্তা কোথায় ?

এখানে আশ্রয়ের কাছে ডাক ডাকে ।
সে দূরে থাকলে আশ্রয়ের ভালো লাগে না ।

বিকর্ণ । আমাদের সঙ্গে সে রয়েছে পাছেই তলার ।

গোপালক । ডাক ওদের ।

বৎসরাম তুনি
আর বাসবদত্তা
আর আমি
এক পায়ে প্রেম পান করব,
এবং সুরাশ্রমে প্রতিজ্ঞা করব
চির-অচ্ছেদ্য বৈব্রী আশ্রয়ের ।
দিনগুলিকে একে একে বেশ ঠকিয়ে এলে তুনি,
অনল দীর্ঘশ্রী প্রেমিকবর ।

বৎস । এই দিনটিই শেষ ।

কাল থেকে পটপরিবর্তন ।

গোপালক । স্বর্গবর,

তুনি তোমার ছন্দকে সম্বত করিয়েছ ।
ওদিকে পিতা দিনে দিনে অধীর ও কঠোর হয়ে উঠছেন ।

কাজটা হয়ে গেলে
সব ঠিক হয়ে যাবে।

বৎস। এই দুঃখ ভগতে
সকলই নিজের নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে পারে না ;
তাদের আনন্দও সীমিত।
আমিও হাল ছেড়ে দিয়েছি,
দেখে তো তাই নবন হয়।
তুনিও সম্মত করাবে না তোনার জ্বরকে, গোপালক ?

গোপালক। কিসে ?

বৎস। এই ভোগ্যব্যালোকিত রাত্রির পরিণাম
আমি তার অনুসরণ করে যা ঘটবে তাতে ?

গোপালক। অক্রেমে প্রতিশ্রুতি দিলান।

বৎস। সব তাহলে নিশ্চয় সফল হবে।

(তোরাণে বিক থেকে বহুলিকার মধ্যে, ভক্তহারাভল থেকে অসারিকা,
যাওনতা। এবং অসার সঙ্গে দিয়ে বিকর্ণ বহুলিকার দিকে সাক্ষ্যের জগ
এদিকে এল।)

বিকর্ণ। সব সুসম্পন্ন ?

বহুলিকা। হারের কাছে অর্ধচেষ্টন লবা হয়ে তারা।

বিকর্ণ। আটপুঠে বাধা এবং
কঠোর করে রাখতে পারলে
সবচেয়ে ভালো হত।
বৎসকে সংকেত দাও।

অসারিকা। বহুলিকা, আজ রাত্রেই কি ?

বহুলিকা। কিসের কথা বলছেন, দেবী ?

অন্নারিকা । (বহুলিকাঃ কণ্ড আত্মনের টোকা দিকে)
বিকর্ণ অথারোহণে বেকচেছ আজ রায়ে ?

বহুলিকা । তিনি আজ রায়েই বেকচেছন বটে ।

অন্নারিকা । সে কিয়া কেউ যেন জানাত না পারে
যে সবন্ধিছুই আবার জানা ।

(আর সকলের কাছে সরিয়ে)

গোপালক । এস, পথচারী সব ।
না, আনরা পান করবার আগে
এই পানোথারটি তুমি আশীর্বাদপূত করে পাও
তোনার অনুপন সাধুস্পর্শে ।

অন্নারিকা । যারা পান করবে
তাদের হৃদয় যেন এক হয়,
মহৎ এবং প্রিয় হয় যেন তারা চিরদিন,
অস্ত্র অবশি, অস্ত্রবণ্ড পারে পায় সেন
শিবের অনুগ্রহ
এবং লক্ষীর আশীর্বাদ ।

গোপালক । বৎসরায়, এস পান কর ।
তিনটি হৃদয় বিশেষে এই পায়ে ।

অন্নারিকা । যে প্রধান পান করবে
সেই হবে অগ্রণী,
সেই হবে বহনসূত্র ।

গোপালক । এস যোন বাসবদত্তা, সকলের রাণী,
পান কর ।

অন্নারিকা । না, যেনন অস্ত্রে

তেমনি প্রেমে ও সৌভাগ্যে
রাণী হবেই তুমি ।

গোপালক । আনি শেষে ।

অঙ্গারিকা । কথায় বলছ তাই বটে,
আসলে তুমি বহর পুরোভাগে ।

গোপালক । প্রধান হোক আর শেষ হোক,
এই গ্রন্থীর মধ্যে স্থান পেলেই হল ।

অঙ্গারিকা । (বাসবদত্তাকে নির্দিষ্ট আঙ্গিকের দিকে)
নিম্নের আনন্দে ভুবে ভুবে বেওনা এই ঘেহনগী নাকে ।
গোপালক, গৃহে নিয়ে চল আনাকে,
তোমার সঙ্গে আনার কথা আছে, বাহা ।

গোপালক । চল ।

(উভয়ের প্রাণান্তের দিকে ধমন)

বৎস । সময় হল ?

মন্তুলিকা । ওই যে সামনে তোরণ ।

বৎস । প্রিয়া ! বাসবদত্তা ।

বাসবদত্তা । বৎসরাজ ! বৎসরাজ !
বন, আত্ম রাত্রির আকাশে কীপছে
এ কি জিনিস !

(বাসবদত্তাকে বৎস বাসবদত্তা কহল)

বৎস । তোমার অভিসার, তোমার সজ্জাগ বহু দূরে, সুপ্রিয়া ।
তোমার ওই পিতৃগৃহকে আনাও শেষ বিদায় ।

বাসবদত্তা । সর্বনাশ । এ কী পাগলাবি ?
নিরস্ত্র তুমি—
প্রহরীরা বধ করবে তোমাকে ।

স্বপ্ন । নির্ভয় হও ।
এস আমার বাড়ির মধ্যে—
উভয়ের দু'গল ভাগ্য হবে দু'গল বর্ষ আনাদের—
তুমি থাক নির্ভয়ে ;
আজ রাতে ভাবনার নেই কিছু,
করণীয়ও নেই,
ভধু রথের উপর আমার আনুসংগত হবে থাক
আর পোন দূর কোণাখীর কুন্তলম খেকে সমাগত মনয়ের
গুহন তোমার কুণ্ডিতকেশপানে ।

(বাসবদত্তাকে দূর হোরণের দিকে গমন ; অজ্ঞাতকর্তার পক্ষে চিকর্ণের সঙ্গে বোঝা)

বিকর্ণ । নীপুণীস, নীপুণীস ! সব প্রস্তুত ।

মহুলিকা । অহা ! অহা ! এখানে !

অহা । (টুটে এসে) আরে এসব কি ?

বিকর্ণ । এই বেগেটাকে বেঁধে রাখা উচিত নয় কি ?

অহা । বরং দিন না হকুম আপনায় ।

মহুলিকা । রামবোধের সামনে পারবে দাঁড়াতে ?

অহা । নিশ্চয়, আমার প্রিয় বালিকাটির জন্য
সব কিছু পারি ।
রাজা যদি আমাকে বধও করেন,
তবে যার জন্যে জীবন ধারণ করেছিলাম
তারই জন্যে বেঁচেছি ও রয়েছি জেনে যাব ।

বহুলিকা। যতক্ষণ না প্রাচীরের দিক থেকে
কোনোদল উঠে আসছে শুনতে পাও
ততক্ষণ নুকিরে থাক কুণ্ডবনে,
তারপর গুহে ফিরে
আবরকা করে।
এর আগে কেউ বেন ভোবাকে দেখতে না পায়।

অম্বা। দুবেল এই ঝোপে গা ঢাকা দেব আমি।
সব বিপদ পার হয়ে এসো তুমি।
তবে বিশ্রাম করে
আনাকে সঙ্গে নিতে পারলে না ?

বহুলিকা। কেন না !
যদি প্রাণে বেঁচে থাক
তবে কোন্‌দায়িতে অবশ্যই আনাম ভোবাকে।

বিকর্ধ। এস, সঙ্গে সঙ্গে এস।
তৈয়গেন কাছে সে।

বহুলিকা। আমি লাভ করব নৃত্তি আর বাসবদত্তা তার সঙ্গবুকট।

তৃতীয় দৃশ্য

(বাসবদত্তার ঘর)

বহাসেন, অম্বাটিক, রত্নবদ্য অম্বা ও একজন সঙ্গ রমণী

বহাসেন। এখানে সে নেই।
কী বিশ্রামভাউকতা।
তুমি যদি এর মধ্যে থেকে থাক
তবে শ্রাণ যাবে ভোবার রুদ্ধককে অনাহারে
কিনা শ্রাপদের সুখে ছিনুভিনুমেহ হয়ে।

অথ। আবার বসন্ত।

অত্রাণিকা। রাজা, নারীহত্যা দ্বারা
আপনি আপনার আত্মাকে কলঙ্কিত করবেন ?

বহাসেন। গতি বটে ;
তুচ্ছ জিনিসটাকে পিষে মারবার কি প্রয়োজন।
সব বাগান বোঝা হয় নি ?
এখানে এত দুঃসাহসে বুকে বেড়াচ্ছে
কারা এই সব জীবদেহ ?
বন্দী করতে পারলে
তারও মৃত্যুদণ্ড।

অত্রাণিকা। বন্দকে দারুণ বন্দতর করে তুলবেন,—
এট যা হয়েছে তা যদি বন্দই হয় ?

বহাসেন। কী বলছ ? এ বন্দ নয় ?
আবার বংশ অপমানিত
আবার গর্ভ ধুলায় পদদলিত ;
মর্গ এই বহাসেনের দিকে তাকিয়ে
সবস্ত দেশ আত্ম উপহাসের হাসি হাসছে,
মার কন্যাকে তার সুবর্ণনগরীর এবং অসংখ্য প্রহরীর মধ্যে থেকে
কেড়ে নিয়ে চলে গেল এক নিভান্ত স্কুবার বালক।
এরপর কে আর আবার সন্ধান করবে ?
কে পূজা করবে ?
কে নামবে আদেশ ?
কে ভয় করবে আবার উন্নয়নকে ?

অত্রাণিকা। কোশাধীরাও পানন করেছে আর্ববর্ষ,
এতে আপনার কন্যারও এজুটুকু মানহানি হয়নি,
তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়ে।

বহাসেন। ও-বর্ষ আবার কাছে অশুশ্য।

আমর ইচ্ছা পূর্ণনিত ;
 আমার গৌরব রক্ষা করা এবং
 তার উপর আক্রমণের প্রতিবিধান করাই কাতর
 উদয়নের মৃত্যু ছাড়া পতায়র নাই ।
 আর সে যদি তার রাজধানীতেও গিরে পৌঁছায়
 তবু আমার সেনাবাহিনী বহুনায়ে ধাবিত হবে
 এবং তাকে অগ্নিনিষার নিশ্চিত করে দেবে,—
 উদয়নের অপমানিত ঋণবিধিত্ত শব্দেহের তা হবে চিত্র ।

অজারিকা । কিম্ব নিজেস বেতের ক্রমটি কি তুলে গেলেন ?
 তার কল্যাণ তার অর্থ
 আপনার কাছে কিছুই নয় ?

বহাসেন । আমার কন্যা সে ?
 ত্রাণনে পিতার অপমান দেখে
 বাঁচতেও সে চাইবে না ।

অজারিকা । আপনি ননে করছেন
 বংশ তাকে বাহবন্দী করেছে
 তার ইচ্ছাব বিকল্পে ?

বহাসেন । তাই যদি হয়,
 যদি সে আমার ইচ্ছা, আমার রক্তের শত্রু হবে থাকে
 তবে তার চোখখুটি দেখুক
 তাদের রাজস্রোহের স্থল বেড়ুটির উপর
 কত কত বর্ষাকালক বিজ্ঞপ হানে রসভঙ্গ করে ।

অজারিকা । আপনি কি আর বৃপতি
 আর তার যেখান এভাবে ?
 তবু নিজের জন্যই ভালোবাসতেন নিজের কন্যাকে ?

বহাসেন । চূপ করা, রাণী ।
 তবু সিংহকে উদ্যাক করনা ।

- অম্বারিকা । বাঘ বরং,
যদি এরকম ননোভাব নিয়ে থাকেন ।
(ভৈরবী বিগত হস্তীম্বর)
- বহাসেন । তুই এলি, দাসী, এত বেরী করে ।
- কিরাতী । মহাবাহু, বাগানের সর্বত্র তনু তনু করে
খোঁজা হয়েছে ।
দক্ষিণ দুর্যয়ের নীচে
রক্ষীয়া মুখ-বাঁধা পড়ে রয়েছে ;
সব শূন্য ।
- বহাসেন । গোপালক কোথায় ?
সেও কি অবসর স্থাপন করছে ?
- কিরাতী । প্রাকারের প্রান্ত থেকে এসেছেন এক সেনাপতি ।
- বহাসেন । বেশ । আনি তাকে ।
(অবসর সেনাপতিক দিয়ে কিরাতী । পুনঃপ্রবেশ)
কী ব্যাপার ।
- সেনাপতি । বৎস পানিয়েছে ।
হস্তরক্ষীরা কেউ আহত কেউ নিহত ;
হাসবদত্তকে নিয়ে বিজয়ী বৎসের রথ
ছুটে চলেছে জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরের উপর দিয়ে ।
- বহাসেন । দুর্ধ্ব দূত ! ছোট পিছনে, ছোট পিছনে ।
- সেনাপতি । রেত নিম্ন সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে আপ্রাণবেশে
ভার অনুসরণ করছে ।
- বহাসেন । উজ্জয়িনী স্বর্কারে আবার কে-সব সৈন্য আছে
বৎসের অনুধাবনে তাদের একযোগে কর নিয়োগ ;
ডাক, বিকর্ণক ডাক ;

কুমার তার প্রথম বুদ্ধজয়ের গৌরব নিয়ে আত্মক,
বংশবাহকে—তার ভগ্নীর সন্তানবাহকে—
বধ করে।

সেনাপতি। মহারাজ বেন আমার কথাই শোধ না গ্রহণ করেন।
বিক্রমের রথই তার ভগ্নীকে বধে এনেছিল
এবং সেখানে রথী হিসাবে ছিল বিক্রম স্বয়ং।

মহাসেন। (কিষ্কর্যে একটু থেমে)
আমার বাকীর সকলে,
আমার নিজের সকলেই বিজ্ঞোহ করেছে
আমার বিরুদ্ধে ?

সেনাপতি। রাজকুমারী বহুবলী—
আপনার কন্যার সহচরী—
বংশবাহকের পাশে রয়ে
নাগান ধরে অশুচাননা করছিল।

মহাসেন। তাকে শোধ দেই না,
তবে শান্তি হবে নিদারুণ।
সেনাপতি যাও।
আমার স্বয়ং সব প্রস্তুত কর;
ছুটে চলুক সবাই সবেগে,
পলাতকদের সদ্যকৃত রক্ষা-রেক্ষা
পেয়ণ করে বাবিত হোক।

(সেনাপতির প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে গোপালকের প্রবেশ)

গোপালক, আমার সৈন্যদের নেতৃত্ব নাও তুলি;
অনপনয় কলঙ্ক ঘটবার আগে
কিরিয়ে আন জোয়ার ভগ্নীকে,

আর জোয়ার পিড়ার মহাক্তের পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করে
কিরে এস না।

গোপালক । পিতা, তুমি আমার কথা ।
 যদিও এ ব্যাপার ঘটেছে
 আমাদের পরিকল্পিত চক্রান্তের বিপরীত,
 তবু এতে কোনো অসম্মানের স্পর্শ নাপাশে নি;
 বীরের মতো
 আর এক বীরের পুত্রের সঙ্গে
 বংশ করারত করেছে এই কিশোরীকে ।
 আমরা চেয়েছিলাম তাকে অনুগতরাজ করে রাখতে উৎকোচ দিয়ে,
 তার চোখের সামনে আমাদের রক্তটির প্রলোভন দিয়ে ;
 রক্ত সে ভোগ্য বলে গ্রহণ করল,
 নিজের স্বাধীনতাও রাখল অক্ষুণ্ণ ।
 জাহাঙ্গীর এই জুয়াবেলা বেছে নিয়েছিলাম আমরা,
 এবং যখন তাতে হেরে গিরেছি
 তখন আহ্ন উদার-হৃদয় জুয়ারীর পরিচয় নিই আমরা,
 বন্ধুর মতো বিধাতার রূপ দান গ্রহণ করি,
 সাধারণ প্রকৃতির মানুষের মতো
 যেন কোভজর্জর চিত্রা পোষণ না করি ।
 সম্মতি দিন এই নিলনে,
 বংশরাজকুল আর আমাদের মধ্যে আনুগ সঙ্গীতি ।

মহাসেন । দেখছি সকলেই অন্তরে অন্তরে
 আমার মর্যাদার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে ।
 তুমি অবতীর সুবরাজ,
 আমার মনে আমার পরেই তোমার স্থান ।
 তুমি বাধ ।
 যদি উজ্জয়িনীর আর আমার সীমান্তের মধ্যে ওয়া খুত হয়
 তবে আমার কঠোর সংকল্প গিয়ে ওদের বিদ্ধ করবে ।
 অন্যথা, স্বাধীন বিজ্ঞাপনে গিয়ে যদি পৌঁছয় ওয়া,
 তাহলে তোমাকেই সন্ধির শান্তির ব্যবস্থা করতে হবে ।
 বাসবদত্তার ব্যবতীর সাংসারিক জিনিস নাও,
 এই মেয়েটিকেও সঙ্গে নাও
 আর কন্যার ব্যবতীয় ধন-দৌলত অন্যতর ।

একে কোণারী পৌঁছে দেবে নিজে—
পথ দেখিয়ে হোক
কিন্তু এর পথ অনুসরণ করে হোক।
তবে বাসবদত্তা রাণীকে প্রভিষ্টা না হওয়া পর্যন্ত
সে-দান ত্যাগ করে আসবে না।
উদয়নের পাশে বসে একমাই সে স্নানচালনা করুক;
একমাত্র জাহলেই আশাদের দুই স্নানোত্তর নবো
শান্তি থাকবে।

গোপালক। আর বিকণকে ফিরিয়ে আনব আমি।

মহাসেন। পুত্র, কখনো না।
বংশ ও স্বপুত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীকে নির্বাসিত করলাম।
বংশরাজকে সে বরণ করেছে,
তারই সঙ্গে থাকুক গিয়ে,—
আনার শত্রুর দাসত্বপে।

(প্রধান ও বাকীরাই বাকীরাই। গোপালকের দ্বারা অজ্ঞান সন্দেহভাজন।)

অজ্ঞানিক। ওঁর বাগকে সময় দিলে
আপনিই নিতে যাবে।
পিছুদায় যদি না-ই আনে
আজ্ঞাস্বামী ওঁর বিকণকে ডেকে আনবে।

গোপালক। সবর ওছিয়ে দাও তার বনসৌন্দর্য জ্বালাসত্তার।
যত ক্রত পারি হওয়া হতে চাই—
পাছে দুর্ভাগ্যক্রমে ধরা পড়ে
অনিষ্ট হয় বংশের।

অজ্ঞানিক। নিশ্চিত থাক, বাছ।
এই দু'জন একত্রে সশস্ত্র থাকলে
এদের বিরুদ্ধে বঁড়াতে পারে
এমন সৈন্যদল এখনো নর্তো জন্মায় নি।

[জনশ:]

শ্রীমা প্রসঙ্গ*

ডক্টর কে. আর. শ্রীনিবাস আরেক্সার

(১)

কালের দীর্ঘ গতির সঙ্গে সঙ্গে এইসব আলোচনাগুলিতে দেখা দিল আবও আগ্রহ, আশুনা ও সংশ্লিষ্টতার মাঝে যে বৃহৎ ব্যবধান তার উপর সেতু-বন্ধনের এবং আন্তর ও বহির্জীবনের পূর্ণবিলনের এবং ব্যক্তি-মানুষকে বৃহত্তর সমষ্টিতে সামাজিক কাঠামোর প্রতিষ্ঠিত করার এক তীব্র ইচ্ছা জাগল অধ্যাক্ষ-অনুভূতের মধ্যে। জনশঃ শ্রীমার নিম্নোক্ত অল্পপুষ্টিতে কুটে উঠল মানুষের ভবিষ্যৎ ভাগ্যের দিক এবং সে ভাগ্যকে ক্রম সংশ্লিষ্ট করার কাজে তিনি কি অংশ নেবেন তাও স্থির করে ফেললেন। ১৯১২ সালে লিখিত এক স্বাক্ষরকলিপিতে জানানেন যে—

“সার্বজনীন যে আদর্শ আমাদের লাভ করতে হবে তা হ’ল ক্রমশ্চুট বিশ্বজনীন সুখনার আরম্ভ। আর এই আদর্শকে সার্থক করার উপায় হ’ল, পাখির ছগড়ের পক্ষে, ব্যক্তিগত জাগরণের বধা দিয়ে মানবীয় একক সংসাধন করা এবং সেই একই অধিতীরন বা অন্তরের ভগবান, তাঁকেই ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ করা।

অন্য কথার সকলের অন্তরস্থ ভগবানের রাজ্য আবিষ্কার করে এক একক সৃষ্টি করা।”(১)

ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে ঘটতে হবে এক বহান পরিবর্তন—এক পরম ভ্রমাত্তর ; এসব স্তর আবার এক পরিপূর্ণ সর্বস্বভার সঙ্গে মিলে মিশে অথও হয়ে থাকবে। শ্রীমারবিশেষ একটি কবিতায় রাজাকে সনির্ভর বিনতি করছেন বেকপ্রাপ্তিক হঠা—

এই নর্তকের উপর তার স্বাক্ষর কর। তিনি সামিয়েছেন
বিরাট পরম্পরা ধরে

এই নানা ভুবন জেতারই জন্যে, মানুষের সফলতা লাভের
উদ্দেশ্যে এই প্রবল রাজস্ব গড়ে তুলতে,

যে মানুষ উৎসাহ তাঁর আদর্শে পৌঁছাতে। নিম্নের মানবী শক্তি পূর্ণ করে জেল,
পূর্ণ সার্থক কর বিশ্বমানবকে। (২)

* On the Mother—Chaps—VII & IX

1 Words of the Mother, (1946) P. 5

2 Collected Poems & Plays Vol. I P. 162

বাঈ সমষ্টিকে প্রভাবান্বিত করে এবং সমষ্ট ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে; ভাই ব্যক্তি রূপান্তর কে গড়ে তুলতে হবে অনুপূর্বক ব্যাধি ধরে। ব্যক্তির আত্মর সম্পূর্ণতার নির্ধারণক হ'ল ভগবানের সাথে উত্তরোত্তর একত্ব বৃদ্ধি কিন্তু তার অর্থ নয় জীবন পরিহার করা, পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। সমষ্টের একতা ও শক্তির উৎস হল ব্যক্তির আত্ম-সম্বন্ধিত একতা ও গোপালিত শক্তি। গ্রীসি বলেন, "সত্যকার জীবনোন্মুখি, মানুষকে যা নিয়ে চলে তার অন্তর্গত অধিকার স্বপ্নের অভিমুখে, তা কোন বাহ্য উপাসনের, কোনো পার্থক্য সৃষ্টি অথবা সামাজিক পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে না; ব্যক্তির সর্বস্বাধীন—আত্মাত্মিক ও গভীর উৎসর্গভাই যথার্থ উন্মুখি, তাই পারে বর্তমান সকল অবস্থার ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটতে, মুগ্ধ সৈন্যকে পারে প্রশান্ত এবং স্বাধীন পরিতৃপ্তিতে পরিবর্তিত করতে।" (১) যেনার ব্যক্তিগত বিন্দুকে বলেন—

শ্রুতিমত, তেনার অন্তরে ছাড়া বিশুদ্ধত্ব আর কোথাও নেই। রূপান্তরের ক্ষেত্রে বয়ে চলে এ জীবন। চির বিনীতমান বাহ্যবস্ত্র যা কিছু তা মুগ্ধ হয়ে যায়। (৪)

আনোই তাকে আনোকে এবং জীবন্ত সর্বজীবের জ্বরে প্রস্রাবিত দিব্য আলো এক অভিনু,—“এর থেকে প্রমাণ হয় সকলের মূল—একত্ব, তাদের পরস্পরের মধ্যে সংহতি ও সৌভাভ্য।” (৫) মানুষ যদি ব্যক্তিগত বুদ্ধি জয়ী হয় তাহ'লে বেশ জনকতক অধ্যাত্মভাবে মুক্ত ও আনোক্ত পুরুষ ও নারীর সম্মেলন সম্ভব এবং তাহ'লে কার্যকর সমষ্টিগতভাবে “নব-জাতির, ভাগ্যবত সন্তানের জাতির, প্রস্তুতনের জন্য অনুকূল কোন এক স্থানে আদর্শ সনাতন” (৬) গড়ে তোলা যাবে।

এই হল আশা, এই হ'ল সর্বপ্রণালীর নয়া। ভিতরে আনোর উদ্ভাস হবে সেই মূল ভিত্তি যা বহন করতে পারবে তাবী দিব্য সনাতনের, অতিমানব সনাতনের, ভগবানের অগাধ্য সন্তানদের তার।

যদি আত্মর উদ্ভাস, পূর্ণ রূপান্তর হয় প্রধান লক্ষ্য, তাহ'লে তাকে মুগ্ধতে হবে তাহেই সমষ্ট ও নিবদ্ধ থাকবার লক্ষ্য হিসাবে নয়, বরং আর এক পূর্ণতর পরিণতির উপায় হিসাবে—এই সকল জ্যোতির্জ্বালিত সিদ্ধ ব্যক্তিগত কেন্দ্র থেকে জ্যোতি বিকীর্ণ হয়ে পরিবেশেরও ঘটবে রূপান্তর। মানুষ যেনন আছে তা নয়, অহংকাপূর্ণ অসার বস্তুর পিও যা পাঁচেক-চত্বের দাস বিভ্রম নয়, মোত, কয়, অশক্তির আত্মদাসরত উত্তরাধিকারী নয়, বরং মানুষ যা হয়ে উঠবে তাই—যে মানুষ অস্তরের মুগ্ধ সেবকে করে পেয়েছে—তাইই সংযোগ স্থাপনা করবে তেনার সহধর্মীদের সঙ্গে যারা এমনই মুক্ত পুরুষ—উভয়ের মধ্যে রচিত

3 Words of Long Ago p. 90

4 Translated by J. B. Leishman & Stephen Spender

5 Words of Long Ago P. 89

6 Words of The Mother P. 6

করবে এক সত্যক গোবন্দা। এই অধ্যায়ভাবে আত্মজয়ী ও মূল পুণ্য ও নানীর জগতে পরম্পরের মধ্যে সোমাসুখির মাধ্যম হবে আত্মার প্রসারিতা ও বিশ্বব্যাপিতা।

“অধরত্ব ভগবানের সান্নিধ্য যখন তুমি একান্ত তখন সকলের সঙ্গে তাদের অস্ত্রের গভীরে মূল সেই তৎপুরুষের মাধ্যমে তারই নব্য দিগে সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে তোমাকে। তখন থাকবে না কোন আকর্ষণ, কোন বিকর্ষণ, থাকবে না কোন অনুগ্রহ, কোন বিরোধ, তখন শুধু তার কাছে যারা, তারও কাছে হবে তুমি। যারা তার থেকে দূরে, তুমিও হবে তাদের থেকে দূরে।

“কথা তবে এই : সকলের মধ্যে আনন্দের হ’তে হবে—ক্রমান্বিত ব্যাঘ্র—
পারিত্রিক নানসিক তথা আধ্যাত্মিক একটা পরিপূর্ণ সম্বন্ধাঙ্গীর্ণ ক্রিয়ার দ্বারা আনন্দ, সকলকে এনে দিতে হবে এমন একটা সুযোগ যাতে তারা বুঝতে পারে গ্রহণ করতে পারে ভাগবত জীবনের পথ।” (৭)

তাহলে এই হ’ল অসম্ভাব : বর্তমান সীমাবদ্ধতা সবেও পাবিল জীবন থেকে পলায়নও থাকবে না, তার প্রতি বিশ্বাস-বাতকড়াও করা চলবে না। যখন অস্ত্রের উন্মুক্তিতে নিপ্ত হয়ে থাকবে বা যখন উন্মুক্তি সম্পূর্ণ হবে, তখনও কর্তব্যে পরিহার করা চলবে না। এমন কি ‘বহু’কেও ‘বোধিসত্ত্ব’ দিতে হবে, কষ্টের ‘অর্থতা’ স্বেচ্ছায় পরিভাষ্য করে দিতে আসতে হবে অনুগ্রহের মাঝে, তাহলেই মধ্যে যারা মূলত তাঁরই নত বোধিসত্ত্ব অথচ ধুবীরমান পার্থিব জীবনচক্রের মূখ্যে অত্যাধিক ঝাঁপ।

(২)

বিরাট আন্তর পরিবর্তন ও উন্মুক্তির স্বাক্ষরপ্রাপ্তি এসে—অধ্যায়ের তাৎপর্য্য তা এক বিশুদ্ধ ও রূপান্তর—আসন্ন আন্তর পরিবর্তনের প্রস্তুতির জন্য ও আধ্যাত্মিক গঠন ও উন্মুক্তির গতি স্বাক্ষরিত করার জন্য শ্রীমদ্রত্ন দলগত আলোচনার পরিবর্তে হুঁজলেন অন্য উপায় যা কীতিমূলক প্রচারের চেয়ে অনেক বেশী জীবন্ত ও সূক্ষ্ম। আধ্যাত্মিক উন্মুক্তির জন্য শ্রীমদের এই নব বস্তু—নব বস্তু এই অর্থে যে তা বারংবার ও পূর্ণভাবে কার্য্যকরী করা হয়েছে—তা হ’ল তাঁর ধ্যান ও প্রার্থনা। অধ্যায় অমুখুর কাছে এই সকল “প্রার্থনা” তত্ত্ব বস্তুপ্রাপ্তি বা স্থিতির উদ্দেশ্যে মানবী ত্রিকাপ্তি নয়—বেবন, ভোট বা পরীক্ষার সাফল্য, বাণিজ্যে সন্মতি, দৈহিক কষ্টের উপশম ইত্যাদি। প্রার্থনার গভীরত্বের উদ্দেশ্য আছে, নানাবিধ স্বেচ্ছাভিচার শক্তি আছে, আর তাই অধ্যায় এতদূর পরিপূর্ণ যারা, যারা অমুখুর নক্সা সচেতন, তারা আধিতোড়িক শক্তিকে প্রার্থনার প্রভাবে যারা প্রচালিত করে। বাস্তবিকই প্রার্থনা এক অবর্ণনীয়

সঙ্গীত বা তিনটি উদ্ভাত স্বরের সনস্বরে উদ্গীত—আরাধনা, সানুভা, সহযোগিতা—এবং এই প্রার্থনাপূর্ণ আনন্দের তরঙ্গ জ্ঞানতে পারে।

“সর্বপ্রথম, অনৌকিক ভগবৎ সদ্বস্তর দিকে আমাদের ব্যক্তিগত প্রবেশাধিকার ও আন্তরতা, তারপর এই সত্ত্বা প্রবেশাধিকারের জন্যই অনৌকিক ব্যক্তির হয়ে উঠার সকল সত্ত্বাবিনা ভগবানের প্রয়োজনীয়। সর্বশেষে এই কারণেই আমাদের সকল ক্ষমতাই আরোপ করা হয় অন্য সকল ব্যক্তিস্বের উপর। কারণ এই সব আরাধনার অবস্থাই আত্মকে স্বর্গীয় দ্বার খুলে দেয় এবং তার দ্বিবা ইচ্ছাবক্তি ও ভালবাসা আরও বেশী করে অধিকার ও শাসন করে ও এক শ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয় পরে যা রূপান্তরিত হয় এক অন্তরঙ্গ সহযোগিতা, সীমানাীন উদ্ভাসপূর্ণ শক্তিতে। যে আত্মা দৈবের পূর্ণ আধার, সহজ কথায় সে অশেষ, কারণ তার সকল কর্মই দিব্যপ্রাপ্ত হয়।” (৮) কবি কোনরকম যত্ন করেন—

ভরুণী সন্যাসিনীর বক্তা,

নিরাতরপ রিক্ততার ঘেরা অপরাধ।

তার সর্বদা প্রাধনা, প্রাধনা স্থতির মাঝে।

তিনি এই অবস্থাকে বর্ণনা করে বলেন যে এ হ'ল প্রাধনার মধ্যেই ভগবানের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সহযোগ। অব্যাহত অনুগ্রহ কাছে শয়না হল প্রাধনার গভীরতা ও তার এলাকাকে প্রসারিত করা, জগতের সাময়িক বিচ্ছিন্ন, অণু আবেগকে আত্মার দ্বারা, অচঞ্চল সর্বব্যাপী উপাধান করে তোলা, যা সূক্ষ্মভাবে সকল কর্ম, সকল আনন্দ ও দোষ, ছন্দ এবং বনের শতধারাকে প্রভাবান্বিত ও রূপান্তরিত করে। প্রাধনাকারী ও প্রাধনার অনির্বচনীয় বস্তুর মধ্যে একটা মাংসখ্যোগ আছে। শ্রীঅরবিন্দ বলেন “যে বরণ করে অসীমকে, অসীম তাকেই বরণ করেন।” (৯) ডাঃ ইংগে চতুর্থ শতাব্দীর ইংল্যান্ড গোষ্ঠী মরউইচের জুনিয়ানার Revelations (রেভেলেশন্স) থেকে যে কিয়দংশ উদ্ধৃত করেছেন তা খুবই অর্থপূর্ণ

“আমাদের প্রভু আমাদের বলেন, ‘আমিই তোমাদের প্রাধনার মূল কারণ; প্রাধনতা; এ আমারই ইচ্ছা; তারপর আমিই তোমার মধ্যে ইচ্ছাকে প্রবুদ্ধ করি, পরে এই আবেদনকে সন্তোষিত করি এবং তাতেই তিনি জ্ঞানতে পার প্রাধনা। জাহলে এ কেনন করে হতে পারে যে তোমার মধ্যে বিনতি আসবে না?’ যা কিছুই জন্মে করুণার ঈশ্বর আমাদের প্রাধনা করান, তা তিনি যুগযুগান্ত আগে থেকে নিজেই আমাদের দিয়ে রেখেছেন।” (১০)

প্রাধনার সময় আত্মা দুটি দাড় তুলে ধরি—স্বচ্ছার এবং তা প্রত্যক্ষ; তবুও “এক-মাত্র সত্তা হল যে এই সর্বব্যাপী ঈশ্বরই তাঁর গোপন বিন্দু চাপ দিয়ে মানুষের মধ্যে ইচ্ছাবক্তি

৪ Evelyn Underhill, “Man and the Supernatural” (1927) Pp. 204-205

৯ The Synthesis of Yoga, Part 1, P. 2

২ Christian Mysticism (1935) P. 204

ও ভালবাসার প্রতির সর্বপ্রথম আনোড়ন আনেন।” (১১) স্বতঃস্ফূর্ততাই যথেষ্ট সত্য। কিন্তু তাই একান্ত বা চূড়ান্ত সত্য নয়। প্রার্থনার ‘আমাদের’ ব্যতীত তুনে যদি, আমরা এসব ফল নিবেদন করি—কিন্তু বাস্তবতাই ও ফলগুলির কি তাঁর থেকে পৃথক কোনো অস্তিত্ব আছে? যোগীদের প্রিয় একটি পরিচিত উপনার উপাধান করে সেন্ট তেরেসা বলেন, আমাদের আত্মা হল যেন একটা অকথিত ও উদার উদ্যান, আগাছার জলজলাকীর্ণ; ভগবান আগাছা উপড়ে কেনেন এবং তারপর আমাদের প্রার্থনার জলধারা দিতে হবে পাছে ও ফলে। এই প্রার্থনা, এই আধ্যাত্মিক আহাৰ্য্য, চার প্রকারের : গভীর কূপ থেকে তুনি জল টেনে তুলতে পার ; চাকার চারদিকে ধাঁধা বালতির সাহায্যে জল তুলতে পার ; একটি নানা বা জলধারা বাগানের মধ্যে দিয়ে বইয়ে দিতে পার ; কিংবা আকাশবাসী বৃষ্টিকে ডাকতে পার। কোন বুদ্ধিমান নানী এসব উপায়ের কোনটিকে অবজ্ঞার পরিহার করবে না, কারণ সবগুলিরই উপকার আছে, কিন্তু আকাশ থেকে বর্ষণই অন্য সবগুলিকে সার্থক করে, তাই এই উপায়টিই হ’ল সবচেয়ে বেশী ফলপ্রসূ ও অনুভোজন।

ধ্যানের নিয়ন্ত্রণ-রীতি যদিও অন্য প্রকার তবু তার সঙ্গে প্রার্থনার গাঢ় যোগ আছে ; তাদের লক্ষ্য ও কর্তব্যপ্রকৃতি অনুপূরক—তারা একযোগে মানুষকে দেবত্বলাভে ও ভগবানকে মানুষের তনুতে নেনে আসতে সহায়তা করে, মানুষ ও ভগবানের মধ্যে অপূর্ণ নিষিদ্ধ-আবীর্ভ-তার সম্বন্ধটি গড়ে তোলেন। তাতেই ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে আসান প্রদানের ভাব দৃঢ়ীভূত হয়, আর দৃঢ়ীভূত হয় পূর্ণ ত্রৈলোক্য ও স্থির প্রোচ্ছল হৃদয়বোধ।

“কৃত্রিম জীবনের সঙ্গে তাদের জন্মে নেনে এসে বিলিত হতে হয়, মানবাত্মা যে আদিম বিষম-বিলীন পূজার বসেছিল, তাকে এবার তার স্বভাব, স্বত্বনি জয় করতে হল। এক অজুত ও গভীর আত্মীয়তা স্থাপনা হ’ল...এখানেই নতুন এবং ঘনিষ্ঠ, জীবন্ত ও স্বল্পভাষিত ক্ষুদ্রমানবসত্তার সঙ্গে বর্তমান ও অসীম সাধারণ—মানুষের হৃদয়ের সীমিত স্ফেটনে তার বুদ্ধির নাগালের বাইরে ‘নিষিদ্ধ পরনের’ সঙ্গে এক বিলীন সাধনে প্রার্থনার রূপান্তর ঘটানোর কতখানি ক্ষমতা তা স্পষ্ট দেখা যায় মানুষী ব্যক্তির আধারে।” (১২)

তাই প্রার্থনাকে বলা হয় দান—জা অসীমের সাথে বাস্তব ঘনিষ্ঠতা ও অনুকম্পাপূর্ণ ধ্যানমগ্ন একতর জীবনের সম্ভাবনাকে অন্বেষ করে তোলে, জা একটুও অসঙ্গত নয়। তবে, “প্রার্থনা”র সঙ্গে “ধ্যান”র যে কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে—সে সম্বন্ধে বেশি কোন অকাটা নিয়মের বাড়িবাড়ি করার প্রয়োজন নেই—যা স্বরূপ রাখা বেশী প্রয়োজন জা হল ধ্যান ও প্রার্থনা এন্ট্রি আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

11 Evelyn Underhill, “The Golden Sequence” (1932) P. 150

12 Evelyn Underhill, “Man and the Supernatural” Pp. 216-217

মহামানবের সাংগরতীরে

(ঐশ্বরবিশ্ব অবলম্বনে)

সমগ্র বন্দোবাসাধ্যায়

(৬)

ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি আমাদের দেশে এতই প্রাচীন যে এর বয়সের গাছ পান্থর দেই, এর ইতিবৃত্ত জানতে হলে মহেত্তোদোড়ের মাটি খুঁড়তে হয়। বৈদিক সভ্যতা নাকি তার পরের যুগের। তর্কের ঝাতিরে ধরে নেওয়া বাচ্ কথাটা সত্যি। প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে মহেত্তোদোড়ের মাটির তলায় কোনো রাজারাজড়ার সন্ধান পাওয়া গেছে কি? বহুদিন যাবৎ পণ্ডিতেরা এ নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন নি। সম্ভ্রান্তি একজন শুনিছি আবিষ্কার করেছেন—পিগটের “প্রাগৈতিহাসিক ভারত” উইল্যা—মহেত্তোদোড়ো সভ্যতার নিদর্শন বোঝানে বোঝানে পাওয়া গেছে সব যথার্থতাই এমন একটা সাদৃশ্য আছে যে হযতো বেকালে সমস্ত সিদ্ধান্ত-স্বাপী এক বিশাল সান্নাধ্য ছিল কোনো এক নান না জানা একচ্ছত্র সন্ন্যাসের বশবর্তী। কথাটা অবশ্য এখনও “হযতো” পর্যায়ের আছে, মনে হয় থাকেবেও বেশ কিছুদিন, অন্ততঃ যতদিন না সঠিক প্রমাণ দাড়ে মহেত্তোদোড়োতে যারা থাকতো তারা কারা, তাদের বয়স বেদের চেয়ে বেশী না কম, আর যদি বেশীই হয় তো দাঁড়া সেই সান্নাধ্য গেল কোথায়। কারণ ঋগ্বেদে অথর্ববেদের যুগে কোনো একচ্ছত্র সন্ন্যাসের বশবর্তী এখনও তো পাওয়া যায় নি। বেদে যাদের সন্ন্যাস বলা হয়েছে তারা কেউ মানুষ নন, সবাই বড় বড় দেবতা, ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি ত্রিপুরার দল।

অতএব ভারতের রাজ্যবাবস্কার আলোচনা আপাততঃ বেদের যুগ থেকেই আরম্ভ করতে হয়। বেদের যুগ ঠাকুরদেবতার যুগ। বেদের মধ্যে দেবতারা অনেকখানি যায়গা জুড়ে আছেন। কারণ দেবতাদের বাদ দিলে মানুষের এক পা চলে না। বেদে অবশ্যই পাণ্ডিত্য রাজার উল্লেখ আছে। কিন্তু ঋষিদের মতে সত্যিকারের রাজা হলেন দেবতারা। অতএব প্রথমে সেই দেবরাজদের একটু সন্ধান নিতে হয়। কে তাঁরা, কি তাঁদের নাম, কি বস্তু তাঁদের প্রতিপত্তি?

ঋগ্বেদ এক জায়গার বলছেন (১০।১২।১।৩)

যঃ প্রাপন্তঃ নিমিষতঃ মহিষ্টা

এক ইং রাজা জগতঃ বজ্র

য ইন্দ্রে অগ্ন্য দিপদঃ চতুশপঃ।

“যিনি নিজের বহিষ্যত সন্যস্ত ভগবতের একাধিপতিগাছা হয়েছেন, অগতঃ বড় প্রাণী, বড় চকুগ্রান, চতুর্শব্দ বা হিপন, সবায়ের যিনি রাজা”—তিনি প্রজাপতি ত্রিপ্রথাগত। অন্যত্র যেখি অন্য নাম—কখনও তিনি বায়ু, কখনও বরুণ, কখনও ইন্দ্র, কখনও সোম। এ সকল কথায় কথায় বড় পরিবর্তন দেখে বিদেশী পণ্ডিত বৈদিক উপাসনার এক গানভরা নাম বার করেছেন, “হেনোখীঅন্”, বার মানে করনে সোচ্চা বালোর ধাঁড়ায়, “হতুন না বাপ”। এটা কিন্তু অবিচার। আবরাও ত্রো দরকার বড় না কালীর বন্যু দিই, সত্যানারায়ণের নিয়ু ধাই, আবার ভেদন ভেদন অবস্থার পড়লে হরি হরি বা রাম রাম বলে উঠি, নিজের অজ্ঞাত-সারেই অনেকটা। তা বলে কি আবরা সবাই খোসামুখে ? ওটা বিদেশী পণ্ডিতের একটু বিদ্যো জাহির করার চেষ্টা ছাড়া বেশী কিছু নয়।

সে ধাই হোক, সত্যিকার রাজা হলেন দেবতারা। শুধু তাই নয়, দেবতারাও পাখি রাজার রাজ্য ব্রহ্মা করেন। অন্তঃস্ব তাঁদের কাছে প্রাণনা করতে হয় রাজার স্তব শান্তির জন্যে।

বরুণকে বলা হচ্ছে (ঋগ্বেদ ১০।১৩২।৪) “বঃ বিশ্ণুনাঃ বরুণ অসি রাজা”। আবার শুনছি সাহুসেবই “অস্য বিশ্ণুস্য ভুবনস্য রাজা” (ঋগ্বেদ ১০।১৬৮।২)। পাছে আবার অন্য দেবতারা কিছু নেন করেন তাই সবাইকে একসঙ্গে ডাকা হচ্ছে, প্রার্থনা করা হচ্ছে, সেখো বাবাঠাকুররা সব, আমাদের রাজার রাজ্যবাটী যেন টিককে থাকে :

ধ্রুবঃ তে রাজা বরুণো

ধ্রুবঃ সেবো বৃহস্পতিঃ

ধ্রুবঃ তে ইন্দ্রশ্চ অগ্নিশ্চ

রাষ্ট্রঃ ধারয়তাঃ ধ্রুবন্।

(ঋগ্বেদ ১০।১৭৩।৫)

মানিক আগেই কিন্তু শুধু একজন, সে নামকে ডাকা হয়ে গেছে “সোমঃ রাজানঃ অবসে দবাবহে” (ঋগ্বেদ ১০।১৪১।৩)। একেশ্বরবাদী পণ্ডিতের মাথা একটু ওলিয়ে থাকে বৈ কি।

রাজা এবং রাজপুত্রোহিতদের শুদ্ধভক্তি অর্চা ছিল এমন কথা বলছি না। কিন্তু এরকম বিশুর ঠাকুর দেবতা মানত করার একটা বিশেষ পাখি প্রয়োজনও ছিল বলে নেন হয়। দেশটা ছিল অরাজকতায় ভর্তি। বুছবিগ্রহের অন্ত নেই, কথায় কথায় দুষ্টুতি বেছে উঠছে। তার আগোজ বেশ কানে আসে অধর্ষবাদের সূত্রের মধ্যে। ঋগ্বেদেও কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায় না এমন নয়। করেকটা নমুনা দিই।

দুশ্শুভেৰ্য্যঃ প্রয়তাঃ বপতীন্

আশুশুভী নাথিতা যোষবুধা

নারী পুত্রঃ ধাবত হস্তগৃহায়

অবিদ্রী ভীতা সবরে বধানাম্ ॥

(অথর্ববেদ ৫।২০।৫)

বিহঙ্গমঃ বৈবনশাঃ স্বধারিত্র্যেণ দুশ্মভে

উষেপনানা বনশা চক্ষুযা হৃদয়েন

ধাবত বিভ্রাতো অবিদ্রাঃ প্রতাসেনাত্যো ভতে ॥

(অথর্ববেদ ৫।১১।১২, ২)

“দুশ্মভির ভাকে যেন শক্রনারীর ঘুম ভেঙ্গে যায়, সে যেন ছেনের হাত ধরে শৌড় দেয়, পাছে তারা বুকে মারা পড়ে। ...হে দুশ্মভি, তোমার শব্দে শত্রুদের যেন হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, তাদের মন যায় বিপড়ে। তারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে যেন পলায়ন পেরে।” কথাগুলো খুব শ্রুতিবধূর নয়, কিন্তু এ থেকে বেশ মানিকটা আভাস পাওয়া যায় তখনকার দিনের সাম্প্রদায়িক অবস্থার। এরকম অবস্থার রাজ্যের বিশেষ প্রয়োজন। সেবতাদের সাহায্য না পেনে রাজ্যটি বা কববে কি ?

ঋগ্বেদেও ওচি (১।২৮।৫) দুশ্মভির ভাষা বিচ্ছেতার ভাষা, সে ভাষা “আনোকনয়” —“ইচ্চ দুমনমনঃ বর ভয়তানিব দুশ্মভিঃ ।” অন্যত্র (ঋঃ ৬।৪৭।২৮-২৯) দুশ্মভিকে বলা হচ্ছে :

উপ শ্বাসয় পৃথিবীঃ উত দ্যাঃ

পৃকত্রা তে মনুতাঃ বিষ্টিতঃ স্বগং

স দুশ্মভে মছরিত্রেণ দেবৈঃ

শ্যং দবীয়ো অপ সেধ শত্রুন ॥

“ভুলোক দ্যালোক পূর্ণ হোক তোমার নিনাদে, অগস্তের সর্বত্র তোমার পৌঙ্কষ প্রচারিত হোক। ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের সাহায্যে আমাদের শত্রুদের মূগে হাট্টিয়ে দাও।” খুব সম্ভব এখানে যে শত্রুদের কথা বলা হয়েছে তারা রাজ্যের শত্রু নয়, সাধনার বিপী। তবুও দুশ্মভির শব্দ সাধক ঋষিদের কানে সততই বাজত, আর যারা তাঁদের সাধনার কথা কিছুই জানত না তাদের কাছে এই ধারণার নয় ছিল সবধ-পীতি।

ভাল করে মায়ামারি করতে হলে যেমন নাট্যশালার তীরশাঙ্কের পরকার ডেননি জ্বরমন্ত সর্গারও তো চাই। সেই আদিব কালের রাজারা ছিলেন সর্গার বলভূত। যতদূর অনুমান করা যায়, তাঁদের প্রধান কাজ ছিল বুকে সর্গার করা, এবং তাঁদের মনোনিীত করা হতো প্রবানতঃ যুদ্ধ-কৌশলের জন্য। অনেকটা আদিব এ্যাফ্রিকার জুনুদের মতন, কিংবা যেমন মধ্যযুগের ক্রান্সে বা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীর রোমক সাম্রাজ্যে।

প্রবন কথা, রাজ্যের নির্বাচন কার হাতে ? এ নিয়ে পণ্ডিতদের নভভেন আছে। কেউ কেউ বলেন রাজ প্ররোচিতের হাতে। কেউ বলেন, না দেশের লোকে, অর্থাৎ পাড়ার বোড়সরা

ঠিক করত কে রাজা চলে। দু এক যায়গায় রাজার ছেলে রাজা হতেই এমনও দেখা যায়।

ঐগুপ্তের একটা নয়ে আছে (১০।১২৪।৮)

তা ঈঃ বিশো ন রাজানঃ বৃণানাঃ

বীতংস্থবঃ অপ বৃত্তাদিষ্ঠিন্ ॥

“শত্রুর ভয়ে যেমন দেশের লোকে একজনকে রাজা বনোনীত কোরে শান্তি পায় তেমনই জনপদেবীরা বক্রপদেবকে রাজা কোরে বৃত্তের দাত থেকে নিজেদের রক্ষা করেছেন”। অর্থবিশেষে ওই এক কথা। রাজাকে বলা হচ্ছে (৩।৪।২) “রাঃ বিশো বৃণভাঃ রাজ্যায়”—তোমায় যেম দেশের লোকে রাজ্যের বরণ করে। রাজার জন্যে প্রার্থনা করা হচ্ছে (৬।৮৭।১)

বিশ্বা সর্বা বাহুস্ত

মা স্বং রাষ্ট্রং অবি জনং ॥

“দেশের লোকে সবাই যেন তোমায় চায়, রাজার যেন তোমার দাত থেকে চলে না যায়।”

ধৃশ্বা দ্যৌঃ ধৃশ্বা পৃথিবী

ধৃশ্বঃ বিশ্বঃ ইমঃ জগৎ

ধৃশ্বাসঃ পর্বতা ইবে

ধৃশ্বো রাজা বিশাঃ অয়্ ॥ (৬।৮৮।১)

“আকাশ এবং পৃথিবী অচল, এই সবই জগৎ অটল, অচল যেমন পাহাড় পর্বত, তেমনই দেশের এই রাজাও যেন অটল হয়।”

রাজার রাজত্ব থাকা না থাকা চ্যুততা বেশ বাণিকতা সেবতাদের আয়ত্বাধীন, কিন্তু সন্তান-কার নির্বাচনের ভার ছিল খুব সন্তান দেশের বান্যগণ্য ব্যক্তিদের দ্বারা, যাদের এক ভায়গায় বলা হয়েছে “রাজানঃ রাজকৃতঃ” (অর্থবিশেষ ৩।৫।৭)। ব্যাপারটা বোধহয় অনেকটা আজকালকার এ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মত। দেশের একজন পলিটিকাল পাণ্ডা “কনভেনশানে” জড় হয়ে প্রথমে ঠিক করে কে তাদের দল থেকে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হবে, তারপর দেশের লোক ভোট দেয়। বেঘের বুগের “রাজকৃতঃ রাজারাও” বোধহয় সেই ধরনের পলিটিকাল টাই গোড়ের লোক। তখনকার দিনে পলিটিকাল পার্টি ছিল কি না বলা শক্ত, কিন্তু অস্বতঃ পক্ষে প্রাথমিক নির্বাচনটা বোধহয় দ্বিতীয় একধরনের “কনভেনশানে” যাকে বেদের ভাষায় বলা হয়েছে “সনতি”।

এই সনতি নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়ে গেছে, এখনও তর্কের শেষ হয় নি। তবে যজ্ঞরূপে বনে হয়, সনতি নামে বেখানে লোকেরা এক সঙ্গে জড় হয় (সন্-ইতি), খুব সন্তান কোনো বিশেষ প্রয়োজনে। সনতিতে রাজ-পদবাচ্যের জড় হতেন তার প্রদান আছে :

“যজৌষধীঃ সপণন্ত রাজানঃ সনিতৌ ইব।” (ঐগুপ্ত ১০।৯৭।৬)

রাজাও সনতিতে যেতেন, হয়তো অন্য কর্তব্যাক্তিদের বনজটীর জন্যে : “রাজা ন সত্যঃ

সমিতিরিয়ানঃ” (ঙ্গেফু ৯।৯৩।৬)। এবং সমিতির কথা বেনে না চললে রাজার
অবস্থা একটু কান্না হতো এমন আভাসও পাওয়া যায় অখর্ববেদের এক নম্বে (৫।১৯।১৫)

ন বর্ষঃ বৈজ্ঞানিকঃ ব্রহ্মজ্ঞানভিবর্ষতি

নাট্যেন সমিতিঃ কল্পতে

ন বিজ্ঞঃ নয়তে বশ্ ॥

তাই থেকে মনে হয় যে তখনকার দিনে রাজ্য কর্তে হলে অস্থিতঃ দেশের যোমনা-
চৌর্যাদের মন ধুণিয়ে চলতে হতো।

সমিতিও ছিল আবার সভাও ছিল। অখর্ববেদে রাজ্যের হয়ে প্রার্থনা করা হচ্ছে
(৭।১২)

সভা চ বে সমিতিচ অবতাঃ

প্রজাপতের্দুহিতস্তো নঃবিদানে

★

যে তে কে চ সভাসদঃ

তে বে নন্ত সবাচনঃ

★

নয়ি যো ব্রহ্মতাঃ ননঃ ॥

“সভা এবং সমিতি এঁরা প্রজাপতির দুই বেত্র, এঁরা দুজনই যেন আনায় রক্ষা করেন
একনত হয়ে।...যাঁরা মীমা সভায় বসেন তাঁরা যেন আনার কথায় সায় দেন।...আপনারাও
মন যেন আনার ওপর স্থনী থাকে।” সভায় বসবার অধিকার ছিল কোন্‌ জাতীয় লোকদের
তা নিয়ে মতভেদ আছে। বেনে “সভের” কথাটা ব্যবহার হয়েছে, তাই মানে অনেকটা
আবার “সভা”। হয়তো দেশের পণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব সভায় যেতেন। তাঁদের সম্বন্ধে
রাখা ছিল রাজ্যের প্রধান কর্তব্য।

রাজ্যের কাজ থেকে কি প্রত্যাশা করা হতো ? এ সম্বন্ধে অখর্ববেদে কিছু উল্লেখ আছে।
প্রথম কথা রাজ্যকে লোকপ্রিয় হতে হবে।

সর্বাঙ্কা রাজন্ প্রদিশো হ্রয়ন্ত

উপনদ্যো নবদ্যো ভবেহ

★ ★ ★

জায়াঃ পুত্রাঃ দুহনসো ভবন্ত

নচঃ বলিঃ প্রতি পশ্যাসা উগ্রঃ

যশ্বিনা বা অগ্রে বিজ্ঞানরূপোভা

বিশ্বে বোবা বরুতক্কা হ্রয়ন্ত ॥

“দ্বিগুণবিদ্বৎ থেকে ভোনার ভাক আহুক, তুমি সবারের নবন্য হও, সবাই যেন সহজে

তোমার কাছে আসতে পারে।.....সেপের লোকের স্ত্রী পুত্রবা সেন তোমার ওপর সন্তুষ্ট থাকে, প্রচুর টাকায় দেয়। অগ্নিবিষ এবং নিম্ন-বক্রণ, বক্রগণ এবং বিশৃঙ্খলবরাও সেন-তোমার নাম করেন।”

কিন্তু তথু তথু লোকে নাম করবে কেন? টাকা চান। তাই রাজাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে :

অথ বনো বহুদেয়ার কুণ্ড
ততো ন উগ্রো বি ভবাসুনি।

“তার পর হাত খালি করবার কথাটা একটু স্মরণ কোরো, যানাদের মধ্যে ভাগবাট্টা করে দাও যা আছে তোমার রাজ্যসম্পদ।”

শত্রুদের পদদলিত করতে হবে অবশ্যই :

প্রথো অচ্যুতঃ প্রবুধীহি শত্ন
পত্নস্তো অধরাং পাদরথ (অধর্ব ৬।৮৮।১)

“শত্রু যারা এবং যারা শত্রুতা করে তাদের অধঃপাতে দাও”। কিন্তু তাই বলে সেন সেপের লোকের ওপর অবিচার না হয়। বিশেষ করে ব্রাহ্মণের ওপর কোন রকম অত্যাচার হলে নিরাকরণ শাপ লাগবে। যেমন অধর্ববোধে (৫।১৮।৬)

উগ্রো রাজা মনামানো
ব্রাহ্মণঃ যো দ্বিষংসতি
পরা তৎ সিচ্যতে রাজ্যঃ
ব্রাহ্মণো যত্র জীয়তে।

“রাজা যদি নিজে থেকে প্রচণ্ড পরাক্রমশালী নেন তবে ব্রাহ্মণকে ধন্য করতে চায় বা ব্রাহ্মণ যেখানে স্তুতিপ্রস্তু হয় সে রাজ্য যাবে ব্রহ্মাতলে।”

সেপের লোককে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে কিন্তু প্রাণতরা আশীর্ব্বাদ। এই ধরনের কথা, সেন (অধর্ববোধ ৪।৮।২, ৪)

অা তিষ্ঠ নিত্রবর্ধন ভুভাঃ দেবা অধিবব্ন্

* * *

ব্যাশ্রো অধি বৈয়াশ্রো বি ক্রমশ্ব দিপো নবী:

বিশত্বা সর্বা বাহুস্ত আপো দিবাঃ পরম্বতী: ॥

“যে নিত্রবর্ধন, তোমার সেন পতন না হয়, সেবতারা তোমায় নগ্নতা দিন।...ভূমি ব্যাস্তুর ন্যায় পরাক্রমশীল, ব্যাস্তুর মত দিকে দিকে তোমার আশ্রয়ালয় হোক। সেপের লোক সবাই তোমায় পছন্দ করুক, যর্গের পরস্বিনীধারা তোমার উপর বঞ্চিত হোক।”

রাজাদের ঠাক্করদের কথা দু'একটা বলে বৈদিক রাজপর্ব্বটা এখানে শেষ করা যাক। গোড়াতেই বলেছি বেদের ঋষিদের কাছে সেবতারাই সত্যিকারের রাজা, পাণ্ডব রাজস্বটা

নিতান্তই গোপ। কাজেই দেব-রাজদের পোষাক পরিচ্ছদ সুবর্ণময় কবচ বা সহস্রজন্তু
• রাজপ্রাসাদের বর্ণনা থেকে সাধারণ নরপতিদের সম্বন্ধে একটা বড় রকম কিছু ধারণা করে
নেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। যতদূর মনে হয় সে-সুপের রাজারা ছিলেন নিতান্তই পাড়ারগেয়ে।
হবারই কথা, কারণ দেশ বা রাষ্ট্র বনতে তখনকার দিনে যোদ্ধাতো আধকালকার একটা
জেনা। কাজেই অপর্যবেশে বেশি (৩৫৬,৭) রাজা প্রার্থনা করছেন :

যে বীবানো রথকায়া:

কর্মিয়া যে নবীষিণ:

* * *

সূতা গ্রামশ্যাম্বে

* * *

মহাং যঃ সর্বান্ কৃণু অভিতো জনান্ ॥

অর্থাৎ, “যে সব বীমান্ ভুতোর নিরী এই নবীষী কানার আছেন...এবং গ্রামের যারা বোড়ল
এবং যারা গ্রামশ্যাম্বে বা বোড়ায় চান। রথের চালক, তাঁরা যেন আমার প্রতি সদয় থাকেন।”
এতে হাস্যরস কিছু নেই, কারণ বেদের সনাতনই ছিল পাড়ারগেয়ের সনাতন। রাজাকে নিশ্চয়ই
লোকে ভয় করে চলতো, যেনন এখনও গাঁয়েব বোড়ল বা পুলিশটোকির দাবোগাকে লোকে
খাতির করে চলে, কারণ রাজার হাতে ছিল যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষমতা। তখনও কিন্তু রাজা ঠিক
দেবতার পদ অধিকার করেনি। বরক একটু ভয়ে ভয়েই পাকতে চতো, এই বৃষ্টি কেউ
রাজা কেড়ে নেয় বা দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়।

রাজ্যের পরিচি বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের দাপটও বেশ বেড়ে গেছে দেখতে পাওয়া
পরবর্তী বৃণে, ব্রাহ্মণ-উপনিষদের আনলে।

ক্রমঃ

মায়ের সঙ্গে কথা

[প্রবেশদ্বার]

(১)

প্রশ্ন : ভ্রমের মধ্যে কখন হরিণ ছুটে গেল অল বেতে, তার কোনো প্রমাণ থাকে কি ? অধিকাংশ লোকে তার কোনো চিহ্নই দেখতে পায় না, হরিণ যে কেমন তাই হয়তো তারা জানে না, আর জানলেও বলতে পারেনা যে হরিণ সেখান দিয়ে গেছে কিনা। কিন্তু যে পাকা শিকারী, বন্য পশুদের পায়ের দাগ চেনে, সে তার চিহ্ন দেখে বলে দিতে পারে কোন জায়গার হরিণ সেখান দিয়ে গেছে, সে কেমন আকারের, কত বয়সের, পুরুষ না মেয়ে, ইত্যাদি। তেমনি ওদের নজর এমন আধ্যাতিক জ্ঞানসম্পন্ন লোকও নিশ্চয় আছে যারা লক্ষণ দেখে বলতে পারে অতীমানন্দের স্পর্শ কার মধ্যে এসেছে, যদিও সাধারণ লোকের সে জ্ঞান না থাকায় তারা তা ধরতেই পারবে না। পৃথিবীতে অতীমানন্দের অবতরণ ঘটেছে, তার অতিব্যক্তিও হয়েছে। এই বিষয়ে যা কিছু লেখা হয়েছে সবই যানসা পড়েছি, কিন্তু উপযুক্ত জ্ঞান না থাকায় তার কোনো লক্ষণও দেখি না বা তার অস্তিত্বও বোধ করি না। যে জানে সে কি স্পষ্ট করে বলে দিতে পারে, কোন চিহ্ন দেখে আমি বুঝবো যে অনুকের মধ্যে অতীমানন্দের স্পর্শ লেগেছে ?

উত্তর : অতীমানন্দের স্পর্শ পাবার দুটি সম্ভাব্য লক্ষণ আছে :

- ১। সর্বস্বপ্নের জন্য পূর্ণ সনত্তা।
- ২। জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নিশ্চয়তা।

যার মধ্যে অতীমানন্দের স্পর্শ পুরোপুরি ঘটবে, তার অস্তরে সনত্তা থাকবে স্বতঃস্ফূর্ত এবং অটল হয়ে, ঘটনা ঘাই কেন ঘটুক, বাহ্য প্রভাব ঘাই কেন আহুক, পাপিবই হোক বা বনস্ফাবিকই হোক, তার প্রকৃতি ও গুণের ভেদনই হোক।

আর তার জ্ঞানলাভ হবে একাক্ষতার দ্বারা, স্মৃতিরাং সে জ্ঞান হবে সম্ভাব্য, অবিসংবাদী।

(২)

কিছুদিন পূর্বে আমি অনুবাদের কালে শ্রীঅরবিন্দের “The Life Divine” গ্রন্থের কয়েকটি ছত্র পড়েছিলাম, আজ সন্ধ্যার তারই সম্বন্ধে কিছু বললে ভোঁনাদের তা কাজে লাগবে। শ্রীঅরবিন্দ তাতে প্রকৃতির বিবর্তনক্রিয়া সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলেছেন, কেমন

করে প্রথমে সম্পূর্ণ জড় থেকে প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে, তার পরে কেমন করে প্রাণ থেকে মন এসেছে, আর কেমন করে এবার মন থেকে অস্তিত্বানুগ বা অধ্যাত্ম-জীবন আসবে; ওরই মধ্যে তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে এই সকল পরিবর্তন আসতে কতখানি সময় লাগে। সেই জায়গাটি আগে ভোক্তাদের কাছে পড়ে শোনাই, তার পরে বনব এবং নরকার প্রশুর সঙ্গে তার কি সম্পর্ক।

“প্রকৃতির বিবর্তনক্রিয়ার প্রথম যে বিকাশ দেখা দেয় তার সময় গতি অতি অল্পষ্ট ক্রমিক ধারায় চলেছিল যুগের পর যুগ ধরে; জীবন বর্ধন দেখা দিল তখন তারও গতি নব্বু কিস্ত ওর চেয়ে অপেক্ষাকৃত দ্রুত। তা করে এলো হাজার বছরের নাগে; তার পর মনের আবির্ভাব হওয়াতে এই গতিকালের মাত্রা আরো কমে এসে দাঁড়িয়েছে শতাব্দীর নাগে; আরো এর পরে যখন পূর্ণচেতন আত্মার কাজ শুরু হবে, তখন এই কালের মাত্রা আরো সংক্ষিপ্ত হয়ে বিবর্তনক্রিয়াকে আরো দ্রুত এগিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।”

(The Life Divine II. xxvii)

এটি এখন পড়ে শোনান, কারণ অস্তিত্বানুগের আবির্ভাবের ক্রিয়া সম্বন্ধে আনাকে প্রশ্ন করা হয়েছে। তার লবানে আমি ভুলনা দেখিয়ে বনেছি যে মনের আবির্ভাবের বেনাতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অধ্যাত্মী পণ্ডিতিক বা সিনিয়ান মন্তিক থেকে প্রথম মানবমন্তিক তৈরি হয়ে উঠতে প্রায় দশ লক্ষাবিক বছর সময় লেগেছিল। তাই আমি বলেছি যে এধারকার পরিবর্তনটা যে কয়েক মাস বা কয়েক বছরের মধ্যে ঘটে যাবে এমন প্রত্যাশা করা উচিত নয়, এতে তার চেয়ে আরো দীর্ঘকাল সময় লাগতে পারে। কিন্তু কেউ কেউ তাইতে ভেদে নিলে, আমি এই বলতে চেয়েছি যে অস্তিত্বানুগের আবির্ভাবও অন্তত দশ লক্ষ বছরের আগে হবে না। এই ভুল ধারণা আমি দূর করতে চাই।

শ্রীঅরবিন্দ বলেই নিয়েছেন যে বিবর্তনের তৎপরতা বাড়তে চতনার পিকালের নাগে, অর্থাৎ চেতনা যত বাড়তে থাকে বিবর্তনের গতিও তত বেশী দ্রুততর হয়। শেষে যখন আত্মা বা অস্তিত্বানুগের বিকাশ ঘটে তখন তার কাজ আরো বেশী দ্রুত হয়। তাই আত্মা আশা করতে পারে যে অস্তিত্বানুগের আবির্ভাব কয়েক শতাব্দীতেই হবে।

কিন্তু অনেক প্রান্তেও সম্ভব নয়, তারা বলে যে শ্রীঅরবিন্দের প্রতিশ্রুতি কই সফল হলো, তিনি বলেছিলেন যে অস্তিত্বানুগিক রূপান্তর আসার এখন সময় হয়েছে। কিন্তু ঐ রূপান্তর আসা আর নতুন অস্তিত্বানুগ জাতির আবির্ভাব এক কথা নয়।

শ্রীঅরবিন্দ যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আর বর্তমানে আমাদের পক্ষেও যা কেনে রাখা বিশেষ দরকার তা এই যে, এবার এমন সময় এসেছে যখন বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তি যদি আধ্যাত্মিক জীবন পথের সনত্ত শর্তগুলি মেনে চলে, তাহলে তারা অস্তিত্বানুগের চেতনা ও শক্তি ও জ্যোতির সাহায্য নিয়ে তাদের সেহকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবে, তারা পঞ্চমানব থেকে দিব্যানুগ বা অস্তিত্বানুগে উত্তীর্ণ হতে পারবে।

এমন প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে অতিনিশ্চয় পণ্ডিত অসম্ভব এয়ার আগুন। বস্তুত এ কথা তিনি বহুদিন থেকেই জানতেন; এবং তার কি ফল হবে তাও তিনি জানতেন।

অতিনিশ্চয়ের অভিব্যক্তি এখন সাধারণভাবে হাটে গেছে, এখন তাই রূপান্তর আনার সম্ভাব্যতা নিশ্চয়ই আরো বেড়ে গেছে। যারা ঐ শর্তগুলির অনুসরণ করছে বা করবে, তারা যে সেই পথে অগ্রসর হচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শর্তগুলির কথা শ্রীদেবীশ বিশদভাবে বলেছেন তাঁর *Synthesis of Yoga* নামক গ্রন্থে এবং আরো বিশেষ করে বলেছেন *The Supramental Manifestation* নামক গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে। সে সব উপলব্ধি করা ছাড়া অন্য কিছুই এখন কববার নেই।

★

প্রশ্ন এখন তো অতিনিশ্চয়ের অভিব্যক্তি হয়েছে, তাকে আয়ত্ত করার কি উপায় ?

উত্তর : তোমাদের কাছে আদ্য বা পড়ে পোনালান, তাই হলো মূলসূত্র, ওর থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। সকলের পক্ষেই তাই।

কাজ শুরু করার পরে প্রত্যেকে আপন আপন প্রকৃতির রাস্তা ধরবে; যার বাঁতে যেমন দিকে চনার প্রবণতা থাকে। যে চলবে কর্ণের পথ নিয়ে, তার পক্ষে এই বোধটি আদ্য খুবই কঠিন যে মানুষের নিজের ব্যক্তির সেখানে কিছুই নয়, যা কিছু করছে তা ভগবৎ শক্তি। যে চলবে জ্ঞানের পথে, তার পক্ষে ঐ বোধ আদ্য অপেক্ষাকৃত সহজ, হয়তো এ কথা সে তখনই বুঝে নেবে। যে চলবে প্রেম-ভক্তির পথে, যেটা প্রাথমিক পথ, সে নিজেকে যতটা দিতে পারবে ততটাই এগোতে পারবে। কিন্তু কর্ণের পথ যে নেবে তার পক্ষে ঐ ভাবটি আদ্য খুবই কঠিন সুতরাং প্রথম থেকেই তাকে সেই অভ্যাস করতে হবে যেমন "Synthesis of Yoga"—এ বলা হয়েছে, অর্থাৎ কর্ণের ফলাফল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত থেকে যথাসাধ্য ভালো চেষ্টা নিয়ে তা করে যাওয়া, আর ফলের সম্বন্ধে চিন্তামাত্র না করে উচ্চতর ইচ্ছার উপর সব কিছু ছেড়ে দেওয়া।

এই সব বিভিন্ন পথের মধ্যে কোন পথ কতখানি ভালো তাই নিয়ে সাধারণভাবে কিছু বলতে যাওয়া ঠিক নয়; সেটা হলো নিজস্বই ব্যক্তিগত প্রশ্ন। একটা সময় আসে যখন নিজের থেকেই বুঝতে পারো যে মূহন লোকের পথ একরকম হয় না, প্রত্যেকের পক্ষেই আলাদা রাস্তা এবং তাই তার সত্যের পক্ষে সত্য। তবে অনেক উঁচু থেকে যদি লক্ষ্য করো তাহলে হয়তো চলনের ক্রমভঙ্গর মধ্যে কিছু আভ্যন্তরীণ দেখবে; কিন্তু বাইরের লক্ষণের সঙ্গে তার কোনোই বিন নেই; বোটের উপর এঁটুকু বলা যায় যে জ্ঞানের লোকেরাই সব চেয়ে ক্রম এগোবে এমন কথা নয়।

(নীরব থেকে)

সাধারণভাবে কিছু বলা এখন আর সম্ভব নয়।... ভগবৎ-রূপা হাতির রয়েছে সকলেরই সাধারণ উপরে। কেনন করে তাকে কার্যকরী করবে ? তা বলা সুব কঠিন।

যখন তুমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ, তাকে জানতে পারছ, তার ক্রিয়া হচ্ছে এমন বোধ করছ, তার উপস্থিতি ও ভৎপরতা অনুভব করছ, তখন সেই উপলব্ধি পেয়ে আনন্দ জে হবেই ; কিন্তু যখন সে আনন্দ পাচ্ছ না, তার নানো কিন্তু এই নয় যে কৃপার কাছ কিছু হচ্ছে না বা তার ফল কিছু ঘটছে না।

শেষ পর্যন্ত দেখতে পোলে দেখবে যে সবরকম ভিনিসেরই দরকার আছে, ভগবানের অভিব্যক্তি সাক্ষ্যের জন্য সকল রকম সত্বৃতিই প্রয়োজন। সে অভিব্যক্তি সামগ্রিক হওয়া চাই ভাবে, তাই সনগ্রহতাই এনিবে চলেছে এক অনন্ত ও শাস্ত্র সম্পূর্ণতার দিকে। কোনো একটিনাএ দিক নিয়ে কথা নয়, চাই সর্ব দিক থেকে সনগ্রহভাবে দ্বিবা সত্যের সর্বসম্পূর্ণ বিকাশ। সকল দিক নিয়েই চলেছে এই অধিরাম অগ্রগতি, চিব্রন ভাবেই তা চলেছে বৃত্তান্তিক পরিণত করে আনতে। গতকালের বিশ্বে চেয়ে আগামীকালের বিশ্ব হবে অধিকতর দ্বিবা, আর সেই গতকালের বিশ্বও ছিল তার আগেকার বিশ্বে চেয়ে অধিকতর দ্বিবা। তাই এটা নিঃশেষে যে স্বয়ং তিনিই এনিবে চলেছেন উত্তরোত্তর আত্মবিকাশ ও পূর্ণতার অভিব্যক্তির দিকে।

অতএব প্রত্যেক রকম অংশেরই তার স্বর্ধ অনুযায়ী সর্বোদন অভিব্যক্ত হওয়া আবশ্যিক, যাতে যন্ত্রের কেন্দ্রে প্রত্যেকটি তার সর্বাধন স্থান পায়। প্রত্যেক সত্তার পক্ষেই দরকার গ্রন আপন ঐশ্বরিক সত্যের চেতন ও নিরাসক্ত আনন্দ, তাই হলো তার বোনাতে সব চেয়ে ভরবী প্রাথমিক প্রয়োজন।

(৩)

প্রশ্ন আনন্দই কি চরন অবস্থা ? তা যদি হয়, তবে কেউ যদি সেই আনন্দকে হারায, তাতে কি তার চেতনার অধোগতি ঘটে ?

উত্তর শ্রীঅরবিন্দ বলেন, আনন্দ হতেই সাতা বিশ্ব সমুত, বিশ্বের ভিত্তিতেও আনন্দ কাজেই তার শেষ লক্ষ্যও সেই আনন্দ। অতএব আনন্দের অবস্থাকে সর্বোচ্চ অবস্থাই বলতে হবে।

কিন্তু এ কথাও কি জোনাগের বুঝিয়ে বলা দরকার যে, সাধারণ মানব-চেতনাতে থাকে আনন্দ বনো, এ সেই আনন্দ নয় ? এ বৌদ্ধিক আনন্দ, বোগের চরম অবস্থারও উপরকার জ্বিলদ, যাতে আসবে একটি পূর্ণ প্রসাদি, পূর্ণ সমজা, পূর্ণ নিলিগ্রতা, অনন্ত ও শাস্ত্রের সঙ্গে একাত্তা, আঃ সব কিছু নৈমিত্তিক কর্ণের উপরে তার স্থান হবে। এর সমান আরো

এক অবস্থা। আছে, যাকে বলে বিশ্বদ্রোণ, যা করুণার নিরুপ পূর্ণ স্বরূপ, যাতে সকল জাতি ও অজ্ঞানতা নিশ্চিহ্ন হয়ে ধুয়ে যায়। এই দুই ভিনিককেই বলা হয় চেতনার শীর্ষ অবস্থা ; ব্যক্তিচেতনা যখন ভগবানের সঙ্গে গিয়ে যেলে তখনকার অবস্থাই এমন চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছতে পারে।

তথাপি এর পরেও আরো কিছু আছে ; তাই হলো আনন্দের পূর্ণতা, কিন্তু তা একভাবে থাকে না, অভিব্যক্তির ক্রমিক ক্ষুদ্রত্বের সঙ্গে ও পরম চেতনার ক্রমিক উন্নোচনের সঙ্গে তা সচল।

যে দুই অবস্থার সম্বন্ধে বলান, তার মধ্যে প্রথমটিতে আসে কর্কিরতি ও নিশ্চল ভাব ; এর থেকে সহজেই আসতে পারে নির্বাণ (যারা নির্বাণ চায় তাদের ঐ পদে ধরতে বলা হয়)। কিন্তু যে পূর্ণ আনন্দের কথা আমি বলছি, সে একেবারে মুক্ত ও দিব্য অবস্থা, সকল বন্ধনের অবরোধ হতে সম্পূর্ণই মুক্ত, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় নয় ; বরং কর্ণে পুরোপুরি নিঃশ্র, কিন্তু সর্ব অজ্ঞানতা ও তার দাস্য হতে সর্বতোভাবে মুক্ত।

যানিকটা এগিয়ে যাবার পরে যখন তোনাদের বোধশক্তি আরো বেশী বাড়বে, উন্নীতনের দ্বারা বেড়ে গিয়ে যখন ভগবৎ-চেতনার সঙ্গে যনিষ্ঠতার ভাবে মিলিত হতে পারবে, তখন ঐ আনন্দের অনুভব পেয়ে হৃদয়ঙ্গম করবে জীবনের কি প্রকৃত অর্থ। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত রয়েছে এই মানব-চেতনার মধ্যে, ততক্ষণ সে আনন্দ এমন বিকারপ্রাণ হয়ে আছে যে তাকে আনন্দ বলে চেনাই যায় না। হুতরাং এমন কথা তুমি বলতেই পারো না যে আনন্দ হারালে চেতনার অধোগতি বোধাবে, কারণ যে আনন্দের কথা আমি বলছি তা হারায় না কখনোই। যে দুটি অবস্থার কথা ইতিপূর্বে বলেছি, অর্থাৎ পূর্ণ নিঃশ্রুতার মধ্যে যনিষ্ঠতার মিলন আর পূর্ণ করুণায় বিশ্বদ্রোণ, সেই দুই অবস্থার উত্তরে যখন দিব্য আনন্দের সাক্ষাৎ পাবে, তখন তার থেকে নেমে আসা আর সম্ভবই নয়। কিন্তু যোগের পথে থেকেও ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে কণিকের জন্য দিব্য আনন্দের সাক্ষাৎ পেয়ে পাবে যদি তা নিলিয়ে যায়, তাহলে তোনোর মনে হতে পারে যে উচ্চ চূড়া থেকে যুগি আবার অঙ্ককার উপত্যকার নেনে পড়লে।

কিন্তু নিঃশ্রুতা যখন আসেনি তখনকার যে আনন্দ তাকে নিঃশ্রুত বান বলা যায় না, কারণ তা সহজেই নিঃশ্রু হয়ে যেতে পারে। তাই নিঃশ্রুতা না আসা পর্যন্ত সে আনন্দ পেতে চাওয়া খুব সঙ্গীচীন নয়। আগে তোনাকে সকল বিরোধ ও বৈপরীত্যের উপরে উঠতে হবে, যত কিছু ব্যাধ ও ব্যক্তি, বৃঃ ও হৃঃ, হতাশা ও প্রত্যাশার উর্ধ্বে যেতে হবে। সেই অবস্থায় পৌঁছতে পারলে তখন নিশ্চিতে চাইতে পারবে সেই আনন্দকে।

নিঃশ্রুতা যখন আসেনি তখন হরজে সাধারণ মানবীর পরিত্রুটিকে আনন্দ ভেবে উৎকর্ষ হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু সে আসল জিনিস নয়, এমন কি তার নকলও নয়, কারণ এ দুটির অনুভব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিপরীত, এক থেকে অন্যো যাওয়া যায় না। অতএব যদি

নিরাপত্তে অগ্রসর হতে চাও, তবে আগে চাইবে শান্তি, স্থিরতা পূর্ণ সমতা, চোতনার বিস্তার, বোধের ব্যাপকতা, কাননা বাসনার খোঁকের বিরতি, সর্ব আগন্তিকির বিলোপ, এগুলি প্রথমে আসা অপরিহার্য। তাই হবে তোবার বাহা ও আভ্যন্তরীণ স্বামী বনিয়াদ; সে বনিয়াদ পুরোপুরি নিবোঁ হওয়া চাই, তবে তার উপরে তুমি যা গড়তে চাইবে তা পড়ে উঠবে। কিন্তু আগে চাই তিষ্ঠি, একেবারে অটল ও অনড়।

(নীরব থেকে)

একজন প্রশ্ন করেছে, “স্থির হয়ে থাকো চাই” আমার এ কথার অর্থ কি।

যখন কাউকে বলি, “স্থির হয়ে থাকো” তখন বিভিন্ন অনের পক্ষে তার বিভিন্ন অর্থ হয়। তবে যে স্থিরতা সকলের পক্ষেই অপরিহার্য তা হলো মানসিক স্থিরতা, কারণ এরই অভাব সাধারণত সব চেয়ে বেশী। যখন বলি “অচঞ্চল বা শান্ত হও”, তখন তার অর্থ, “মনের উদ্বেগনা, উত্তেজনা, অস্থিরতা দূর করতে চেষ্টা করো; নৃত্তিক শাস্তি বেধে মনের যত কিছু জল্পনা কল্পনা, বিচার ও নন্দবাগ্মনিকে নিয়ে কেবল ঘুরপাক খাওয়া থামিয়ে দাও।”

কেউ হয়তো এখানে প্রশ্ন করবে, “তুমি বলছ অচঞ্চল হতে, স্থির হতে, কিন্তু কেন্দ্র করে তা হই?” এ প্রশ্নেরও প্রায় একই রকম জবাব : আগে নিজের মধ্যে তার প্রয়োজন বোধ করো, ইচ্ছা জাগাও, আশুদ্য করো, তবে চেষ্টা করো।

চেষ্টা শুরু করার অসংখ্য উপায় রয়েছে, অনেকে অনেক উপায়ের কথা বলেছেও এবং তার প্রয়াসও করেছে। অধিকাংশ উপায়ই কঠিন, দীর্ঘ বিলম্বিত, ব্যাধা; শেষ পর্যন্ত যেতে না যেতে অনেকেই নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে, কারণ বতই চেষ্টা করতে যার ততই অস্থির করে তোমার চিন্তাগুলি মনের মধ্যে প্রদক্ষিণ করতে থাকে।

প্রকৃত উপায় হবে প্রত্যেকের বেনাতেই স্বতন্ত্র,—কিন্তু প্রধান কথা, তার জন্য তাৎক্ষণিক বোধ করা চাই—নিমিত্ত ঘাই দোক, হয়তো তুমি নিজের অবস্থায় ক্রিষ্ট ও বিরক্ত হয়ে উঠেছ, কিংবা বর্তমান অবস্থা ছেড়ে প্রকৃতই উপরে যেতে চাও,—কিন্তু এই স্থিরতা বা মনের শান্তি যে নিজাতই তোবার প্রয়োজন এটি বোধ করা চাই, তার পরে আশানুরূপ ফল পাবার জন্য প্রাচীন বা নতুন উপায়গুলির একটির পর একটিকে নিয়ে চেষ্টা করতে থাকো।

দীর্ঘই তুমি জানবে যে আরো এক রকমের স্থিরতা আসা অভ্যন্তরীণ দরকার, তা হলো প্রাণেরও স্থিরতা, অর্থাৎ কাননা-চাক্সন্যের নিবৃত্তি। কিন্তু বার প্রাণপন্থা পুরোপুরি গঠিত হয়নি, তাকে তার চাক্সন্য থামিয়ে রাখতে বললেই সে হয় ধুনিয়ে পড়বে নয়তো ধর্বাট করে বলবে; সে তখন বলবে, “বেশ, তবে আমি নোটে নড়ছি না। আমার খোয়াক্স নিতে যদি না দাও, উদ্বেগনা, আগ্রহ, কাননা, আবেগাদি কিছুতেই অংগ নিতে না দাও—তবে আমি নড়তেই চাইনা, কোনো কিছু করতে চাইনা।” সমস্যাটি সেখানে আরো কিছু বোঝালো এবং কঠিন হয়ে পড়বে; কারণ উদ্বেগনা থেকে একেবারে অজ্ঞাত্য মনে গেলে তাকে জো উগুতি বলা যায়না। অজ্ঞাত্য বা মনের অসাড়তা আর স্থিরতা কখনো এক নয়।

দ্বিরতা কখনই নেতিবাচক নয়, তা ইতিবাচক ; সে দ্বিরতা সংগ্রামের বিপরীত জিনিস নয়—তা হবে অসংজ্ঞিত, শক্তিশালী, সংক্রামক, আপন ভেত্রে সংহত, প্রণায়, সকল কিছুকেই তা যথাযোগ্য স্থান দেয়। যখন বলি “দ্বিরতা আনো,” তখন এরই কথা বলি। তার মানে এমন বলতে চাইনা যে, “যুনিরে থাকো, ছাড়ের মতো নিষ্ক্রিয় থাকো, কিছুই করতে যাবেনা”,—ওরূপ ধরণের কথা একেবারেই নয়।...প্রকৃত দ্বিরতা হলো এক প্রবল শক্তি, প্রচণ্ড তেজ। যন্ত্রত অন্যান্যিক থেকে সেখানে বলতে হয়, যারা প্রকৃত শক্তিমান হয় তারাি হয় দ্বির। যারা দুর্বল তারাি চরুল; তোমার মধ্যে শক্তি এলে তখনই তুমি হয়ে পড়বে দ্বির, ধীর, প্রণায়, তখন বাইরের বিপর্ষয় তরঙ্গ এসে বাধা মারলেও তুমি তা সরে যাবে। এ দ্বিরতা শক্তিরই লক্ষণ। এটা বলবানের সম্পদ।

দৈনিক শক্তির সরস্রও একই কথা। বাঘ, সিংহ, হাতী প্রভৃতি বলবান জন্তুদের কখনো লক্ষ্য করে সেখেন্ কিনা জানিনা ; যখন তারা সক্রিয় নয় তখন সেখানে তারা কতই শান্ত। সিংহ যখন দ্বির হয়ে বলে তোমার দিকে চেয়ে থাকে, তখন সে নিশ্চয় মনে মনে জোনাকে বলে, “তুমি এত অধির কেন।” কী শান্ত গম্ভীর বিজের মতো দৃষ্টি নিয়ে সে জোনার দিকে চায়। তার গম্ভীর শক্তি ও তেজ ও গতিবেগ রয়েছে সংহত ও কেন্দ্রীভূত হয়ে, চারুকোণার চিহ্ননাত্রই তখন নেই, কিন্তু ইঙ্গিতনাত্রই বিপুল শক্তিকে সক্রিয় করার জন্য সে প্রস্তুত। অনেককেই দেখি, তারা কোনো উৎখু না করে আধবনীর জন্যও চুপ করে বসতে পারেনা। হয় পা নাচাবে, কিংবা পায়ের পাতা কিংবা হাতখানা কিংবা মাথাি নাড়তে থাকবে। সব সময়েই অধির, তার কারণ দ্বির থাকবার মতো শক্তি বা সামর্থ্য তাদের নেই। প্রয়োজন হলে আপনি ক্রিয়াশক্তিকে সংহত করে দ্বির হয়ে থাকান কনতা, আর ক্রিয়ার সময়েও সেই শক্তিকে বেতাবে বতখানি খুশি প্রয়োগ করার কনতা, এবং শান্ত ও অবিচল চিন্তে তাই করতে পারা—এই হলো প্রকৃত শক্তিমাত্রার লক্ষণ। সে শক্তি সেহেরও হতে পারে, প্রাণেরও হতে পারে, মনেরও হতে পারে। কিন্তু যদি তুমি কিছুনাত্র বিচলিত হয়ে পড়ো, তবে নিশ্চয় জানবে যে দুর্বলতা কোথাও রয়েছে তোমার মধ্যে ; তা যদি সর্বাঙ্গীণ হয় তবে তোমার দুর্বলতাও সর্বাঙ্গীণ।

তাই যখন কাউকে বলি দ্বির হতে, তার অর্থ নানারকম হতে পারে, তা নির্ভর করে সেই ব্যক্তিবিশেষের উপর ; তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার অর্থ, “মনকে শান্ত রাখ, মাথার মধ্যে অধিরতা আসতে পিওনা, রাঙ্কের ভাবনা নিয়ে ঝাঁটাঝাঁটি কোরোনা, ঠাঙা থাকো”।

অনুভূতিক অধিকাংশ লোকে অনুভূতি বলে মানে, কেবল যখন তার কোনো ব্যাখ্যা করতে পারে। শক্তির সংশ্পর্শনাত, বা চেতনার বিস্তার, ভগবানের কোনো দিকের সঙ্গে সাবুধ্য, আরো কত কি হতে পারে—সত্যার উন্মীলন, বাধা উদ্ঘাটন, অথবা বিশেষের অভিক্রমণ, নতুন কথাট উন্মোচন,—ইত্যাদি অনুভূতিকে যদি তারা নিছের কাছে ব্যাখ্যা করতে না পারে, তাহলে কান্তর অনুভূতি বলে তাকে ধরেই না। বুদ্ধির তরঙ্গ কনতে গিয়ে

সে অনুভূতির অনেকখানি ফিরা নই হয়ে যায়। সুনিশ্চিত অনুভূতি পেলেনও, যেমন চৈতন্যের দরজা খুলে গেল, তার সঙ্গে মিলে গিয়ে জানলে যে এর তাৎপর্য কি হবে,—তবুও তার ফল স্বাধীন হয়না কেন? তার কারণ নিজেদের কাছে ব্যাখ্যা দিতে পারেনি বলে তার ফিরা পুরোপুরি জোনাতে ফলননা। যখন তুমি তাঁকে ব্যাখ্যা করতে তখনই তাঁকে মানবে। কিন্তু এমিকে ব্যাখ্যার মধ্যে আনতে গিয়ে উভয়ক্ষেত্রে তার ভেদ, বাইরে ও ভিতরে তার রূপান্তর আবার শক্তি অনেকটা উবে গেছে। তাই বলতে চাই যে ব্যাখ্যা করে বুঝতে যাওয়া মানেই অনেকটা নেনে যাওয়া।

(৪)

প্রশ্ন : শ্রীশ্রীমন্দির কাকে বলেছেন “কামনা সত্তা?”

উত্তর : যার জোরে তুমি বেঁচে রয়েছ, যোরাধারি করছ, কাছ-কম করছ। ফরাশী ভাষায় একে বলে étre, যার মণা একটি অর্থ জ্বিয়ে রাখা। ওর স্বাধীন তোমার সেই প্রাণবন্ত, সার্বজনীন। ওর অভাবে তুমি থাকতে ছাড়ের মতো হয়ে, পাখনের মতো বা উদ্ভিদের মতো হয়ে, যা নিত্যই ছড় না হলেও স্বাধীন।

অনেকে বলে যে কামনা সত্তার জোরে মা থাকলে কোনো উন্মুক্তি হয়না।...সামান্য জীবনের পক্ষে এটি থাকা বৃষ্টে দলকান। কিন্তু যোগের পথে পা দিয়ে ভগবানকে পেতে চাইলে তখন একে নিয়ে কিছু অস্বাভাবিক পড়তে হয়।

(নীরব থেকে)

আর কিছু ভিজ়ায়া আছে?

*

প্রশ্ন : মা, মাগারস্তে জিনিস বিতরণের অনুষ্ঠানে যখন আমার আপনাদের কাছে আসি, তখন কোনভাবে মুক্ত বোধ করে বেশ আনন্দ পাই, আর কোনভাবে তেমন কিছু হয়না, কেবল শূন্যই বোধ করি। এর কারণ কি?

উত্তর : যখন আনন্দ পেলো, তখন তার মানে তোমার নিজেকেই খুলে দিয়ে আবার নিজেকে গ্রহণ করতে পারলে; আর যখন শূন্য বোধ করো তার মানে নিজেকেই এঁটে বন্ধ করে রেখেছ।

কিন্তু কেনই বা খোলো আর কেনই বা বন্ধ থাকো? প্রত্যেকের পক্ষেই তার কারণ স্বতন্ত্র, এবং অনেক কিছুই উপর তা নির্ভর করে। নিজেকেই নতুন কি লক্ষ্য করোনি এ পার্থক্য, কোনো বাচ্য ব্যাপারে বা আভ্যন্তরীণ ঘটনাতে কখন কি হচ্ছে? অনেক

কারণই থাকতে পারে যাতে এক এক সময় জোনাদের বেশ সজীব সতেজ উৎকর্ষ করে তোলে।

সাধারণ জীবনেই এমন কেউ কেউ আছে, তাদের হাতই গড়া হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখার উপযোগী। তারা আপনা হতেই প্রকৃতির ছন্দের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলে; আর এখান সাধারণত থাকে হুঁশে ঘাচ্ছন্দো; যা কিছু কাজ নিয়ে তারা করতে শুরু করে তাতেই সফল হয়, বিশেষ কিছু বাধা বা বেগ পেতে হয়না। জীবনের ও প্রকৃতির সঙ্গে তাদের ছন্দে ছন্দে মিল আছে।

কিন্তু তারপর এমন একদিন আসে যেদিন তুমি সক্রিয় দিব্য চেতনার ও কৃপার স্পর্শ পেয়ে গেলে; সেই উপস্থিতির রঙে সব কিছুই রাঙিয়ে উঠল; যা কিছু নিরানন্দ ও গতানুগতিক তাই হয়ে উঠল রমণীয়, ব্যস্তনীয়, শিক্ষণীয়; শ্রাবণশব্দে তরঙ্গিত, সতেজ ও আশাবরষ। সেই দিকে নিরঙ্কুশে সন্নিবিষ্ট করে দিলে তুমি সবার, সার্বিক, স্থলী ও নৃত্য বোধ করতে থাকলে; সব কিছুসই তখন একটা অর্থ নিলে গেল। সবেমই অস্তিত্বের হেতু বোধ করে তুমি সবার সঙ্গে যোগ দিলে।

আবার এমন এক একদিন আসে যখন কোনো কারণে তুমি আপন থেকে এনে অহংকার বানায় গিয়ে পড়লে, সকল বোধ হারিয়ে ফেললে; কোনো কিছুস আদার নেই, আকর্ষণ নেই, মূল্য নেই, তুমি যেন কাঠ হয়ে গেছ।

কিন্তু যদি পারো চৈতন্যের সঙ্গে চেতন সম্পর্ক সর্বদা স্থাপন করতে, তাহলে সর্বদাই থাকবে একটা গ্রহিকৃত্রা নিয়ে, আভ্যন্তরীণ এক আনন্দে ও তেজের নিত্য অগ্রগামী হয়ে ভগবৎ উপস্থিতির সান্নিধ্যে। এবং তার সঙ্গে মিলন হয়ে গেলে তুমি সর্বত্র সব কিছুস মধ্যে তাকেই দেখতে থাকবে। সবেমই প্রকৃত তাৎপর্য বুঝবে।

কিসের উপর এসকল নির্ভর করছে? আভ্যন্তরীণ একটি ছন্দের উপর। হয়তো কোনো কৃপার উপর; এমন কিছুস দিকে তখন একটা গ্রহিকৃত্রা এসে যায় যা তোমাকে ছাড়িয়ে তোমাকে ছাপিয়ে রয়েছে।

★

প্রশ্ন : যখন কোনো উন্মত্ত আত্মা এসে বেহাশরৎ করে, তখন কি তার পক্ষে এই কান্দনা সত্তাকে স্পষ্টতরিত করে নেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়না?

উত্তর : জা বলা যায়না। যুক্তির দিক থেকে তাই বটে; কিন্তু বাস্তবের দিক থেকে দেখলে দেখতে পাবে যে ব্যক্তির যেখানে মতই বেশী গড়ে উঠেছে এই কান্দনা সত্তা সেখানে ততই বেশী দুর্বল হয়ে পড়িয়েছে। বাস্তবের ব্যক্তির হৃদয় ও হৃদয়, যারা সব দিক থেকে আত্মনির্ভর, পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভর করেনা, তাদের পক্ষে ভগবৎ সান্নিধ্যে আসা অন্যের চেয়ে কঠিন হয়; কারণ তারা থাকে আপন স্বাধিকার অস্তিত্ব নিয়ে একটা আত্ম-

সজ্জি রচনা করে আরম্ভ হইবে । তেমন আত্মসম্বন্ধ ব্যক্তিকে অন্য দিকে ফেরানো খুবই কঠিন । তার চেয়ে এটা অনেক সহজ তাদের বেনাতে যারা সম্বন্ধোপূর্ণ খোলা মন নিয়ে সত্যের প্রভাব নিতে রাজী থাকে । যে ব্যক্তি উন্মুক্তপ্রাণ হওয়াতে তার আপন অস্তিত্ব ও আপন ব্যক্তিকেই বড়ো করে দেখে, তার পক্ষে একথা বেনে নেওয়া কঠিন হয় যে সে কেবল ভগবৎশক্তির হাতের ধর নাহ ; কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেকে সামান্য চিন্মনে তরল পদার্থ (হাতের ভরী করে দেখানেন) বলেই জানে, যার কোনো নির্দিষ্ট কিনারা নেই, কোনো রীতি ব্যক্তির নেই, তার পক্ষে ও-কাজ কঠিন হয়না । সে সহজেই বুঝে নেয় যে নিজে সে কোনো কিছুই নয়, অন্য কোনো শক্তি তাকে দিয়ে যা করাবার তাই কয়ছে । সুতরাং কোনো আত্ম উন্মত্ত হলেই যে তার পক্ষে বাধাবিপত্তি কম হবে এমন কথা বলতে পারি না । বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তি উপর তা নির্ভর করে ।

তুনি হয়তো বলতে চাইছ যে আপন আত্মার সঙ্গে যারা সম্বন্ধবদ্ধ থাকে তাদের পক্ষে কারনা সম্বন্ধে বিক্রিয় রাখা সহজ হয় । কিন্তু তা আলাদা কথা । প্রথমে আপন চৈতন্যকে খুঁজে পেয়ে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকা চাই ; তবেই তুনি পারবে জোনার কাননা সম্বন্ধে জানতে, তাকে তার নির্বোধিতা দেখিয়ে দিতে ।

(বহুক্ষণ নীরব)

*

প্রশ্ন : না, মাধনার বর্তমান অবস্থাতে আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সংস্পর্শ স্থাপনের কি বিশেষ কিছু ফল আছে ? আনাদের পক্ষে ভাতে বেশী কিছু লাভ হয় ?

উত্তর : ব্যক্তিগত সংস্পর্শ অর্থে কি বলতে চাও ? আনাকে চোখে দেখা আনার সঙ্গে কথা বলা ও খোলা এই সব ? স্বতন্ত্রভাবে কাছে এসে, না সনবেত হয়ে ?

*

প্রশ্ন : স্বতন্ত্রভাবে এসে—

উত্তর : ও, সাক্ষাৎ করতে আসা ?

তা যে যেমন ভাবে নেবে তারই উপর সব নির্ভর করবে ।

এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন, কারণ এ হলো নিজস্ব ব্যক্তিগত প্রশ্ন । ওর ফল নির্ভর করবে সেই বিশেষ সময়টির উপর, বিশেষ অবস্থার উপর, তার আবার বলি, সংস্পর্শটিকে যে যেমন ভাবে নিতে জানবে তারই উপর ।

(নীরব থেকে)

নিজেকে ভিতর থেকে অব্যাহত রেখে যদি তেমন গ্রহীতৃত্ব আনতে পারো, তাহলে পূর্ণ উন্মুক্তির পক্ষে যা কিছু দরকার সবই পাবে, এবং জোনার সুস্থ শরীরের মধ্যেও তার কাজ

হবে। নয় কি? তখন বাস্তবিক নিয়মে বাহ্য সংস্পর্শেও তার চূড়ান্ত ফল পাবে—তাকে বাহ্য চেতনা ও স্বপ্ন দেখে পর্যন্ত ভিতরের উন্মুক্তির অনুসরণ করবে।

কিন্তু যদি মনে করো যে কেবল বাহ্য সংস্পর্শে এনেই তা ভিতরের দিকেও গৃহীত্বতার কাজ করে দেবে, তাহলে বলব সেটা ভুল, তাতে বিশেষ কিছু হবে না। যারা নিম্নেই যেখানেই এঁটে বন্ধ করে, ভিতরে কিছু নিতে পারেনা, কোনো শক্তির দিকে নিঃশব্দে খুলে ধরেনা, তারা যদি ভাবে যে কেবল আবার সাননে বসে আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা কপারভাট বনলেই রূপান্তর এসে যাবে, তাহলে তা খুবই ভুল।

কিন্তু যারা নিম্নেই খুলতে পারবে, ভগবৎ শক্তির সংস্পর্শ নিয়ে রূপান্তরিত হতে চেষ্টা করবে, তাদের পক্ষে হঠাৎ কোনো মুহূর্তে, হয়তো ঈশৎ একটু স্পর্শের দ্বারা কিংবা শুধু উপস্থিতির দ্বারা উন্মুক্তির পূর্ণ স্বযোগ মিলবে।

তুমি আবার খুবই কাছাকাছি থাকতে পারো, প্রত্যাহই কাছে এসে বসতে পারো, তবু তাতেই তোমার সক্রিয় চেতনার মধ্যে কিছু গ্রহণ করা হবে না (হয়তো খুব অল্প অল্প কিছু গভীর ক্রিয়া ঘটতে পারে, কিন্তু সেটুকু শ্রুতাকের বেনাতেই হতে পারে)। আর যদি আবার পাশে বসেও তোমার চিন্তা থাকে অন্য দিকে, কাননা ও মন যায় অন্যদিকে, তাহলে ওর ফল কিছুই হবে না।

সব চেয়ে আসল কথা আত্মস্বরূপ সংস্পর্শ; তাতেই সব কিছু হতে পারে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে—তাও নির্ভর করে দৈবাৎ কোনো ব্যক্তিবিশেষের উপর—উপস্থিতিতেও কিছু মিলে যায়, বাস্তব উপলব্ধি এসে যায়। কিন্তু ভিতরে কিছু না থাকলে শুধু ওতেই কিছু হয় না।

(নীরব থেকে)

সবাই ভুলবশত মনে করে যে আগে বাইরের দিক থেকে শুরু করে তখন ভিতরের দিকে যাওয়া যায়, কিন্তু তার ঠিক উল্টো, আগে ভিতরের দিক থেকে শুরু করে যখন তৈরি হয়ে উঠেছে তখন বাইরের দিকে আসবে।

*

প্রশ্ন : আবার আপনার কাছে এসে যথাযথ চেষ্টা করি ভালো হতে, অর্থাৎ মনের মধ্যে ভালো চিন্তা আনতে; কিন্তু প্রায়ই তার মধ্যে এসে পড়ে যত বেশ চিন্তা, বেশ ভাব, যে সকল কথা ঐদিন কখনো মনের মধ্যে উদয় হয়েছিল সেগুলোই হঠাৎ সাননে এসে হাম্বির হয়।

উত্তর : হয়তো সেগুলো আসে ভিতর থেকে বেরিয়ে বাবার জন্য।

যদি বা আসে, সেগুলোকেও তুমি নিবেদন করে দিয়ে তার প্রানি থেকে নিকৃতি চাইতে পারো। ওর কারণও হয়তো তাই; তোমার আত্মস্বরূপ চেতনা চাইছে সেগুলোকে বাইরে

যে ক'রে নিয়ে বিতর্ক হতে। এ সব জিনিসকে লুকিয়ে রেখে কোনো লাভ হয় না, থাণ্ডা চাপা দিবে বলা যায় না যে আড়াল করে দিলেই সব বুচে গেল। তবে চেয়ে তুমি নিজে কেনন তা খোলাখুলি দেখে নেও। অনেক ভালো, যদি যথার্থই প্রস্তুত থাকো সে অবস্থা বর্জন করতে।

যদি তোমার কুচিন্তাগুলিকে বাইরে বেরোতে দিবে এখানে এসে খোলাখুলি হলো, “আমি এমনই” আগ তার গড়ে ভিতরে থাকে অন্যাক্ষপ হবার আশ্পৃহ, তাহলে তখনকার উপস্থিতি তোমার পক্ষে খুবই কাজের হবে; সেই করেকটি মুহূর্তের মধ্যেই তুমি সেগুলিকে ঘোচাবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য পাবে। কিন্তু যদি তুমি সাধুপুরুষ সেক্ষে কিছু না নিয়ে এমনি চলে যাও, তাতে কাজ কিছু হবে না।

চেতনা কাজ করে আপনা হতেই; সূর্যরশ্মির মতো অমানিশাকে ভেদ করে, যত্নকারকে আলোকিত করে। কেবল লোকের এমন অবস্থাতে নিজেকে আনা যাতে আপন যত্নকারকে তুমি ব্লু করতে চাটবে, তাকে আর ঝাঁকড়ে থাকতে চাইবে না। যদি ঐকান্তিকভাবেই চাও তাকে বুচে কেনতে, তবে তাতেই কাজ হবে।

(নীরব থেকে)

এবার আনন্দ দিক থেকে আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই। কেনই বা তোমরা চাও (সকলের পক্ষে তা না হলেও বলছি)—কেনই বা নমন করো যে আনন্দ কাণ্ডে আসতে দলেই বা কিছু উৎকর্ষে চিন্তা নিয়ে ভালো হয়ে আসতে হবে ?

★

প্রশ্ন আপনাব সামনে এসে দাঁড়িয়ে কেবল বশ চিন্তাই করে যেতে থাকুন, তা কি খুব বিশ্বী সেখানে না ? (হাস্য)

উত্তর যদি সে চিন্তাকে তুমি প্রশ্ন দাও তাহলে তা বিশ্বী কথা হয় বটে; কিন্তু যদি তাকে বর্জনই করতে চাও। তখনই ভো স্বযোগে বসে তাকে বর্জন করবার। নিশ্চয়ই সেটিকে স্বযোগ বলতে হবে, কারণ আমার সামনে তার সবত নগ্নতা বেরিয়ে পড়বে; যখন ভকতে অন্যত্র থাকো তখন তাতে নিশ্চয় আলোর এমন উজ্জ্বল রং লেগে যার যে তাকে অন্যাক্ষপ দৃষ্টিতে দেখতে থাকো। সেই বশকে যখন আমার আবদারগার মধ্যে এসে দেখ, তখন তার প্রকৃত স্বরূপটি দেখতে পাও। তাকে বর্জন করার সেই উপযুক্ত সময়।

(নীরব থেকে)

তোমার ভালো জিনিস যদি দিতে আসো, সে খুবই ভালো কথা; কিন্তু খাদ্রাপ জিনিস-গুলো দেওয়া তার চেয়েও বেশী কাজের; সে নিবেদন আরো বেশী দাবী—যদি তা ত্যাগের বন নিয়ে দেওয়া হয়, পরে আবার ফিরে নেবার ইচ্ছা না থাকে।

(৫)

প্রশ্ন : আপনি বলছেন, “যখন কোনো বিপত্তি আসবে তখন নিজেকে প্রসারিত করবে”, একপাশ অর্থাৎ কি ?

উত্তর “বিপত্তি” নামে বলেছি যোগের পথে বিপত্তি, দুর্বোধাত্মা দুঃসাহায্য, অক-
রোধ, যা ত্রোমাব যত্নগতের পক্ষে অস্ত্রায় হতে পারে। আর “প্রসারিত করা” নামে
আপন চেতনাকে প্রসারিত করা।

বিপত্তি আসে অহং থেকে, অর্থাৎ ব্যক্তিগত অহংবাক্তি প্রতিক্রিয়া থেকে। সেগুলি
সেখা দেয় ঘটনাবলী সম্পর্কে, নিকটস্থ ব্যক্তির সম্পর্কে, ভীদনের নানা মূর্তিনাটির
সম্পর্কে। তা আসে আসে আপন খোলকের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে, যা বৃহত্তর বাস্তবে
তোমার চেতনাকে পৌঁছাতে সেনা।

তুমি চমকো আপন ভাবনাতে নিজেই প্রসারিত করে বিশ্বাস হতে চাও, চমকো বলে
জাবে যে সবই যখন ভাবনালয় তখন তোমার স্বার্থ বলে কোনো কথাই বইল না,—মনে
ভাবতে পারো তুমি অনেক কিছুই—কিন্তু তাতে রোগ লাগবে না। প্রায়ই তো জানা থাকে
যে কোন কাজই তোমার করা উচিত, কিন্তু নানা কারণে বাস্তবে তা করা হয় না।

কিন্তু যখন মনোবান হতে হয় সাক্ষ্য দুঃখের, ব্যাপার, মনঃকষ্টের, অস্বস্তির—এই-
গুলোই যখন চমক পড়েন বাধা, তখন যদি তোমার মূল সেহচেতনা দিয়ে সোধ করতে থাকো
যে নিজেই তুমি যত্ন বাড়িয়ে প্রসারিত করে দিনে, (এমন বোধ তখন নিশ্চয় আসে যে তুমি
ওটিবেহাট্টিয়ে কুন্ডে গেছ, যেমন করে কাপড় তাঁত করা হয় পাটে পাটে),—যদি বোঝো
যে এমন করে বুনড়ে মূর্ছকে আহ বলেই তুমি নড়াচড়া করতে পারছ না, তাই বুঝে যদি ধীরে
ধীরে সমস্ত তাঁতগুলি মূলে নিজেই ছড়িয়ে দিতে পারো,—অর্থাৎ সংকীর্ণতা থেকে বহুতা
সত্ত্ব নিজেই লিঙ্গ করে দিনে, যতদূর সম্ভব নিজেই বেনে ধরেন “আলোর দিকে মুখ
করে” (তাই নামে নিজেই কষ্টকে বৃহতে জড়িয়ে ওটিব্রটি হয়ে না থেকে নিজেই বুক
চিড়িয়ে সোজা করে দিনে যতটা সম্ভব, আর কষ্টের কারণটিকে ধরলে উপরের আলোর অভি-
বুধে),—এমনি যদি সকল অংশ দিয়ে করতে পারো, কেবল মনের অংশই নয়, অবশ্য
সকল বাহ্যে তাতে সফল না হতেও পারো,—কিন্তু যদি অস্ত্রত করণনা করতে থাকো যে বাস্তব
জাবে সেহের দিক থেকেও তাই করছ, তবে তাই করতে করতে যখন নিজেই মূলে ছড়িয়ে
দিতে পারবে, তখন দেখবে যে তোমার কষ্টের ভিন ভাগ চলে গেছে। বাকী থাকবে কেবল
উপরের আলোকে গ্রহণ করা, তাতে অবশিষ্টটুকুও দূর হয়ে যাবে।

মনের চিত্তার কোর খাট্টিয়ে কষ্টের সঙ্গে গড়াই করতে থাকার চেয়ে এ অনেক সহজ
কাজ,—কারণ যখন নিজেই সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে যাবে তখন দেখবে যে পকের ও বিপকের

দুই বুদ্ধিই এত অকালি যে উপনের আলো ছাড়া ঐ স্বপ্নের সত্য থেকে ভুলি নিকৃতি পাবে না। কিন্তু এর বেলা সে কথা নয়, কঠোর সত্যে লড়াতে যাবার পরকার নেই, নিজেদের ঘোষণাতে চেষ্টা করার পরকার নেই কেনন আলোর দিকে নিজেকে বেনে পেওতা, যেমন সমুদ্র-বেলাতে গিয়ে আলোর দিকে যা খুলে দিয়ে গুয়ে পড়ো, সেই আলোকে সেদের উপর কাহ করতে পাও। বোনের উপর এই কথাই বলেছি।

*

প্রশ্ন : নিজেকে ভালতে পারার সব চেয়ে সহজ উপায় কি ?

উত্তর : প্রত্যেকের নিজের নিজের উপরেই তা নির্ভর করে। প্রত্যেকেরই নিজেকে ভালার একটি রাস্তা আছে, তাই তার পক্ষে সব চেয়ে ভালো। তবে সাধারণ উপায় একটি আছে, যাকে বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ করতে হয়; অর্থাৎ বিষয়ান্তরে নিপু হওয়া। কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যাপৃত না থেকে অন্যের বা অন্যদের বিষয়ে মনোযোগ পাও, কিংবা কোনো একটি কাজ নিয়ে লাগো, কিংবা এমন কিছু নিয়ে থাকো যাতে খুব একাগ্রহে আসতে হয়।

এখানেও সেট একটি কথা কেবল নিজের বিষয় নিয়ে উল্টেপাল্টে ভাবতে এবং তাই নিয়ে আত্মপাক করতে না থেকে, জগতের মধ্যে শুধু নিজের ভাবনাটাই সব চেয়ে দারী এমন কথা না ভেবে—যদি নিজেকে খুব ছড়িয়ে বিতে পারো আর “আমি আমি” ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকো, তাহলে তাই হবে নিজেকে ভালার সব চেয়ে বরিত এবং সহজ উপায়।

আরো উপায় আছে, কিন্তু এটাই সকলের পক্ষে সাধ্য।

সামান সব ছেলেবেলায়, ভোনা এই কথাটি স্মরণ রেখো।

এ বিষয়ে বা অন্য কোনো বিষয়ে যদি ভোনাগের আর কিছু বলবার না থাকে তাহলে এসো, এনার আনন্ড একটি নীরব হয়ে থাকি।

(৬)

স্বতঃস্ফূর্ততা

বোধ করি অনেকেই ভোনা এই তত্ত্ববারে এখানে এস এই “Wu Wei” নামক বইখানি থেকে (নাওৎসের দার্শনিক তত্ত্ব অবলম্বনে কাহিনী) কিছু শুনতে। যদি ভবেন থাকে তাহলে দ্রষ্টব্য নেন আছে, ওতে বলা হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ততা সত্যে, যার দ্বারা সত্যের স্বীকরণ সত্যভাবে চলাতে পারে।

নাওৎস বলেন যে স্বতঃস্ফূর্ততা মানে সেখানে আপন ব্যক্তিগত দেহ-প্রাণ-মনের

ভরস্বে কোনো ইচ্ছাই থাকবে না, জোয়ার সব কিছু বাহ্য চেষ্টাক্রিয়া খেঁদে যাবে, চীনারা যাকে 'ভাও' বলে তার দ্বারাও তিনি সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত হতে থাকবে। তাও বলতে বোঝার ভগবান, পরাতত্ব, নিশ্চয়ের মূল, স্বষ্টির মূলকারণ, অর্থাৎ মানুষের মনে ভগবান রয়েছে এবং চরম লক্ষ্য রয়েছে যত কিছু স্বকরের দ্বারা আছে তা সবই।

কোনো কিছু ক্রিয়া বা তার বোঝনা করা, কোনো কিছু সিদ্ধান্ত করা, উপলব্ধির চেষ্টা করা, এ সবই ব্যক্তিগত কোনো প্রচেষ্টা বা চিন্তাই থাকবে না, তাই হলো স্বতঃস্ফূর্তের অর্থ।

প্ৰকৃত স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া কেমন হয়, তার দুটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। একটির কথা জেন্সা সকলেই জানেন ; ১৯১৪ সালে শ্রীযত্নবিশ্ব স্বনাম "আর্থ" পত্রিকা লিখতে শুরু করেন। মানসিক জ্ঞানের মাধ্যমে আপনি মনের দ্বারা তিনি কিছুই লেখেন নি ; বরং নীরব করে তিনি বলতেন চাইপরাইটারের সাহায্যে ; যা কিছু লেখা হবে তা উপর থেকে আসতো, তিনি কেবল যন্ত্রের মতো আঙুল চালিয়ে তা কাগজে ছেপে যেতেন। এমন মানসিক নীরবতার অবস্থাতেই উপরের বক্তব্য ভাষার মধ্যে মনে আসে ; এইভাবে তিনি প্রতি সাতের "আর্থ" পত্রিকার ৬৪ পাতার সম্পূর্ণ চাই লিখে যেতেন। আর সেই কারণেই তিনি তাতে সক্ষম হতেন, মনের দ্বারা অতটা রচনা করতে চাইলে তা অসম্ভব হতো।

• একেই মনব প্ৰকৃত স্বতঃস্ফূর্ত মনের ক্রিয়া।

আমো বেশী যদি জানতে চাও, তুমি যে কি বলতে বা লিখতে চাইছ তা আগের থেকে একেবারেই ভাববে না না মনে গড়ে তাবে না ; বরং শুধু নীরব করে দেখে, তাকে শূন্য আধারের মতো করে উর্ধ্ব চেতনার দিকে ধুলে ধরবে, আর উপর থেকে যা আসবে তাই শুধু প্রকাশ করে যাবে। তাই হবে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া ; তবে এ সহজ কথা নয়, এর জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি চাই।

আবার যদি তুমি জানো কর্ণের জগতে, সেখানে আমো বেশী কঠিন কথা ; কারণ সাধারণ অবস্থাতে বুদ্ধিপূর্বক কিছু করতে গেলেই আগে ভেবেচিন্তে সব ঠিক করে নিতে হয়। নতুবা জোয়ার নিজেই যত কামনা ও বোঁক আছে তাকে জোয়ারে এমন জারগায় নিয়ে ফেলবে যা এই বইতে লেখা উচ্চতরপ্রণয় থেকে বহু দূরে। তখন নিম্ন প্রকৃতিই তোমাকে চান্নাতে থাকবে।

তাই যতকণ পর্বত সেই চীনা মহাশয়ের প্রজ্ঞা ও নিলিখিত অর্থায় গিয়ে না পৌঁছতে পারছ, ততকণ পর্বত কর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত হতে চেষ্টা করো না, তাতে নিজের বোঁক ও নিম্ন-প্রকৃতির কবলে পড়বার আশঙ্কা থাকবে।

কিছু যদি তুমি এই যোগের পথে চলো, তাহলে তখন খুবই দরকার যাতে আপনি মনের গঠনগুলির অধীন হয়ে না থাকেন। স্বাধা, প্রকৃত অনভূতিক যদি পেতে চাও, তাহলে কেবল অনভূতি পেতে তুমি ইচ্ছা করবে এক্সপারিমেন্টে বোটেই প্রশ্ন দেবেনা, সেদিক দিয়ে কোনো প্রত্যাপাই যেন না লাগে। কারণ আমি বলবার বলছি যে মন যা গড়ে তা বাস্তবতা পায়, তাও হয় এক বাস্তব স্বষ্টি, আর তখন সেই জিনিসই জোয়ার থেকে বেশি

আবার জোনার মধ্যে ফিরে আসে এমনভাবে যেন বাইরের কিছু এসে, আর তাকে ঝাঁট অনুভূতি বলে জোনার ভুল হয়। কিন্তু ইচ্ছিত বা পূর্বকল্পিত কোনো জিনিস ঝাঁট স্বতঃ-প্রসিষ্ট অনুভূতি নয়, তা হয় অলীক স্বপ্ন, এবং তা বিশুদ্ধমনকও হতে পারে।

অতএব মনকে রাখতে হবে শাসনে, বিশেষ স্বকর্মে সতর্ক থাকতে হবে যাতে আগের থেকে কোনো ইচ্ছা বা ধারণা এমন না জন্মায় যে আনি অস্বক স্বকর অনুভূতি পাবে, কারণ তাতে বৈকি অনুভূতির সঞ্চিত করা হবে।

যোগের ব্যাঙ্কো এইভাবে কঠোর ও নির্মূল সতর্কতার সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার অবকাশ রাখা নিত্য অপরিহার্য। এই কারণেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা জিনিসটা জোনার মধ্যে রাখা চলেবে না, কাননা বা অতিরিক্ত কল্পনার প্রশ্রয় থাকবে না, বাক্যে আনি বলি “আধ্যাত্মিক আকাশকুসুম” চাওয়া বা অস্টন ঘটায় আকিঞ্চন করা তাও কিছু থাকবে না—নিরাপদে অগ্রসর হতে চাইলে এ সমস্তকেই দরপূর্বক নির্মূল করে ফেলতে হবে।

এই হলো প্রাথমিক ব্যাখ্যা, এর পরে আনি পড়ে শোনাচ্ছি এ বিষয়ে আনি এখানে কি লিখে রেখেছি আর কি তার ব্যাখ্যা। এই সংক্ষিপ্ত সূত্রগুলির সঙ্গে কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার। যে বই-এর কথা বলছি তা পড়ে আবার বা মনে এসেছে তাই লিখেছি; কিন্তু এ ব্যক্তিগত অনুভূতি।

বিবা হতে চাইলে স্বতঃস্ফূর্ততা আনা চাই—এর ব্যাখ্যা আনি এইমাত্র বললাম। তার পরের প্রশ্ন, কেনন ক’রে তা আনা যায়?

তার জন্ত পুরোপুরি সরল থাকা চাই—কিন্তু তাই বা কেনন ক’রে হবে?

সরল হবার জন্ত পুরোপুরি ঐকান্তিক হওয়া চাই—তাও কেনন করে হতে হবে?

ঐকান্তিক হওয়ার জন্ত সমস্ত ভিতরকার সমস্ত ভাগ্যভাগি ও দ্বন্দ্ব বিরোধ ঘোচানো চাই।

তুনি যদি নানা বিভিন্ন ও বিপরীত স্বকর্মের টুকরো টুকরো জিনিসের একটা ছোড়া-ভাড়া ব্যাপার হও, তাহলে জোনার মধ্যে আলাদা আলাদা ভাগ করা অংশ থাকবেই। কোনো অংশ চাইবে দিব্যদীক্ষন লাভ করে ভগবানকে জানতে, তাঁর সঙ্গে বিশেষ গিহের পুরো ভগবন্তার চলে যেতে, কিন্তু অন্য অংশ ভবন চাইবে তার আসক্তির জিনিসগুলি (বাক্যে বলা হয় তার “প্রয়োজন”) নিয়ে থাকতে, সে অংশ কেবল তারই খোঁজে থাকবে, আর তা না পেলেই বেঁকে বসবে। এ ছাড়া আরো অনেকরকম বৈপরীত্য আছে, কিন্তু এটাই খুব প্রধান। আরো আছে, যেনন, তুনি চাইছ ভগবানে পূর্ণসমর্পিত হয়ে তাঁরই ইচ্ছায় চলতে, কিন্তু যেনন এই অনুভূতি আসবে যে তুনি কিছুই নও এবং কিছুই করোনা, ভগবান ছাড়া জোনার কোনো অস্তিত্বই নেই—ভগবান না থাকলে তুনিও থাকতে না, কিছু হতেই পারতে না (ভগবানে ঐকান্তিক সমর্পণ এই অনুভূতি প্রায়ই আসে এবং তাতে আরম্ভানে আরো সমায়জ

করে)—অরনি সঙ্গে সঙ্গে তোমার সত্তার অন্য অংশ যোগ বিস্তার প্রকাশ করে বলে বলবে, “খানো যে বাপু, আমি কিন্তু থাকতে চাই, যখন আমি একটা কিছু হয়ে পড়িয়েছি তখন আমার নিজের কাজ নিজে করতে চাই, আর আমার ব্যক্তিগত থাকবে বৈকি।” তবেই দেখ, এক অংশ যা করতে গেল অন্য অংশ তাকে ব্যর্থ করে দিলে।

এগুলি ব্যতিক্রম নয়, নিত্যই এই চরে থাকে। সত্তার ভিতরকার এমন বৈপরীত্যের দৃষ্টান্ত অনায়াসে পাওয়া যায়। একটা অংশ যেমন এক ধাপ উঠতে চেষ্টা করে, অন্য অংশ অবনি তাকে ফেলে দেয়। এইভাবে পুনঃ পুনঃ ত্রুটির চেষ্টা আর ভেঙে পড়া নিত্যই চলতে থাকে। এইজন্যই এখানে ঐকান্তিক ক্রিমার সরকার; যখন দেখবে যে কোনো অংশ জোনাথে বিপরীত দিকে চানছে, সাবধানে তাকে হাত করবে, শিল্পকে যেমন করে দেখায় তেমন করে তাকে দেখাবে কেন্দ্রাঙ্গের সঙ্গে মিল রেখে চলতে। এ ঐকান্তিক ক্রিয়াকে নিত্যই অপরিহার্য।

মিল অবশ্যই থাকা চাই। সত্তার সকল দিকের ইচ্ছার মধ্যে সঙ্গতি থাকা সরকার, যাতে তা সনগ্রহভাবেই হতে পারে সরল, স্বচ্ছ, সনন্দী, সমচেতিত। পুরো সত্তাই যখন এক ভাব নিয়ে একই ক্রিয়াতে কেন্দ্রীভূত হবে তখনই আসবে স্বতঃস্ফূর্তের অবস্থা। কারণ, যদি তোমার একটা দিক ভগবানের দিকে ফিরে সেখানকার ইঙ্গিত ও প্রেরণা চাইতে থাকে, আর অন্য একটা দিক চায় তার আপন স্বার্থ আর আপন হাসনাকে পূর্ণ করতে, তাহলে কোনো দিকেরই বীনাংসা হয় না।—এর ফল কি পড়াবে তাও বলতে পারো না, কারণ দুই দিকে কেবল কাটাকাটি চলতে থাকবে, কোনো দিকেরই কাজ কিছু হবে না।

পঞ্চকালে, এই বইএর কি নির্দেশ যদি ছানতে চাও, এতে বলছে যে তোমার কি চাই আর কি করা চাই তা আগে স্পষ্ট করে আনো, কিন্তু তাই নিয়ে জোর করতে বা অতিরিক্ত হীকুপাঁকু করতে যেও না, কারণ তাতে শান্তি ও স্থিরতা নষ্ট হবে, তারই বিশেষ প্রয়োজন ব্যক্তির মধ্যে দিব্যচেতনা আসার জন্য।

অন্তএব একটা ভারসাম্য রাখা নিত্যই সরকার; আর যাতে বৈপরীত্যকে এড়ানো যায় তার উপায় করা নিত্যই সরকার; চাফা ও অধৈর্য দূর করা নিত্যই সরকার, বেহেতু ভাঙে অগ্রগতি বাধা পাল; আর লজ্জা দূর করাও বুঝ সরকার, তাতে পা এত ভারী হয় যে চলা যায় না।

অর্থাৎ সেই বুद्धের কথা, তিনি বলেছিলেন যে সকল দিক দিয়ে মহাপথ অবলম্বন করাই সব চেয়ে শ্রেয়।

(৭)

প্রশ্ন : বিশ্বমানবের শক্তি হতে কেমন করে আমাদের মনে চিন্তাগুলি আসে ?

উত্তর : বিশ্বমানবের শক্তি প্রবেশ করে এসে আমাদের মাথার মধ্যে ; তারই ভরসের মধ্যে আমরা ভুবে আছি, অথচ নিজেরা তা জানি না । এমন নয় যে সেমানবেরা বস্তুটির মধ্যে আমরা বদ্ধ আছি—শক্তি প্রবাহ ও চেউএর স্পন্দন সবই আমাদের ভিতর দিয়ে বাতায়িত করতে পারছে । আমাদের মধ্যেও সেওরা আছে মানবশক্তি, তার দ্বারা আমরা গড়তে পারি, কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে পারি ; সেও হলো মুক্ত শক্তি । যাইহোক থেকে কোনো শক্তি-ভরসে যেমন এসে আমাদের চেতনার মধ্যে প্রবেশ করে, অতএব তাকে নিয়ে আমরা একটি বুদ্ধিপ্রাণী মনুষ্যের আকার দিয়ে থাকি ; কিন্তু তিনিই প্রকৃতপক্ষে এসেছে কোনো যজ্ঞাত রাজ্য হতে ।

আর এ যে কেবল বিশিষ্টরূপে মাঝে মাঝেই হতে পারে তা নয়। নিত্যই এমন হচ্ছে । যদি দেখা যেতো তাহলে সেখতে, এক একটা শক্তিরূপ আসছে বিশেষ কিছু চিন্তার গঠন নিয়ে, একজন থেকে অন্যের কাছে তা চলে যাচ্ছে, প্রত্যেকের মধ্যেই আসছে একটা কেন্দ্র-গত ভাবগীতি, তার মনের অভিব্যক্তির সঙ্গে মিল এনে ; তাকেই বলে থাকি “আমাদের” চিন্তা ।

কিন্তু “আমাদের” চিন্তা বলে কিছু নেই । কেবল যদি আমরা এমন সাধারণ অবস্থার এজেন্সি কেন্দ্র হয়ে থাকার বললে (এজেন্সি বলছি এই অর্থে যে আমাদের মধ্যে সকল স্বকর্মের শক্তিস্রোতই অন্যভাবে আসা-যাওয়া করতে পারে এবং পরস্পরের মধ্যে কানিগাটি ও কলহও করতে পারে)—যদি আমরা এক একাধি চেতনান্তে পণিগত হয়ে তেমনি আশুহা নিয়ে মানব-মনের সীমান্ত ছাড়িয়ে উপরের দিকে নিজেদের বুলে রাখি, তাহলে তখন এমন কিছু আসতে পারে যাকে নিজেদের চিন্তা বলা যায় ; ঐক্যপন্থার নিজেদের বুলে রাখতে পারলে ত্রোয়ার সত্তার সকল স্তর ভেদ করে উচ্চতর কিছু মনে আসবে, এবং তা চেতন বন্ধিতের সংস্পর্শে এসে এমন বিশিষ্ট আকার নেবে যা বিশ্বশক্তির তিনিগের মধ্যেও নয় কিংবা শক্তিশালী কোনো ব্যক্তিমনের গড়াও নয়,—তা হবে উপরকার কোনো আলোর নিজস্ব সৃষ্টি, আর আশুহার ও উল্লোচনের তেমন তীব্রতা থাকলে তা চরনতন আলোরও হতে পারে । কেবল সেখানেই বলা যাবে তা আমাদের চিন্তা । নতুবা আর যা কিছু চিন্তা তা শুধু আসে এবং চলে যায় ; আমরা তাকে গ্রহণ করি, তাহার পোষাক পরাই । তা হলো সাধারণ বিশ্বশক্তির চিন্তাতরঙ্গ, কেবল আসাযাওয়া করে, এক থেকে যায় অন্যের কাছে ।

*

প্রশ্ন : কিন্তু বিশ্বমানবই বা চিন্তার সৃষ্টি কিরূপে হয় ?

উত্তর : ভাবের রাজ্য রয়েছে মানবসাম্রাজ্যের উপরে ; সেখানকার ভাবগুলি আদি ও বৌদ্ধিক ; মানব সাম্রাজ্য তাই মনে এসে মানববন্ধ হয়ে গাঁড়ায় । তারপর যে ব্যক্তি তাকে গ্রহণ করে তার প্রকৃতি অনুসারে সেই ভাবটি তার আপন বৌদ্ধিক বন্ধায় রাখে, অথবা তা

নানাভাবে বৈকল্যেরে যাব, তাতে বং নাগে, এবং ব্যক্তিচেনার নগো ত্রা রূপান্তরিত হয়ে যাব। কিন্তু ভাব হলো নবের নাগের উপরকার জিনিস, তার উপস্থিতির অনেক উচ্চ; যখন ত্রা বেনে আসে বিশ্ববাসনে কিংবা নানব মনে, তার জিহ্বা হয় একই বকন; বিশ্বকেত্রে বেরন জিহ্বা, ব্যক্তিকেত্রে তারই প্রতিফলন। তাবের বিভিন্ন ক্রম থাকলেও অভিযাজি ষটে একই প্রকারে। অথবা বাক্যে আনরা ভাবনা বলি সেই হিসাবে তখন ত্রা ভাবনাধীন নর; ত্রা হলো তাবের বিশ্বনর (যদিও কথাটা একই) যার থেকে সকল বিশ্ব নির্মিত।

বস্তুতপক্ষে শাশ্বত সৃষ্টিকার্যের নগো এই বিশ্বকে একটাই ব্যক্তি বলে জানবে। প্রতিটি বিশ্ব হলো এক এক জন, সে গড়ে উঠছে, বেঁচে থাকছে, বিনয় হয়ে যাচ্ছে, আবার অন্য একটি গড়ে উঠছে—সবস্তই এক ব্যাপার। যদিও আনাদের কাছে একজন বানে একটি নানব ব্যক্তি, কিন্তু বিশ্বের দৃষ্টিতে একজন বানে একটি বিশ্ব-ব্যক্তি; সকল বিশ্বের নগো ত্রা একটি বিশ্ব।

(৮)

প্রশ্ন আপনাকে প্রশ্ন করার কোনো অধিকার কি আনাদের আছে, যদি আপনি বা বলেন ত্রা আনরা কাছে না করি ?

উত্তর সব কিছুই অধিকার সকলের রয়েছে। তোমরা আমাকে যেমন খুশি প্রশ্ন করতে পারো। তবে কাছে করার কথা ? যার ইচ্ছা হবে সে ত্রা কাছে করতে চেষ্টা করবে, যার ইচ্ছা না হবে সে করবে না, যার ভীতে প্রয়োজন মনে হবে কিংবা নাই হবে, ত্রাই নয় কি ? এ সব কাউকে ভোর করে করার জিনিস নয়; যেচহায় করা চাই। তবে প্রশ্ন সর্বদাই করতে পারো।

এবার আমি তোমাদের একটি প্রশ্ন করি : “কেউ ত্রা কাছে করে না কেন ?” আনো কি কেউ, কেন লোকে কাছে করতে চায় না ? (না প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন) তুমি আনো ? তুমি আনো ? তুমি.....

একজন বললে—“যোধহয় কুঁড়েবির ছনো।”

ঠিক কথা, কুঁড়েবিরই এক প্রধান কারণ। আবার সেই কুঁড়েবিরকে ত্রা হুজিপুর কৈকিরং নিয়ে চাকো ! একজন বলে, “আমি যে করতে পারি না, আনরা ওটা করতে”, কিংবা একজন বলে, “আমি চেষ্টা করে দেখেছি, ওতে কিছু হয় না,” কিংবা কেউ বলে, “কোনদান থেকে শুরু করব ত্রাই বুঝি না।” নানাবিধ কারণ, যার বেটা মুখে আসে ত্রাই বলে দেয়। অর্থাৎ কাছে করার দিকে ত্রা বেঁচে না, যেহেতু অত কষ্ট করা তাদের পোষায়

না—তাও কুঁড়েঘরই নানাতর, কে অত বেহনত করে! কিন্তু চেষ্টা না করলে যে নোটে বাঁচাই যায় না। সকল চেষ্টাকে যদি ব্যর্থ দিতে চাও তাহলে পায়ের উপর দাঁড়ানোই যাবে না, এক পাও চলতে পারবে না, যেতে পৰ্যন্ত পারবে না।

আমার মনে হয়, বোকে যে চেষ্টা করতে চায় না, তার কারণ প্রথমত এটা তাদের কাছে এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপ্য হয়ে ওঠেনি যাতে একে জীবনের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো জিনিষ বলে বোধ হতে পারে, আর দ্বিতীয়ত চেষ্টা ব্যর্থমানি করবে ফল তত্বমানি হবে বলে ভাঙ্গা মনে করে না কিন্তু সেই ধরনের কষ্টকর চেষ্টা ভেবে কেবল প্রথম দিকের বেরাতেই একবার যদি ভিতরে ঢুকে যেতে পারো, তখন আর তা সেই একই রকম নয়।

★

আমার কাছে তোমরা জানতে চাও যে তোমরা কি করবে! তা জানার চেয়ে বরং জানতে চাও তোমরা কি হবে, কারণ জীবনের ঘটনা ও কাজগুলির তত্ত্ব দান নয়, জাতি আবেগের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয় তারই বেশী দান।

মানুষের এমন প্রকৃতি যে তুমি যেমের দিকে একাগ্র হলেই নিত্য অসুস্থ হতে থাকবে, সমানুভূতি লাভের দিকে একাগ্র হলেই অসুখী হতে থাকবে, আর মনের দিকে একাগ্র হলেই চিন্তায় বিপর্যস্ত হতে থাকবে।

এমন গোনেনেলে অবস্থা হতে মুক্তিলাভের দুটি উপায় আছে।

একটি উপায় কঠিন; অবিশ্য কঠোর তপস্যায় রত থাকা। যাদের ধাত খুব শক্ত আর যাদের তাই পূর্বনিয়তি, কেবল তারাই তা পারে।

অন্য উপায় হলো এমন কিছুতে নিবিষ্ট হওয়া যা তোমার চিত্তকে সেই দিকেই নিত্য উন্মুখ রেখে তোমার আপন ক্ষুদ্র ব্যক্তি-আবিষ্যকে ভুলিয়ে দেবে। বড়ো রকমের কিছু আদর্শকে হয়ে থাকাই সব চেয়ে ভালো, তবে নানা জিনিসকে সে পথেই ফেলা যেতে পারে। অনেক বিয়ে করাকেই পছন্দ করে, কারণ তার উপায়টি সব চেয়ে সহজে বেলে। একজনকে বিয়ে করে তাকে ভালোবাসলে, তার পর ছেলেমেয়েদের উপর ভালোবাসা পড়ল, এই নিরৈষি সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয় বলে তাতে তোমার ক্ষুদ্র আনিষ্যকে ভুলে যেতে বাধ্য করে। কিন্তু খুব কম ছাত্রগোষ্ঠেই তা বাধ্যবে সফল হয়, কারণ ভালোবাসা জিনিসটা এত সস্তা নয়।

অন্য অনেকে যায় শিরপচর্চার দিকে, কেউ বা বিজ্ঞানের দিকে, সামাজিক কাজের দিকে, রাজনীতির দিকে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু যে পথই বেছে নাও, তাকে অনুসরণ করতে হবে পুরো ঐকান্তিকতা ও ধৈর্যশক্তি নিয়ে, শাকল্যের সব কিছু নির্ভর করছে তারই উপর। কারণ সে পথেও থাকবে অনেক বাধাবিঘ্ন, তাকে অতিক্রম করা চাই।

জীবনে চেষ্টা ও সংগ্রাম ছাড়া কোনো কিছুই করা যায় না।

বীভীষ্মত পুরাণ ও সংগ্রাম করবার জন্য যদি প্রস্তুত না থাকে, তবে জীবন হবে নিরুৎসাহ ও নিয়ানন্দ, এবং তাই নিয়েই চূর্ণচাপ সস্ত্র খাঙতে হবে।

★

সাধারণত আদি যখন যা বলি তাতে তারিখ দেওয়া হয়, কিন্তু তারিখের দিকে সকলে নজর দেয় না। কেনন করে তারা আগের কথা বিশিয়ে ফেলে আগের সম্পূর্ণ স্বত্বাভারের কথাই সঙ্গে।

এমন অনুভূতিও অবশ্য আছে যা স্বাক্ষরের বাইরে, অর্থাৎ সাধনে, পিছনে, উপরে, নীচে, সবই এক কথা। তাকে একাত্মভাবে অনুভব করার সময় অতীত বর্তমান যা ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকে না। প্রকৃতপক্ষে তেমন ভাবে জানাই হলো একমাত্র যথার্থ জানা।

অভিজ্ঞতা যতই বেড়ে চলেতে থাকে ততই আবার মনে হয় যে, পুরোনো দিনে যখন যা ভা বেলে কেউ ব্যাপারের আপপাশে ঘুরে বেঁধেনে মেনে দেখতে পাচ্ছে তাই বলে যাচ্ছে। কিন্তু একটা সময় আসে যখন তিত্তরে চুকে পড়া যায়, তিত্তরকার জিনিস আরো ভালো করে দেখতে পাওয়া যায়। আদি তেমনি এখন তিত্তরে চুকেছি, দবেনাত্র তিত্তরের দিকে যেতে শুরু করেছি।*

* Bulletin থেকে। অধ্যায়—দ্বিপত্নিত ওষ্টাচার

যোগসম্বন্ধ-প্রসঙ্গ

অনির্বাক

[বিভীষ পাথ—স্বাক্ষ-জ্ঞানযোগ]

১৪

ব্রহ্মে অস্পন্দ ও স্পন্দ

আনি' আছি আর জগৎ আছে—এই অনুভব হল বাস্তবজীবনের বনিয়াদ। জগতের সঙ্গে আমার একটা সেনসেটেন্স কারবার আছে, যার হিসাব সহজ নয়। তাকে সহজ করার অবিরাম প্রয়াস হল জীবনযাত্রার ভাবপার্থ। প্রত্যাহার সিদ্ধি আসতে পারে দুদিক থেকে—জগৎকে বদলে দিবে, অথবা নিজেকে বদলে নিয়ে। আগেবটা হল বিজ্ঞানের সাধা, পরেরটা দর্শনের। অবস্থা দুয়ে কোনও বিরোধ হবার কথা নয়, তবুও বিজ্ঞানের কানবার খাইরকে নিয়ে আর দর্শনের কানবার ভিতরকে নিয়ে—এই থেকে একটা বিরোধভাগ দেখা দেয় বই কি। কিন্তু আমরা গনন্যবাদী, তাই বিরোধকে আমরা কখনও একান্ত করে দেখি না। তবে তার সমাধান আগে বুঁজি অস্ত্রে, তারপর তাকে প্রয়োগ করি বাইরে। দর্শন এমনি করে হয়ে ওঠে যোগ—যাকে বলতে পারি দর্শনের ফলিত সিক বা বিজ্ঞান।

অস্ত্রাবৃত্ত হয়ে আত্মসত্তা আর বিশ্বসত্তার মাঝে সবন্যুপাধানের প্রয়াস হল যোগ। এই সবন্যুপাধানে সেই বৃহত্তর চেতনায়, যার মাঝে আনি আর জগৎ দুইই বিধৃত। আমার এই বৃহত্তর কেন্দ্র কিন্তু আনাতেই। আমার আত্মচেতনোর বিস্ফোরণেই শ্রাব্যচেতন্য। আনি বন্ধন বৃহৎ হই, জগৎকে তখন ছাপিয়ে উঠি। জগৎ তখন আমার মাঝে। আমার বিস্ফোরিত চেতনার পরিণতনের মাঝে সে আছে বলেই তার দৃশ্য আশ্রয় তখন নিচলিত করে না। শুধু তাই নয়, চেতনার বিস্ফোরণে বৃন্দয় জগতের গভীরে এবং তাকে ছাপিয়ে চিন্ময় জগতের ক্রোধান্বিতরওলিও তখন আমার কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। তাইতো দিব্য-সম্বলপের প্রবর্তনায় হৃদয়ের প্রশাসনও সহজ হয়। আরম্ভিত ভোগ এবং ঐশ্বর্যের সবন্যুপাধানে এই অবস্থা হল ব্রাহ্মী-বিস্তারের পরম জুবি।

এই অবস্থায় পৌঁছবার দুটি ধায়া আছে। একটি ধায়া ক্রমবিকাশের অর্থাৎ চেতনার ক্রমিক স্তুরণের, আরেকটি উন্নয়নের। প্রথমটি হল, উষার আলো যেমন ধীরে-ধীরে স্বাভাবিকভাবেই ফুটে ওঠে, তেমনি সেই প্রাণ বন বিজ্ঞান ও আনন্দের চেতনায় ভিত্তর দিয়েই

আর চৈতন্যের আশ্রয় উদ্বীর্ণ হওয়া—কোনও কিছুকে বাধা না দিয়ে। গোড়া হতেই একটি অখণ্ড পরিব্যাপ্ত এবং বর্তুল বোধ হচ্ছে তার সাধন। এ যেন সমস্ত বীজের বহন বৃহত্তর আবেশে প্রতিনিহত উদ্বীর্ণ হয়ে বিচরণ করা। আর উন্নয়নের রীতি হল প্রাকৃত ভূমি হতে ন্যাকাতর ভূমিতে চেতনাকে সবেশে উৎকীর্ণ করা। এখানে-ওখানে তখন দুইর বাসধান। আর এ-বাসধানও নবের কম্পনা। তাই এ-পদের প্রধান সাধন হল নব : নবকে ধরেই নবের উদ্যানে বাওয়া, বোধকে দিয়ে তাকে জাগিত এবং রূপান্তরিত করা হয়। তাইতে চিন্তার সিঁড়ির তুঙ্গভূমিতে গিয়েও চেতনার নবের বৈতসংখ্য একেবারে মুছে যায় না। পূর্ণযোগের সাধনার এও একটা নবের বাধা, স্তম্ভ : তার বিশেষণ দরকার।

*

*

*

জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছি বলে দুঃখ পাচ্ছি। এই দুঃখ হতে মুক্তি চাই। এই মুক্তির তাগিদে সাধক ধরে প্রত্যয়ের পথ, তীব্রসংবেগে জগৎ আর জীবন হতে ছিটকে সে বেরিয়ে পড়তে চায়। তখন বিবেক আর বৈরাগ্য তার প্রধান সাধন। বিবেক তাকে শেখায় প্রেম হতে শ্রেয়কে তফাত করতে, আর বৈরাগ্য আনে প্রেমের প্রতি বৈতুফা। সেই প্রাণ বন আর অহং দিয়ে আনন্ড যা পাই, তা কখনও পুরাপুরি পাওয়া নয়। সে-পাওয়ার বিড়ম্বনা পদে-পদে। তাই চাওয়া-পাওয়ার আনন্দ একেবারে চুকিয়ে দিয়ে সাধক এমন-একটা ভূমিতে পৌঁছতে চায়, যেখানে চেতনার অপরা-প্রকৃতির কোনও তরঙ্গই ওঠে না। এই ভূমির পারিভাসিক নান পুরুষের স্বরূপগতি বা কৈবল্য। পুরুষ তখন প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত। যতদিন সে প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, ততদিন তার নাথে তিনটি বৃত্তির খেলা চলছিল—ঐদ্বৈত ভোক্তা এবং কর্তৃক। এখন তার চেতনায় শেষ দুটির পাট চুকে গেছে—তার ভোগ নাই কর্তব্য নাই, আছে শুধু ঐদ্বৈত।

এই স্বরূপগতির গাঢ়তার মাঝার তারতম্য আছে। তা চেতনার নিবর্তনের (regression) স্বাভাবিক নিয়মকে অনুগমন করে চলে। প্রাকৃত ভূমিতেও আমরা প্রতিদিন স্বরূপগতির দিকে ঝুঁকি, যখন জাগ্রৎ থেকে স্বপ্নের ভিতর দিয়ে স্মৃষ্টির মাঝে তলিয়ে যাই। কল্পিত প্রাকৃত স্মৃষ্টি আর যোগের সনাতন একদিক দিয়ে সমর্থনা, দুয়েরই লক্ষণ হচ্ছে বৃত্তির নিরোধ। দুয়ের মাঝে তফাত এই, স্মৃষ্টি আসে অবশেষে আর অজ্ঞানে, কিন্তু সনাতন আনন্ড স্ববশেষে এবং সজ্ঞানে। যখন স্মৃষ্টি থেকে জাগ্রৎ, তেমনি আবার সনাতন থেকেও ব্যাধান। কিন্তু ব্যাধানে সনাতন প্রত্যয়ের ত্রৈলোক্য থাকে ; শুধু তা-ই নয়, আবার সেই সনাতনের মাঝে ভলিয়ে বাবার একটা বোঁকেও পেয়ে বসে—সুরকাতুরের বুকে পাওয়ায় বত। এই থেকে নিবর্তনের পথে সনাতনচেতনার জাগ্রৎ স্বপ্ন স্মৃষ্টির বত পর-পর স্বরূপগতির তিনটি ভূমি দেখা যায়। প্রথম ভূমি জাগ্রৎ-সনাতন : পুরুষ তখন ভীত থেকে অগত্যা দেখেন ছবির মত। গভীরের আকর্ষণ আরও প্রবল হলে আসে স্বপ্ন-সনাতন ছবিটা তখন স্বাপনা,

স্বপ্নের নত অবান্তর। 'আরও গভীরে হৃদয়-সমারি : তখন স্বপ্নও নিদ্রায় গেছে, কোথাও কিছু নাই—না ধূপ, না ঝুট।

মন বলে, এই শূন্যতাই একমাত্র সত্য—জগৎ মিথ্যা, ব্যবহার মিথ্যা। যৈতের সংস্কার মনের মাঝে প্রবল, হৃদয়ও অশ্রুতের একটা দিক সত্য, আরেকটা দিক মিথ্যা—এমন একটা ভাগাভাগির আগ্রহ তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বোধি বলবে, শূন্যতায়ও সত্য, কিন্তু তাবলে জগৎ মিথ্যা নয়। তুমি যখন ঘুমিয়ে পড়, তখন জোয়ার কাছেই জগৎ থাকে না, কিন্তু জোয়ার অবোধের বাইরে তার একটা শাশ্বত সত্য থাকেই। তেননি ভোগ আর কর্মের কৃত্রিম প্রাকৃত রূপই একমাত্র সত্য নয়, তাদের মিথ্য রূপান্তরের সত্ত্বাবনা তার চাইতেও বৃহৎ সত্য। মন বঃলশী, সে দেখে বাস্তব দিক থেকে ; তাই তার মর্শনে বিরোধ থাকে। কিন্তু বোধি অঃলশী, সে দেখে সমস্ত দিক থেকে ; তাই বিরোধাত্মকের সমাধান তার পক্ষে সহজ। পূর্ববোধের মুখা সাধন বোধি, মন তার অনুচরমাত্র।

*

*

*

অঃল সত্যকে জানতে হলে উজান-ভাটা দুটি ধারারই ধর গ্রাণ দরকার। পূর্ব-বোধের সাধনায় তাই শূন্যতার দিকে উজিয়ে যাবারও দরকার আছে। তবে কি না এ উজিয়ে যাওয়া জগৎ বা জীবনকে বাদ দিয়ে নয়। জগতের এই উচ্ছন্নতার মাঝেই আছে বিজ্ঞতা, বহুর বেলান্তেই সমাধিত হয়ে আছে একের নিঃসঙ্গতা। সেইটি আবিষ্কার করে চেতনাকে তার মাঝে ডুবিয়ে দিতে হবে।

আকাশভাবনার এ সহজ হতে পারে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি মহাকাশের বিস্তৃত—পরিত্যাগ প্রণয় প্রসন্ন এক শূন্যতা। অথচ সে সবার মাঝে অনসূত। সবাইকে আবৃত এবং আবিষ্ট করে সবার সবাইকে সে ছাপিয়ে আছে। এই আকাশ যেন আমার বাইরে, তেননি আমার অন্তরে। বাইরে ভূতাকাশ, অন্তরে চিদাকাশ। আকাশের আনন্দ্য আর বিজ্ঞানের আনন্দ্য এক।

এনি করে বাইরে-ভিতরে আকাশ দেখতে-দেখতে আকাশ হয়ে যাওয়া। মন তখন দেখে, ভাব আর বস্তু নাম আর রূপ এই আকাশের বুকে আলগোছে ভেসে চলেছে। জ্ঞান মিথ্যা নয় বিদ্যন নয়, আবার নিরেট ব্যস্তও তত্ত্ব নয়। সত্যাকার ব্যস্ত হল আমার চিদাকাশের অগাধ প্রশান্তি। সেখানে কোনও ক্রটি নেই, হৃদয়ও চিত্তও নাই। অথবা চিত্ত যদি থাকেও, আছে চেতনা হতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত হয়ে। এতদিন চিত্তের সঙ্গে ভড়িয়ে ছিন্নান, তার তরঙ্গারণের বাইরে আমার কোনও অস্তিত্বকে বুঝে পাইনি। আজ দেখছি, চিত্তের দোলা মহাপ্রকৃতির একটা ব্যাপার মাত্র। সব চিত্তই এক অলক্ষ্য শক্তির স্পন্দনে স্পন্দিত হচ্ছে, আমার বা জোয়ার বলে তাদের চিন্তিত করা মুঢ়তা।

এই হল সাংখ্যের বিবেকমর্শন। একদিকে পুরুষের নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি, আরেকদিকে প্রকৃতির ঔপবিক্যেত বা শক্তিপরিণাম। অজ্ঞের খেলা প্রাণের খেলা মনের খেলা সবই এক

স্বাধীনতার স্পন্দন। সব তারই দেহ, তারই প্রাণ, তারই মন। জীবন-আমার এক-তার
সবার দেহ-প্রাণ-মন একই প্রকৃতির নিয়মে একই ধরনে স্পন্দিত হচ্ছে। হুতরাং প্রকৃতির
বিক দিয়ে জড়ে-প্রাণ-মনে তকাত করবার জো কোনও প্রয়োজন নাই। স্বচ্ছন্দে বলা চলে
সবই অর্জ—কেবল ওদের মাঝে ওদের তারতম্য। ভাষাকথিত জড়ে তবোওঁদের প্রাণনা,
প্রাণে হজোওঁদের, আর মনে সবওঁদের। স্বচ্ছতার তারতম্য ওঁদের তমাত। পুরুষ
সম্পূর্ণ স্বচ্ছ—স্ফটিকের মত; আর প্রকৃতির মাঝে কানো-মান-সাদা রংএর খেলা।
পুরুষের নিখের কোনও রং নাই। তবুও প্রকৃতির সান্নিধ্যে তার গায়ে রংএর ছোপ পড়ে।
কিন্তু ইচ্ছা করলেই সে প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যেতে পারে। তখন তার গায়ে রংও
অদৃশ্য হয়ে যায়।

এই পুরুষ চিত্তবস্তুরূপ। যে-চেতনো কোনও রং নাই, তা হল ব্রহ্মচেতন্য, জোতুচেতন্য
আর কর্তৃচেতন্য রং আছে। চেতনা তখন অজিয়ে গেছে রস আর শক্তির মঙ্গ, অর্থাৎ পুরুষ
প্রকৃতির সঙ্গে। আবার ভোগ আর কর্ম প্রাকৃত। তারও মধ্যে অজিত আছে আমার ব্রহ্ম বা
মানব। তবে বিত্ত্ব হয়ে নাই। ভোগ আর কর্ম হতে তাকে যদি আলোশ করে নিতে
পারি, তাহলে তা বিত্ত্ব হয়। বিত্ত্ব ব্রহ্ম রংটুট। তাই পুরুষের বস্তুরূপিত।

মাংসের এই বিশ্লেষণ ব্যক্তি আত্মকে নিয়ে। আত্মার এই বস্তুরূপ যদি বিশ্লেষণ উপ-
চরিত করি, তাহলে পাই বেদান্তের নির্ভণ-বুদ্ধবাদ। মূলত দুটি দর্শন এক।

*

*

*

মাংসের বিবেকদর্শন পূর্ণযোগের সাধনার অপরিহার্য কিন্তু ঐকান্তিক (exclusive)
নয়। প্রকৃতি থেকে পুরুষকে বীরা একান্তভাবে বিবিক্ত করতে চান, তাঁরা ওঁর মনের নয়,
প্রাণের ও মনের ক্রিয়াকেও নিরুদ্ধ করে জীবনমুক্ত হওয়ার মনে করেন পুরুষার্থ। কিন্তু
পূর্ণযোগের সাধক তা চান না। তিনি চান জীবনমুক্ত হতে। তার প্রাথমিক সাধন হল
অন্তরের ভাবনা বেদনা ও সম্বলপকে সম্পূর্ণ প্রণবিত রেখে ও বাইরের কর্ম মূকচেটে হওয়া।

প্রণু হবে, চিত্ত যদি নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়, তাহলে বাইরে কর্ম করা কি সম্ভব? কর্মের
প্রেরণা আত্মা পাই মনের আবেগ আর ভাবনা হতে। বৃত্তিশূন্য মনে আবেগ নাই। ভাবনাও
নাই। তাহলে কর্ম চলেবে কিসের জোরে? অবশ্য দেহ-প্রাণের অনেক ক্রিয়া চলে আনাদের
মনের অগোচরে। কিন্তু সমাগ মনের ক্রিয়া জো সেভাবে চলতে পারে না।

আধুনিক বনোবিজ্ঞান কিন্তু একথাও সাব দেয় না। সে বলে, আনাদের ভাবনা বেদনা
ও সম্বলপের অনেকখানির প্রেরণা আসে অবচেতন মন থেকে, সম্বোধনের বেলায় পরের
মন থেকে। বস্তুর সমাগ মন আনাদের চেতনার ব্যক্তনধা মাত্র; তার উপরে-নীচে দুটি
অব্যক্তের বিপুল অধিকার—তার একটি অবমানস, আরেকটি মানসোত্তর। একটির খবর
আত্মা পাই আধুনিক বনোবিজ্ঞানে, আরেকটির বোণবিজ্ঞানে। প্রাচীন পরিভাষা অনুসারে
একটি হল ‘আণর’, আরেকটি ‘বোহি’। বোণে চেতনা অজ্ঞানবৃত্ত হল বোধির উদ্বেগ হয়।

বোধি মনের সাহায্য না নিয়ে “কেবল ইন্দ্রিরের সহারে” নির্বৃত্ত ভাবে মন কাজ করে যেতে পারে—যেমন দেখি, মনের ক্রিয়া হুড়াই ইতরপ্রাণীরা সহজ সংস্কারের বশে এমন-সব কাজ করে যায় যা আমাদের কাছে ঠেকে বিস্ময়কর। বাস্তবিক, আমাদের জাগ্রৎ-মনই বুদ্ধির একমাত্র ভাণ্ডার—এখানথা একটা কৃষ্ণাভার মাত্র। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি বিগুণত এক বিশালবুদ্ধির আংশিক প্রকাশ। সে-বুদ্ধি জড় শ্রাব মন সব-কিছুর মাঝে সক্রিয়। সাংখ্য তার নাম দিয়েছেন ‘বহৎ তত’—যা অব্যক্তের অন্তর্ভুক্ত চিৎশক্তির প্রচ্ছন্নতা। পুরুষ তারও ওপারে। যোগী এই পুরুষে প্রতিষ্ঠিত হলে পর আধারের সমস্ত ক্রিয়া তাঁর বিবিক্ত চেতনার সাননে চলেতে থাকে বহা-প্রকৃতির প্রশাসনে। তিনি তখন অতরে নিশ্চল থেকেই বাইরে স্পন্দিত। বাইরের স্পন্দ তাঁর অন্তরের নৈশ্পল্যকে স্পর্শও করে না বলে তিনি তখন আর প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নন—তিনি স্ব-তত (free)।

এই স্বাতন্ত্র্য আছে বলে পুরুষ তখন কর্ম করেও কোনও কর্ম করেন না, কেননা কর্মের কর্তা তখন আর তিনি নন—পরমপুরুষের অব্যাক্ততার বিশুপ্রকৃতি তখন তাঁর মাঝে কাজ করে চলেছেন। তিনি স্বয়ং কর্মের উদাসীন সাক্ষী মাত্র (গীতা)।

★

★

★

এটি যোগের খুব উচ্চ অবস্থা সন্দেহ নাই, কিন্তু পূর্বযোগের সিক্তির পক্ষে এই উচ্চ স্থিতিও পর্বাশ্রয় নয়। কেন, তা বলছি।

অন্যত্র বলেছি, ব্রহ্মচেতন্যের স্বরূপলক্ষণ চারটি—সত্তা, চৈতন্য, আনন্দ এবং শক্তি। প্রাকৃত চেতনায় সত্তার অনুভব অস্পষ্ট, চৈতন্য আনন্দ এবং শক্তির অনুভব কুণ্ঠিত। এই বাধা দূর করবার জন্য সার্থক অতীত্সার তীব্রসংবেগ নিয়ে ধরেন উজ্জানের পথ। শক্তির স্পন্দ এবং আনন্দের উদ্বেজন নিরুদ্ধ করে চৈতন্যকে তিনি পরাবর্তিত করেন চৈতন্যের মাঝেই। তখন তাঁর দ্বিতি হয় বিভক্ত সন্মাত্র—প্রশ্রুত তখন তাঁর কাছে উপশান্ত। আগেই দেখেছি, এই ব্রহ্মসত্ত্বাভ শেষপর্বন্ত অসং যা শূন্যতার পর্ববসিত হতে পারে। উজ্জান-পথের এই হল অবধি। তারপর ভাটার পানী।

শূন্যতা এবং সত্তা পুরুষের স্বরূপশক্তির এপিঠ আর ওপিঠ—যেমন বাতের আকাশ আর মনের আকাশ। এই আকাশে স্কুরিত হল চিৎসূর্যের প্রভাষের মহিমা—ভাটার দিকে পৌরুষের বোধের এই হল অবধি। এ-বোধে জগৎ ভাসছে, কিন্তু পুরুষ তার ভোক্তা নন, কর্তাও নন—উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র। ভোজ আর কর্তৃ পড়ছে শক্তি বা প্রকৃতির এলাকার, পুরুষ তাহতে বিবিক্ত। পুরুষ স্ব-তত বলে প্রকৃতি থেকে তিনি তক্তাত থাকতে পারেন; কিন্তু এই তক্তাত থাকতেই আরেকদিক দিয়ে তাঁর স্বরূপের পূর্ণতাহানি ঘটে। চতুশাং ব্রহ্মের দুটি পাদকে স্বীকার করা এবং আর-দুটি পাদকে বর্জন করবার চেষ্টা করা—এ তো সত্য-সিদ্ধির পরিচয় নয়।

অথবা বিবিক্ত পুরুষের প্রভাষের চেতনাতেও আনন্দ বা শক্তি বর্জিত হয় না। আনন্দ

সেখানে কোটে প্রশ্নের, শক্তি নিবৃত্তিতে। উন্নাসের রাস টেনে নিশ্পল হয়ে পাকা—তাকেও শক্তির পরিচয় এবং তারও একটা ভূষ্টি আছে বই কি। কিন্তু প্রশ্ন হবে, উন্নাসের প্রতি পুরুষের এই বৈরাগ্যাই-বা কেন? প্রকৃতিকে এত ভয় কেন? অপরা-প্রকৃতি কানপুরুষকে বাঁধে; কিন্তু উন্নাসপুরুষের প্রকৃতি উচ্চস্বা, সে জো পুরুষের স্বাভাৱ প্রকৃতি। তাকে আশ্রয় করেই না পুরুষের স্বাভাৱের সফুরণ—আনন্দে এবং শক্তিতে, ভোগে এবং ঐশ্বর্যে। পুরুষ শুধু উপভোগী নয়—তিনি ভোক্তাও, বহেশ্বরও।

এই অর্থও ব্রহ্মের ভাবনা হল পূর্ণযোগের অনুকূল। ব্রহ্ম শুধু সং চিং নন, তিনি আনন্দস্বর এবং শক্তিমানও। আনন্দ ও শক্তি তাঁর স্বরূপপ্রকৃতি। সত্য এবং চেতনার যিনি উপপাদ্য, তিনিই আনন্দে এবং শক্তিতে উন্নাসিত। এই উন্নাস তাঁর আরবিভূতরূপ—সৌরভেদের বিভূতরূপের মত। তা-ই তাঁর স্বষ্টী, তাঁর অবস্থান দিব্যকর্ম এবং সৃষ্টিত ঐশ্বর্য—যার আশ্রয়নই তাঁর আনন্দ। এই তাঁর স্বাভাৱ।

আব্রহেমন্যর ব্রহ্মচৈতন্যে নিষ্ফারণ যদি আনন্দের সাধনার লক্ষ্য হয়, তাহলে ব্রহ্মের মত আনন্দের আশ্রয় হবে চতুষ্পাং। তার মাঝে সত্যের প্রশান্তি চৈতন্যের দীপ্তি আনন্দের উদ্বেলন এবং শক্তির বিভূতরূপ কোনটারই অভাব হবে না, অথবা কারও সঙ্গে কারও মনগড়া বিরোধও থাকবে না। আকাশের আদিত্য আশ্রয়ীভূতের স্বনয়ন করেও যাক্ষি বৃক্ক বিচিত্র বর্ণের ফুল ফোটার, বনির গর্ভে কলার মাঝেও সাজ হয় স্বীকৃতির দ্যুতিতে। এর কোনটাই জো বিখ্যায় নয় যেমন সত্য অশ্লব আকাশ, তেমনই সত্য আদিত্যের স্বরূপ ব্রহ্মকোভের পরিশ্লব। অশ্লবদেরই শ্লব—এই ধৃতিই সত্যভূতি।

১৫

বিশ্বচেতন।

যেহ প্রশ্ন বন নিয়ে 'আনি'। সাংখ্যের ভাষায় বলতে পারি, এই আনি হল পুরুষ, আর যেহ প্রশ্ন বন তার প্রকৃতি। প্রকৃতির পরিণাম (change) হচ্ছে; তার তুলনায় পুরুষ অপরিণামী, প্রকৃতি-পরিণামের সে যেন অধিষ্ঠান। কিন্তু চেতনার সাধারণ ভূমিতে পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে ভড়িয়ে আছে বলে সে একেবারে অপরিণামী নয়, প্রকৃতির আশোলনে সেও আশোলিত। প্রকৃতির আশোলন বা পরিণামের দৃষ্টি ধারা আছে—একটি অধঃপরিণাম, আরেকটি উর্ধ্বপরিণাম। আনন্দের মাঝে যে গভীরাগতিকতা এবং তার মরুত অবস্থারের দিকে একটা ঝোঁক আছে, তাকে বলতে পারি প্রকৃতির অধঃপরিণাম। কিন্তু এই অধঃগতিকক ক্রম করে চেতনার উৎকর্ষসাধনের দিকেও আনন্দের একটা প্রচেষ্টা আছে, তাকে বলা চলে

প্রকৃতির উৎসর্গপরিণাম। যে-আমি অধঃপরিণামের সঙ্গে যুক্ত, তার নাম দিতে পারি 'ভূতাত্ত্ব'; আর উৎসর্গপরিণামের সঙ্গে যুক্ত আমিকে বলতে পারি 'ঈশ্বরাত্ম'। ভূতাত্ত্ব কীচা আমি, ঈশ্বরাত্ম পাকা আমি। ঈশ্বরাত্মই যোগের সাধক।

অধ্যায়সাধনার একটা ভূমিতে ঈশ্বরাত্ম নিম্নে কয়েক অনুভব করে প্রকৃতির উৎসর্গ অপরিণামী চিন্তারূপ বলে। একে বলতে পারি 'কূটম আত্ম'। কূটমাত্ম্য যে-বাষ্টীভাবনার সংস্কার আছে তা মুছে গিয়ে নিঃশব্দ সত্যের অনুভব জগতে পারে এবং তাও অবশেষে মূলাভার নিমিত্তে যেতে পারে। কূটম সং আর অসং এই তিনটি ভুক্তিতে হল ঈশ্বরাত্মের অতিথিত্ব বা বিশেষাধীনতা (transcendence) : তার সামনেই চলছে বিশ্বপ্রকৃতির বেলা। অতিথিত্বের অংশ, আর বিশ্বপ্রকৃতির অংশ। দুয়ের মাঝে হলেন বিশ্বচেতন পুরুষ বা 'বিশ্বাত্ম'। ঈশ্বরাত্মকে এই বিশ্বাত্মের অন্তর্ভবণ পেতে হবে, জানতে হবে 'সর্বাত্ম সর্বভূতাত্ম'—সবার গভীরে যে-আমি আর আমার মাঝে যে-আমি, দুইই এক। এই অনুভব আসতে পারে এখানে থেকেই আত্মচেতনাকে বিস্ফারিত করে, অথবা অতিথিত্বের নিগূঢ় শক্তির আবেশকে এখানে দাবিয়ে এনে, অথবা দুয়েরই সর্বসাহারে।

*

*

*

মন দিয়ে সাধনা করতে গিয়ে অনুভব করি, অতিথিত্বের চেতনাই বিশ্বচেতনার অধিষ্ঠান। সবাইকে ছাপিয়ে থাকতে পারলেই সবাইকে আমার মাঝে অনুভব করা সহজ হয়। যে-থাকা বস্তুত আত্মচেতনায় আকাশবৎ প্রসারিত পরিব্যাপ্তিতে অবিলম্ব পাকা। অবিলম্ব থেকে দেখছি চাকরোনা নীলা, দেখছি হৃৎ-পুঃঃ ভাল-মশের হৃৎ—দেখছি আকাশের অনেক নীচে অগচ্ছ তারই মাঝে অস্তরিক্ষে বেদ-বৌদ্ধের বেলা, পৃথিবীর হৃৎ হাসি-কানুয়ার বেলা। ওরা আছে, কিন্তু ওদের অস্তিত্বের নির্ভর ঐ আকাশেই। আকাশ আছে বলেই ওরা আছে ওরা না থাকলেও আকাশ আছেই। আর তার এই পাকাটা আত্মসাহিত্য অধিষ্ঠানচেতনায় প্রসন্নতার উদ্ভাসিত।

এই চর আকাশের শিবরূপ। কিন্তু তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার শক্তিরূপও। স্বরূপস্থিত যখন স্বপ্রতিষ্ঠ এবং সহজ হয়, তখন আমার তার অনুভব পাই। সেখি আকাশ শুধু নির্বাক নীরূপ নয়, নান-রূপের নির্বাহও হচ্ছে আকাশ হতেই। যিনি আকাশবৎ, তিনিই আমার অস্তিত্ববৎ—প্রজ্ঞানে আনন্দে শক্তিতে বিচলিত। শুধু রূপের উৎস তিনি নন, সেখি রূপ-রূপে তাঁরই প্রতিরূপ। আত্মচেতনায় উদীপনে অস্ত্রের চিন্তারূপে থাকে পেরেছি, মূন্যের আধারের অস্ত্ররূপে তাঁকেই সেখি বিচিত্র বর্ণের গুণে—সেখি আনন্দকেই। অনুভব আরও গভীর হলে মূন্যের-চিন্তার আর ভেদ থাকে না : তখন সব তাঁর প্রতিরূপ শুধু নর, সবই তিনি। বিশুদ্ধে তখন সিদ্ধির উল্লাস, বস্তু আড়াল সবই আলোর আড়াল, বস্তু পুঃঃ সবই পরমানন্দের তির্যক্ বিলাস। বাউলের ভাষায় তখন 'অন্তরে-বাহিরে প্রেম প্রেম বসন্ত-বসন্ত, ভোগে প্রেম যোগে প্রেম যোগে প্রেম স্বরে।'।

এই হল অষ্টাদশশতাব্দীর ধর্মাত্মক রূপ—আত্মচৈতন্য বিশ্বাতীতচৈতন্য আর বিশ্ব-চৈতন্যের পরম সমন্বয়।

*

*

*

আত্মচৈতন্যেই বিশ্বচৈতন্যের অনুভব হয়। আর এ-অনুভব শুধু সনাক্তিত হয় না, হয় ব্যাখ্যানেও। বিশ্বচৈতন্যের আবেশে আবার চৈতন্য বিক্ষুব্ধিত হয়, নির্বাক্ত হয়; কিন্তু আবার সে-প্রাণ-মনের ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয় না, শুধু আবার কাঁচা আনির চারপাশ এল পাকা আনি—কে-আনি অবিরোধে সবার আনি। এই আনির অনুভবের প্রাণ-তার প্রকার-ভেদ আছে।

একটি অনুভব: বিশ্বচৈতন্যের উন্মেষের আনি ত্রুটি এবং ভোক্তা। রূপে-রূপে তার কে-প্রতিভা, ভাবের সঙ্গে সহবোধনায় যুক্ত হইবে আনি বিবিক্ত। অভিনয় দেখে আনি তখন আনন্দ পাচ্ছি, কিন্তু নিজে অভিনয় করছি না। আনি ত্রুটি এবং ভোক্তা, কিন্তু কর্তা নই। প্রপঞ্চকে শক্তির উন্মেষ, কিন্তু আবার মাঝে রয়েছে তার প্রশ্ন।

কিন্তু একসময় আবার মাঝে শক্তির মুক্তিও হতে পারে। আনি তখন দশজনের সঙ্গে অভিনয়ে যোগ দিয়েই তার ত্রুটি এবং ভোক্তা। দশজনের মাঝে নিজেই তখন দেখছি যেমন, তেমনি আবার সব ছাপিয়ে দেখছি সূত্রধারের প্রবোধনা-নৈপুণ্য। তাঁর ভাবনাকে যেমন তিনি সবার মাঝে প্রবাহিত করছেন, তেমনি আবার মাঝেও। আনিও তাঁর নিবৃত্ত (instrument)।

এই অনুভবে বিশ্বচৈতন্যের উন্মেষের বোধ পরিপূর্ণ হয়, ব্যক্তিকে বিশ্বকে এবং বিশ্বাতীতকে আমরা এক অর্থও চৈতন্যের পরিম্পন্নরূপে আত্মদান করতে পারি। কিন্তু সাধারণত জ্ঞানযোগীরা ব্যাপ্তিচৈতন্যকে আনন্দ এবং শক্তির উন্মেষবিক্তরূপে ভাবনা করেন। আত্মচৈতন্য বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে নিত্যজাগ্রত বোধে যোগযুক্ত হয়ে আছে—তাঁদের নতে এর চাইতে বড় অবস্থা হচ্ছে যেখানে আত্মচৈতন্য এবং বিশ্বচৈতন্য লুপ্ত হয়ে গেছে বিশ্বাতীত পরমচৈতন্যে। নুনের পুতুল সমুদ্রে নেমে গেলে গেল, আর ফিরে এল না। সমুদ্রের সঙ্গে এই সাম্যতাই হল তাঁদের নতে জীবীর চরম পূর্ণার্থ।

আগেও বলেছি, এ হল অনুভবের একটা দিক—নিরোধের দিক প্রশ্নের দিক। কিন্তু তেমনি আবার সৃষ্টির দিক উন্মেষের দিকও আছে। সমুদ্র যেমন পুতুল গভীর, তেমনি গভীরও। নিজের নুন দিয়েই সে এমন পুতুল গড়ল যা মনে পাখর হয়ে গেছে। ভক্তেরা তাকে বলেন সচিদানন্দমনবিগ্রহ—সত্তা চৈতন্য আনন্দ সবটি বেঁধে বিগ্রহ হয়ে গেছে। তার মাঝে যেমন আছে ব্যাপ্তি, তেমনি আবার আছে সংহনন। ব্যাপ্তিতে মুক্তি, আর সংহননে ভুক্তি এবং শক্তি। যোগীর চৈতন্য এ-অবস্থা সেই পরম ব্যাখ্যানের যা সমাধির রূপে প্রাপ্ত। এ-অনুভব অরূপ আর রূপের মাঝে সমাধি আর ব্যাখ্যানের মাঝে যনের মত বৈরুদ্যপেক্ষের (polarity) রূপনা করে না। এ হল বোধের অর্থও অনন্ততা

এই অনুভব মনে আসে পূর্ববোধীরা জাগ্রতে এবং বাবহারে। তখন অগতের দৃষ্টি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি হয় আনন্দরূপক। দেহদৃষ্টি বিদ্যার দৃষ্টি বিশ্বাত্ত্বভাবের দৃষ্টি, অবিদ্যাচ্ছন্ন সাক্ষীর্গ অহস্তার দৃষ্টি নয়। অহঃ এর খণ্ডিত চেতনার বোধ আছে শোক আছে, আছে বিজ্ঞানের সৈন্য আনন্দের বৈকল্য নষ্টের কৃষ্ণ। অহঃ যা-কিছু দেখে তা-ই বাটো করে দেখে—বেদন নিভের ভিত্তি, তেননি বাইরেও। কিন্তু বিশ্বাত্ত্বভাবক বোধীরা দৃষ্টি যানুভবের বহিষ্কার দ্বারা উদ্ধীর্ণ। আরচেতনায় কে-বহিষাকে তিনি প্রত্যাক করেন, তারই সপ্রাধিকাকে তিনি জাগ্রত এবং উদাত্ত দেখেন ভূতে-ভূতে। ফোটা কুলের পূর্ণতা দিয়ে তিনি বিচার করেন কুঁড়ির অপূর্ণতাকে। অবিদ্যা আর বিদ্যার মাঝে তিনি নিত্যবিরোধ দেখেন না; দেখেন, অবিদ্যা বিদ্যার আরম্ভের নাত্র, কিন্তু তাঁর অস্তরের প্রবেশ তাকে স্ফুরিত করছে বিদ্যাতেই—ভোবের মাধ্যমে আলোরই সূচনা। তাই শক্তির কোনও আপাতপ্রতিকূলতা তাকে বিচলিত করে না, কেননা তাঁর দৃষ্টিক্ষম দৃষ্টি তাকে অতিক্রম করে দেখে দিব্যানিগতির নিশ্চিত সাক্ষ্যতাকে।

কিন্তু সাধকের মাঝে নবের সংস্কার বতকণ প্রবল থাকে, ততকণ দৃষ্টির এই পূর্ণতা তাঁর মাঝে ফোটে না। তাইতে জ্ঞানযোগীদেরও সত্যের মাঝে পারমাণবিক (noumenal) আর প্রাতিজ্ঞাসিকের (phenomenal) ভেদ করতে দেখা যায়। অহঃ প্রচ্ছন্ন সত্যকে প্রকাশ করে তাঁরা বলেন, তাঁর এই ভাগ সত্য আর ঐ ভাগ মিথ্যা। বিদ্যা হতে সত্যে জগৎ হতে ব্রহ্মে উত্তীর্ণ হওয়াই মুক্তি, আর মুক্তিই জীবের পরমার্থ। তাইতে তাঁরা ব্রহ্মের মাঝে প্রপঞ্চোপনয় শিবকেই নানেন, প্রপঞ্চে উন্নতি পত্তিকে নানেন না। বুঝানেও তাঁরা স্বে-প্রাণ-মনের মাঝে অনুজ্জ্বলিত প্রশ্নকে তবু আমল দেন, তাদের মাঝে দিব্যভাবের ক্ষমতাকে (dynamism) ভাবেন বায়ার খেলা।

বলা বাচসা, এ-দৃষ্টি পূর্ণাভ্যন্তের নয়, এর মাঝে কাছ করছে নবের যৈত্তের সংস্কার। অহঃকে অন্যান্যবিরোধে খণ্ডিত করা হল নবের স্বভাব। সে বলে 'নেতি নেতি'; আর বোধি বলে 'সর্বং বহিঃ' ব্রহ্ম। একসময় নেতিভাবনার দরকার হয় সত্যি, যখন মন দিয়ে আমরা অপরা-প্রকৃতির সঙ্গে মড়াই করি। কিন্তু এ-ভাবনা একদেবী: তাঁর পূর্ণতা ঐ ইতিভাবনায়—যখন সব-কিছুর মাঝে দেখি পরমপুরুষের পরমাপ্রকৃতির উদ্যোগ। তখন সবই ব্রহ্মের চিহ্নাটি পত্তি এবং আনন্দের রূপ, অর্ন্তএব সবই সত্য।

*

*

*

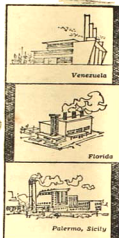
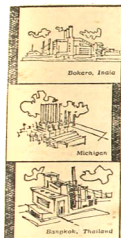
এই পরিপূর্ণ অষ্টভেদ ভাবনা নিয়েও বিশ্বাত্ত্বভাবের সাধনা চলতে পারে। তাঁর সাধন হল সংবেগ নয়, আবেগ। বিশ্ব হতে বিশ্বেশ্বরীর্ণের দিকে ছিটকে পড়ছি না তখন, সেহ-প্রাণ-মনের সব বাতায়ন বুনে দিয়ে বিশ্বেশ্বরীর্ণকেই নানিয়ে আনছি এইখানে। 'আনছি' বলাও ঠিক নয়, 'তিনি আসছেন' এইটি অনুভব করছি আমার সব দিয়ে। স্বাহানয়ে তাঁর আবাহন। চিন্ময় আবিষ্ট হচ্ছেন মূন্সর আবাহনে, জাইতে সেহ-প্রাণ-মন সবই চিন্ময় হয়ে উঠছে।

তখন বেদি, বেদ প্রাণ বন এরা তো আলাদা-আলাদা নয়—সবই যে সেই চিত্তসমুদ্রের তরঙ্গ। তরঙ্গে-তরঙ্গে বায়ধানটা উপরভাগা, কিন্তু জলের যতনে শব্দ যে একই সমুদ্রজন্মের আশোনি। তাইতো বিশ্ব ঘুড়ে 'হৃদয় পানে হৃদয় ছোটে', অভ্যন্তরীণতবে তেজের দাধা গোচাধার জন্য নরবীণার এত আকুলনিকুলি। বাস্তবিক, সমাজীয় আর বিজাতীয় ভেদ মিছক নবের। নানা, আর স্বগতভেদ তত্ত্বগতেরই চিন্তার উন্নয়। ছোট আনির মধ্যেই গোট আনির বিরোধ। কিন্তু মে-আনি দুইং এবং সর্বগত, তার জো কারও মধ্যে বিরোধ নাই। সবার মধ্যে আনি এক, কারও হতে কিছু হতেই আনি বিবিজ্ঞ নই, সবার ভাবনা সবার বেদনা আবারই ভাবনা আর বেদনা—এমন-কি এই মেহের বীণাও যে বিশ্বমেহের বীণার মধ্যে একই ঘাটে বীণা, ওধানকার হৃৎ-দুঃখের স্বভাব যে এখানেও অনুরণন জাগীর অনুশব্দ। এও অধোভের উপলব্ধি—ভবু সর্বাধার হয়ে নয় সর্বগত হয়ে, চিন্তার দ্বারেই নয় চিত্তন গয়ে নিখিলের অন্তরঙ্গ আস্থান।

কিন্তু এই বিশ্বায়ভাবনারও স্তরভেদ আছে। সবার হৃৎ-দুঃখকে আপন করে নেওয়া হল তার প্রথম স্তর এবং নিশ্চয়ই তা অধ্যাত্মসিদ্ধির একটা উঁচু ধাপ। বেদের ভাষায় একে বলতে পারি বৈশ্বানরের ভোজ্য। প্রাকৃত নরের ভোজ্য হতে এর জায় আলাদা, কেননা আয়তচেনার বিস্তারণ এর অঙ্গীভূত। শুধু আত্মহৃৎ নিয়ে আনি ভুলে নাই, বিশ্বের দুঃখে আবার হৃদয় করুণার্ত্র—এর একটা মহিমা এবং স্মরণ আছে বই কি। কিন্তু এই করুণার মধ্যে যদি শক্তির যোগ না ঘটে, তাহলে জাকে বলব, 'এহো বাহা'। অপরের দুঃখের সমানুভব যেমন চাই, তেমন চাই তার প্রতিকারের মানবা। রোগীর দুঃখে আত্মব্রো অসহায়ভাবে দুঃখ পায়, এটা ভাবের মনস্তার পরিচয়। কিন্তু শ্রিরবুদ্ধি চিকিৎসক সেক্ষেত্রে করেন শক্তির প্রয়োগ, যাতে রোগীর দুঃখ দূর হয়ে যায়। এখানে গাঢ়কভাবে কাজ করে তাঁর প্রজ্ঞা এবং বীৰ্য, অর্থাৎ তাঁর সমানুভব যে নাই তাও নয়। অধ্যাত্মসিদ্ধিতেও তেমনি ভোজ্যের পর আসে কর্তব্য। কৈশ্যার তখন শুধু ভোজ্য নয়, তিনি 'ভোজ্য বর্ধেশুর'। মে-তপোবীৰ্য একদিন আনাকে নিষের দুঃখ খোচাতে উদ্ভুদ্ধ করেছিল, তাই এখন আনায় উদীপ্ত করে বিশ্বের দুঃখবোচনে। আনি বিশ্বের মধ্যে তখন এক—যেমন প্রজ্ঞার এবং আনন্দে, তেমনি ভাবনায় বেদনায় এবং তপস্যাতেও। হৃৎ-দুঃখের উর্ধ্ব আনন্দের এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধির উর্ধ্ব বীৰ্যের ক্ষুরভার আনি তখন 'যে বহিদি প্রতীতিত'।

(ক্রমঃ)

FOR CREATIVE CONSTRUCTION



AND ENGINEERING

Kuljian's diversified project experience as imaginative architects and construction-engineers spans more than a quarter of a century and has been tested around the globe—in the United States, Latin America, Europe, the Near East and the Far East. In India too, Kuljian has built and is building giant power plants. The Kuljian-supervised projects are taking their place one after another at Bokaro, Barauni, Delhi, Bandel, Cambay and Durgapur.

Kuljian system of unified architecture, engineering and construction-supervision provides a fast, efficient and economical solution to all problems of an entrepreneur. Kuljian's co-ordinated services, under single-management responsibility, assure maximum operational efficiency and construction economy. From feasibility report to initial operation is the scope of Kuljian service; from power plants to all-type public works is the range of Kuljian operation.

The Kuljian Corporation
engineers • constructors

1200 NORTH BROAD STREET, PHILADELPHIA, U.S.A.

India Office: 7, Chitraranjan Avenue, Calcutta-13

Design, Engineering, Procurement, Construction, Reports, Initial Operation

Consultants in India for

Bokaro Thermal Power Station, D.V.C.

Durgapur Thermal Power Station, D.V.C.

Bokaro 4th Unit Extension, D.V.C.

'C' Station Delhi Electric Supply Undertaking

Barauni Thermal Power Station, Govt. of Bihar

Durgapur Thermal Power Station, Govt. of West Bengal

Dhruvan Thermal Power Station, Govt. of Gujarat

Bandel Thermal Power Station, Govt. of West Bengal

Power Plants • Airports • Public Works • Chemical Plants • Synthetic Fibre Plants • Refineries • Steam & Hydro Power Plants

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିର

ବର୍ତ୍ତକ।

(୨୫୯୩ ନବେମ୍ବର, ୧୯୭୦)



ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠ୍ୟମନ୍ଦିର

୧୫ ବର୍ତ୍ତମ ଗ୍ୟାଟାଞ୍ଜି ଟ୍ରାଟ

କଲିକାତା—୧୨

১। চিন্তাবলি ও দুঃখাবলি	ঐশ্বর্যবিশ্ব	১
২। হৃতির পাঠ্য	ঐশ্বর্যবিশ্ব	৫
৩। পোপসম্বন্ধ-প্রসঙ্গ	অমির্বাণ	১১
৪। বাসবদত্তা	ঐশ্বর্যবিশ্ব (অনুবাদক—ইন্দোজিত গুপ্ত)	২০
৫। হায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	৩৬

বন্ডিকার নিয়মাবলি

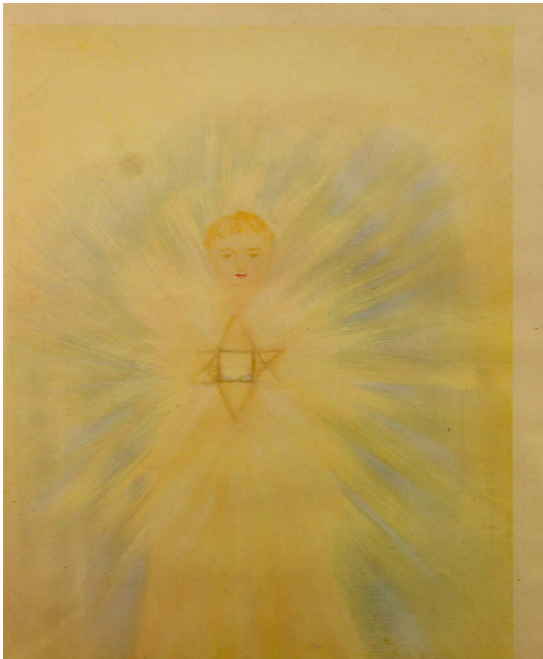
২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগস্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক টীকা ৫২ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হস্তগত যায়। টীকা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় অফিসে কিংবা কলিকাতা-শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নতুন বৎসরের টীকা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা তি. পি. বোনে পাঠানো হয়।

পাঠ্য :
ঐশ্বর্যবিশ্ব পাঠ্যমন্ডির
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
ঐশ্বর্যবিশ্ব আশ্রম
পত্রিকার

মূল্য—১৪০ টাকা

প্রকাশক—ঐশ্বর্যবিশ্ব পাঠ্যমন্ডির, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২
মুদ্রক—ঐশ্বর্যবিশ্ব আশ্রম প্রেস, পত্রিকার



This golden figure.....
Hid in its breast the key of all his aims,
A spell to bring the Immortal's bliss on earth.

Sri Aurobindo : (Savitri)



২৪ নবেম্বৰ

১৯৬১

একটা নিৰন্তৰ অস্থিৰ ক্ৰমোন্নতিৰ কালটো জীৱন আন
নিতা মৰোনতা আৰু অক্ষয় অতিক্ৰমি। স্বৰ্গতৰ উপায় আৰু
কিছু নাই।

শ্ৰীঅন্নবিন্দু



চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি

পূর্ণানন্দ

ঐজয়বিষ্ণু

কর্ম

একচ্ছত্র নাম্বা, পুরোহিত সম্প্রদায় আর অভিভাভকুল, এই তিনের যে সম্মিলিত অবাধ কর্তৃত্ব তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হল গণতন্ত্র। সমাজ-তন্ত্র হল ধনিক গণ-তন্ত্রের যে অবাধ কর্তৃত্ব তার বিরুদ্ধে দারুণের অস্বরাষ্ট্রের প্রতিবাদ। অরাজতন্ত্র হবে আনন্দা-তন্ত্রী সমাজ-নামের বিরুদ্ধে মানবায়ার প্রতিবাদ। এক মায়ায় থেকে আর এক মায়ায় মধ্যে, এক বার্ষিক হতে আর এক বার্ষিকতার মধ্যে এই যে বিক্ষুব্ধ উৎকর্ষ গতি, এই হল ইউরোপীয় ক্রমোন্নতির চিত্র।

*

ইউরোপে গণতন্ত্র হল রম্মী পরিষদের রম্মী আর কস্মুখিত প্রতিনিধি-সভা কিংবা আক-প্রতিষ্ঠাকারী ধনিক—আপনাকে যে ঢেকে রাখে চক্কলনতি সাধারণের সাময়িক কর্তৃত্বের আচ্ছাদনে—এদের শাসন। সমাজ-তন্ত্র ইউরোপে হয়ে উঠতে পারে রাষ্ট্রকর্ষচারী আর পুনিসের রাজত্ব, বাহ্যতঃ যদিও তা দেখাবে যেন একটা আর্থিক রাষ্ট্রের আর্থিক কর্তৃত্ব। এ দুটি ব্যবস্থার মধ্যে কোনটি শ্রেয় সে অনুসন্ধান হল মার্কসের অনুধাবন—কোনটি যে বেশি দের তাই নিঃসন্দেহে বলা কঠিন।

*

গণতন্ত্রের সূক্ষ্ম হল এক বর্ষোচ্চচারী বা বর্ষ বার্ষিকের খেয়াল থেকে ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও ধনসম্পত্তির রক্ষা পাওয়া। তার কুল হল মানবজাতির মধ্যে মহত্বের দ্রুত।

*

এই যে বিদ্যাত মানবকুল, সে স্বপ্ন দেখে রাষ্ট্রশাসনের, সমাজব্যবস্থার যন্ত্রটি ধরে তার পারিপার্শ্বিককে নির্দোষ করে গড়ে তুলবে। কিন্তু অস্তরে অস্ত্রায়ার নির্দোষ গঠনই শুধু নির্দোষে গড়ে তুলতে পারে বাধ্য আবেষ্টন। অস্তরে তুমি যা, তাকেই তুমি তোমার বাহিরে উপভোগ করবে—কোন ব্যক্তিক ব্যবস্থাই তোমার আপন সমস্ত ধর্ম থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

*

মানুষী প্রবণতা হল সত্যবাদকে নিপীড়ন করা বা অস্বীকার করা, পরিবর্তে তার

প্রতিমা ও প্রতীক পূজা করা। এর বিরুদ্ধে নিজেকে সনাতনবাদী লজ্জায় রাখবে। অশ-
পক্ষির হুযোগ হল মানুষী দুর্ধনতা, মানুষী দুষ্কৃতি নয়।

★

মানুষ বেশকিছু সম্মান দেখাও কিন্তু বেশখারী উপায়ও নয়র বেহা। নতুন তীর্থ-
স্থানে ভগবানী আসন গ্রহণ করে, আশ্রয় লাভ করে গড়ে কিয়দশী মাত্র।

★

কত লোক সপত্নি জনা, অর্ধের জনা করে আশ্রয় চেষ্টা—কতিপয় মাত্র করে দারি-
দ্র্যের পানি-গ্রহণ। কিন্তু তুনি, চেষ্টা করে চল, আলিঙ্গন করে ধর একমাত্র ভগবানকেই।
ভগবানই তোমার জনা নির্বাচন করে সেন রাজার প্রাসাদ লোক আর তিস্কুকের মূর্তি যোক।

★

পাপ কি? যে অভ্যাস তোমাকে দাস করে রাখে। পুণ্য কি? মানুষী অভিনব
ভবু। সেখ ভগবানকে, কর তাঁর ইচ্ছার কাজ, চল যে পথই তিনি ধরে সেন তোমার
গনগণনের জনা।

★

জগতের হস্তে ধনী পক্ষ অবলম্বন করবে না, তাঁর ধনের জনা; দারিদ্র্যের পক্ষ
অবলম্বন করবে না, তাঁর দারিদ্র্যের জনা; রাজার পক্ষ অবলম্বন করবে না, রাজার পক্ষের
ও ঐশ্বর্যের জনা জনগণের পক্ষ অবলম্বন করবে না, তাদের আশা তাদের উৎসাহের জনা।
সর্বদা থাকবে ভগবানের পক্ষ অবলম্বন করে—যদি না তিনি আশে সেন তাঁরই বিরুদ্ধে
বুড়ে নিযুক্ত হতে, তা হলে সে-কাজও করবে তোমার সবস্ত্র প্রাণ দিয়ে, আনন্দের সাথে।

★

কি সকলে জানব ভগবান কি চান আনাকে দিয়ে? তা হলে, অহংকে আমার ভিতর
থেকে উৎখাত করতে হবে, প্রত্যেক গুণ থেকে গর্ভ থেকে তাকে নিষ্কাশিত করতে হবে,
আমার গুণ নগ্ন অন্তরাত্মকে ভগবানের অসীম কর্তৃত্বের পরিচয় করতে হবে, তবে তিনি
নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে ধরবেন আমার কাছে।

★

অন্তরাখা যখন নগ্ন লজ্জাখীন, তখন সে হতে পারে গুহা নির্বন, ঠিক যেন আদি
মানুষটি (আদম) ছিল মানবের আদি-উৎসানে।

★

বিত্ত নিয়ে গর্ব করা না; কিন্তু দারিদ্র্যের জনা, আশ্রয়-ভোগের জনা মানুষের প্রশংসাও
আকাঙ্ক্ষা করা না—ও দুটি ভিন্নিই হল অহংকারের বোটা অথবা বিধি বাধ্য।

★

পর্যাপকতা মানুষের পক্ষে শ্রেয়স্কর, কিন্তু তা শুভ শ্রেয়স্কর হয় না, যখন তা

ঘরে ওঠে একটা আত্মবিলাস এবং বেঁচে বর্তে থাকে অপরের স্বার্থপরতাকে প্রশ্রয় দিয়ে।

★

পরার্থপরতা দিয়ে নিজের অন্তরাত্মের উদ্ধারসাধন করতে পার, কিন্তু সেখো সে-উদ্ধার হয় না কেন তেমনার প্রতিবেশী স্বার্থের অধোগতি সাধন করে।

★

আত্ম-ত্যাগ শুদ্ধির এক বহৎ উপায় ; কিন্তু তা নিজেই লক্ষ্য নয়, কিম্বা জীবন-স্বাপনের পরম স্বর্থ নয়। নিজেকে ভিটে করা নয়, তেমনার লক্ষ্য হবে জগৎজের মধ্যে ভগবানের তুষ্টিবিধান।

★

পাপ, দুর্কর্ম কি যে অহিত সাধন করেছে তা অবিকার করা সহজ, তবে অতিক্রম যে দৃষ্টি তাই দেখতে পারে অহমত্যা অহিন্যের পুণ্যকৃতি কি অহিত সাধন করে।

★

প্রথম শ্রমের শাসন হল শাস্ত্র আর অনুষ্ঠানের সহায়ে, তারপর হল অধিবেশ শাসন চাল ও উদ্ভাবির সহায়ে। এখন বৈশেষ শাসন স্বত্বপাতি আর স্বর্গবৎসের সহায়ে। আজ পুত্র, সদামুক্ত দাসশ্রেণী উঠছে, “বাক্য হল শ্রম-সমন্বয়ের” এই বস্তু নিয়ে। পুরোহিত বা রাজা আর বণিক বা শ্রমিক কেউ মানবজাতির সভাকার শাসক নয়। হাড়ুড় আর কোদালের যেচ্ছাচার তার পূর্ববর্তী অন্য সব যেচ্ছাচারেরই বহৎ স্বার্থ হবে। অহংএর নৃত্য হবে স্বধন, মানুষের অন্তরে ভগবান স্বধন তাঁর আপন বিশ্বমানবতাকে সক্রিয় করবেন, তখনই এই পৃথিবী স্মৃতি ও সন্তষ্ট এক জীবকালের তার বচন কল্পতে পারবে।

★

মানুষ ভুটে চলে স্রবের পশ্চাতে, উগ্র আগ্রহে তার আর্ন্ত বৃক্কের মধ্যে আঁকড়ে ধরে সেই অগ্নি-সত্ত্ববাক্যে। কিন্তু ঠিক তেমনি তখন তার পিছনে ধাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে এক দিবা নিকলুঘ আনন্দ যাতে মানুষ তাকে দেখতে পারে, তাকে দাবি করতে পারে, তাকে অধিকার করতে পারে।

★

মানুষ ধৈর্যে চলে ক্ষুদ্র সাফল্য আর অকিঞ্চিৎকর প্রভুত্বের পিছনে আর সর্বদাই পিছিয়ে পড়ে শ্রান্তির আর শৌর্যবোধের মধ্যে। ঠিক তখনি বিশ্বের মধ্যে ভগবানের অনন্ত শক্তি বুঝাই অপেক্ষা করে মানুষের সেবার নিজেকে নিবৃত্ত করবার জন্যে।

★

মানুষে খুঁড়ে চলে জ্ঞানের ক্ষুদ্র বঙ-বিখণ্ডের অনুগমনে আর সে সবকে সাজিয়ে ধরে গুল্ল গুল্ল কর্ণহারী বহু চিন্তাসৌধরূপে। ঠিক তখনি অসীম জ্ঞান হাসতে থাকে তাঁর স্বার্থের উপরে, অবাধে ছড়িয়ে দেয় আপন বিচিত্র স্বর্গ-স্বচিত পাখার সমুদ্রমল প্রভা।

★

একটা দীন অস্বচ্ছন্দ অহংএর চারিদিকে কতকগুলি মানসিক ধারণা সাজিয়ে তুলে

মানুষ গড়েছে এই যে দীর্ঘমিত্র কৃত সত্তা, তাকে পরিতৃপ্ত করবার জন্য, পানিপূর্ণ করবার জন্য মানুষের বহুযত্নসম্মিত প্রয়াস। ঠিক তখনি যোগাতীত কালাতীত বিরাট আয়াকে তার আনন্দ-ময় জ্যোতির্গর্ভে আব্রুপকাবে ধাধা দিয়ে দিয়ে চলে সে।

★

ভারতের অস্তঃপুরুষ! আর নিজেকে নৃকিরে রেখে না মানুসবের মধ্যে আর পৃথাকবের মতো, কনিষ্ঠপের ডাল পত্তিতদের সাহচর্যে। তাকে রেখে না নিজেকে নিত্মাণ অনুতান আর নিত্মাণোচ্চনীয় প্রাচীন বিধি আর দক্ষিণার পাপ-অর্ধ দিয়ে, না, বৌদ্ধ ভোমার অন্ধ-হৃদয়ে, চাও ভগবানের কাছে, পুনঃজ্ঞান কর ভোমার সত্যকার শাস্ত্রণর, কত্রিয়র, ভোমার শাস্ত্রিত বৈদকে সপে নিয়ে। বৈদিক যজ্ঞের গুপ্ত সত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর, প্রাচীনতর বহুতর বৈদ্যন্তের সিদ্ধি লাভ কর পুনঃপ্রায়।

★

ভোমার উৎসর্গ যেন কেবল পাণ্ডি সম্পদ বর্জন করার, কয়েকটি কাননা ও বাসনা পরিত্যাগ করার শেষ না হয়, না, ভোমার প্রতিষ্ঠিত চিত্রা, প্রতিষ্ঠিত কর্ণ, প্রতিষ্ঠিত ভোগ হয় যেন নৈবেদ্য ভোমার অস্তরর ভগবানের কাছে। ভোমার প্রতি পদক্ষেপ চলে যেন ভগবানের মধ্যে, ভোমার গিত্তা ভোমার ভাগবত উৎসর্গিত হয় যেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে।

★

“এ ভিন্দিম আমার শাস্ত্র-অনুযায়ী নয়, আমার বিজ্ঞান-অনুযায়ী নয়”—শাস্ত্রবাদী, বিধিবাদীরা বলে। নৃপ! ভগবান কি তবে একধাণা পুস্তক মাত্র—যা সেখানে লেখা তা ছাড়া আর কিছু সত্তা নয়, শ্রেয় নয়!

★

আনি চলব কোন বিধি অনুসরণ করে—ভগবান আমাকে যে কথা বলছেন, “এই হল আমার ইচ্ছা, হে আমার সেরক”, তাই; না, যে সব বিধি নৃত্যাক্রিয়া নিয়ে গিয়েছেন তাই। না, আমাকে যদি কাউকে ভয় করতে হয়, মানতে হয়, তবে মানব, ভয় করব ভগবানকে, পৃথকের পাতাকে নয়, কিম্বা পত্তিতের মুকুটকে নয়।

★

ভোমার হস্ত ভুল হতে পারে, এই ভয়ে বলবে কি যে বাণী তুমি তনু ছাড়া ভগবানের নাও হতে পারে? শুধু আনি আনি অজ্ঞানের চাপেও যাত্রা তাঁর উপর আশ্রয় রাখন করেছে, জ্ঞানের তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না, তবু আনি দেখেছি যখন মনে হয় একান্ত ভুল পথেই যেন আমাকে চালান হয়েছে, ঠিক তখনি এক পরম-জ্ঞানই রয়েছে আমার দিশারী হয়ে; তবুও আনি আগ্রহ ভগবানের কাছে গিয়ে পড়ব বরং, চাইব না উদ্ধার একটা প্রাণহীন শাস্ত্রীয় বাক্যের উপর নির্ভর করে।*

* কল্পবাক্য—ঐন্দ্রলিনীকান্ত গুপ্ত

স্মৃতির পাতা

ঐতিহাসিক গল্প

শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিতেরীতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন (অবশ্য অন্য দিক দিয়ে আশ্রয় বলতে পারি, তিনি পণ্ডিতেরীকে আশ্রয় বলেন তাঁর চেতনার মধ্যে) । কিন্তু কেন বিশেষ করে এই সময়টি ? অবশ্য বাহ্য দৃষ্টিতে বলা হয়ে থাকে ইংরেজ-স্বাধীন কোপদৃষ্টি এড়াবার জন্যে তিনি সরে এলেন ফরাসী রাজ্যে । কিন্তু আসলে তিনি চেয়েছিলেন একটা নিষ্কি-বিলি জায়গা যেখানে আপন ভাবে আপন কর্তব্য নিয়ে তিনি থাকতে পারবেন । তবে স্থানটি এমন নিবিবিলি ছিল যে তার বরনটা আশ্রয় এখন ধারণা করতে পারি না । নিবিবিলি না ত, বৃত্ত—বলা হত a dead city—লোকজন চলাচল খুব করই ছিল । বিশেষত আশ্রয় যে দিকটায় থাকতান—সন্ধ্যার পরে তো একেবারে নিঃশব্দ ।

‘নশানই বটে । সন্ধ্যা দেশে তখন যে ভারতীয় স্বাদেশিকতার বন্যা চলেছিল, সে পূণ্যাত্মকের কিছু এখানে প্রবেশ করে নাই (দুই একজন ব্যক্তিকে স্পর্শ করা ছাড়া)—এটা হল সমুদ্রের back water, পাশের বাঁধা জল । সার্বজনীন জীবন, যুব-আন্দোলন, সমবেত কর্তব্যপ্রচেষ্টা, শিকাগো-স্মৃতির অনুশীলন—জাগ্রত প্রাণের চিহ্ন কিছু ছিল না ।

‘নশানই বটে, কিন্তু প্রেতের অভাব নাই । প্রথম নয়র ভূতপ্রেত হল গুণ্ডার দল । এরকম জীবের প্রাদুর্ভাব একান্ত ভ্রান্তনিক পরিদৃষ্টির মধ্যেই হয়ে থাকে—যেখানে বহু স্মৃতির ঘোর সেখানে জাগ্রত হতে হলে বা জাগ্রত অবস্থার প্রয়োজন তত উগ্র রাজনিক উদ্দীপনা । তারপর আবার নিধন স্মৃতি । পণ্ডিতেরী তখন এই বকনে আরো বিখ্যাত ছিল তার সত্তা বদা ও উচ্চুখল নদ্যাপের জন্য—বনি রবিবারের ছুটিতে যাহিরের থেকেও এই জাতীয় ভূতপ্রেতের অভিবান হত । গুণ্ডার দল (ফরাসীতে এখানে বলে bandes) এক অপরাধ প্রতিষ্ঠান ছিল—এখন প্রায় ভেঙে গিয়েছে । পণ্ডিতেরীর ফরাসী রাজত্ব নামে মাত্র সার্ব-মৈত্রী-স্বাধীনতার কেন্দ্র । আসলে এ ছিল ফরাসীর বিপ্লব-পূর্ববর্তী ফিউডাল রাজত্ব বা তার চেয়েও ব্যাপক কিছু । অর্থাৎ তিন চারজন ধনী (অসং উপায়ে) বা পবন ব্যক্তির স্বখেলচ্চারণ—এদের বৃত্তিভোগী bandes সব যেনন চকুন তেনন জাবিল করে বেড়ায় । পুনিশের সাধাও নাই, ইচ্ছাও নাই হস্তক্ষেপ করতে । পণ্ডিতেরী সহর প্রায় অরাজক হয়ে উঠত, করেকটি উপন্যাস—রাজনীতিক নির্ব্যাচনযশে । সার্বসারি, খুনো-

মুনি রক্তারক্তি চনত কয়েকদিন ধরে—লোকের ভয়ে বের হাত না বাড়ী থেকে, বিশেষত সন্ধ্যার পরে। যদিও আনন্দের সাক্ষাৎভাবে রাজনীতিতে লিপ্ত হিলাব না, তবুও আনন্দের দু'টার জন্য স্থানীয় বহু লড়িত ছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে বেশ সাক্ষাৎ করতে শ্রীঅরবিন্দ আনন্দের দু'একজনকে রাত্রিতেও পাঠাতেন—ইচ্ছা করেই—আনন্দের দুর্ভাগ্য সাহস দেখে স্থানীয়েরা হতভম্ব হয়ে যেত।

এইসব গুণের দল, বনহিলাব এইসব ভূত শ্রেষ্ঠ আনন্দের বিরুদ্ধেও অনেকবার চেষ্টা উঠেছে। যদিও ভবে, একই গভীর ভাবের কথা।

শ্রীঅরবিন্দ এখানে এলেন—শীঘ্রই তাঁর উপলব্ধি হল একটা দ্বির আসন স্থাপন করতে হবে, তাঁর সাধনার ও দ্বিধির একটা অচল প্রতিষ্ঠা। সমুদ্রসৈকতে নিভাচ্ছিল বাসুকা-রানির উপর তাঁকে গড়ে তুলতে হবে একটা দ্বির গুচ্চ সৌন্দর্য—দ্বিধা মন্দির। পুরাণে শাস্ত্রে আনন্দের পাঠ করি নি যে যখনই যেখানে কোন মুনি বা ঐশি ধ্যান বা সাধনা করতে বসেছেন, অবনি তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করবার জন্যে ছুটেছে এসে একজন বন্ধু বন্ধ। ধ্বনিবাংস আদ্যের কবাই স্নানসেবের চিল পরব লোভনীয়।

শ্রীঅরবিন্দকে দ্বির হয়ে বসতে দিতে চায় নি, তাঁর আসন টানাতে চেষ্টা করেছে বরাবর যে সে হল বৃষ্টিপতঙ্গ। ভারতের বৃষ্টিপতঙ্গ কখনো বিশ্বাস করে নাই যে শ্রীঅরবিন্দ কল্যাণী-রাজ্যে এসেছেন যোগসাধনার জন্য—ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা এসব হল চলাকলা—তারা শ্রীঅরবিন্দকে জানে, সবচেয়ে ভারতে একমাত্র এই ব্যক্তিটাই most dangerous, সকল অনিষ্টের গোড়া। পত্রিচরী থেকেই তার নির্দেশ পরামর্শ এবং হয় তো হাতিয়ার (পিত্তল ইত্যাদি)। ভারতীয় স্বাধীনতার বগল এইখানে। ভারতীয় স্বাধীনতার মূল উৎস যে শ্রীঅরবিন্দ বৃষ্টিপতঙ্গের প্রাণপুরুষ তা বলে দিয়েছিল, তবে যে বাহা অর্থে সে বুঝেছিল যদিও ঠিক তা নয়।

এই বৃষ্টিপতঙ্গ এক সময়ে বন্দব করলে স্থানীয় bandesদের এক নেতার সহাবে শ্রীঅরবিন্দকে এক মোটরে করে kidnap করতে। দু'একবার আনন্দের ব্যক্তি জেপে টান দিয়েছি বাড়ীর চারিদিকে, পাছে অতর্কিত আক্রমণ হয়। ওনেছি এই দুর্ভাগ্যের নেতা পরে অনুভূতাপ্রসূ হয়েছিলেন, মনেছিলেন—সামুর যোগীর বিরুদ্ধাচরণ করা মহাপাপ, তাতে সে নিজেই শাপগ্রস্ত হতে পারে। যা হোক, বলে যখন হল না তখন বৃষ্টিপতঙ্গ হল আরম্ভ করল। অর্থাৎ একটা আইনসম্মত অভিযোগ সাক্ষাতে চেষ্টা করল। দু'একটি ভূত শ্রেষ্ঠ হয়ে ভাল কাগজপত্র তৈরী করা হল—কটো কিছু, ব্যাপ, চাট কিছু, চিঠি কিছু—বেন আনন্দের খুন ডাকাতির সলাপস্বার্থ করছি। সেগুলি আনন্দের দলের একজনদের বাড়ীতে কয়েক-তিনো ফেলো রাখা হল। তারপর সেগুলি পুলিশকে ধর দিয়ে বাসাতল্লাস করে বের করা হল। কল্যাণী পুলিশ শ্রীঅরবিন্দের বাসাতেও খানাতল্লাস করতে এসেছিল, কিন্তু পুলিশের কর্তা যখন সেখান শ্রীঅরবিন্দের টেবিলের উপর রয়েছে গ্রীক বই, স্যাটিন বই তখন

চক্ষু চড়কগাছ করে বলে উঠল, *Il sait du latin, il sait du grec!* গ্রীক জানেন, লাতিন জানেন ইনি। বহু, সে চলে গেল দলবল নিয়ে—যে ব্যক্তি গ্রীক জানে লাতিন জানে সে কি কখন অপকর্ষ করতে পারে।

ফলতঃ ফরাসী সরকার আনাদের বিরুদ্ধে ছিল না, বশ্যাবধা সাহায্যই করত—আমরা তাদের অতিথি, রাজনীতিক আশ্রিত, আনাদের রক্ষা করা তাদের একটা সম্মানের কাজ। আনদের কথা বোঝানে, সেখানে ফরাসী ভাষা বহিরা। আন্তঃসরাসের জন্য ভূয়ের নড়াই আন্তর্পর্ষ্য চলে ফরাসী দেশে। তবে বৃটিশদের সঙ্গে বিভ্রান্তি—*entente cordiale*—সেটিও বশ্যায় রাখতে হবে, সবরে সবরে তাই তারা পড়ে গিয়েছে উত্তরসজ্জা।

বৃটিশরা বল হল ছাড়া নোভে দেখাতেও কল্পের করে নি। শ্রীযত্ববিশ্বকে তারা ধবর পাঠিয়েছিল এই কথা জানাতে যে তিনি যদি বৃটিশ ভারতে যিরে আসেন তবে বৃটিশ-রাজের কোন আপত্তি হবেনা। বরং তারা খুসী হবে এবং শ্রীযত্ববিশ্বের জন্যে পাহাড়ের উপরে (মালিনিংএ) শান্ত শীতল পরিস্থিতির মধ্যে একটি নোভারব বাংলো দেওয়া হবে, তিনি সেখানে স্বাধীনভাবে থাকবেন এবং বিনা বিবেচনায় ধ্যান সাধনা যিরে। বলা বাহুল্য এ হল মক্ষিকার কাছে মাকড়শার নিবন্ধন—শ্রীযত্ববিশ্ব নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করলেন, *No, thanks* বলে।

পরে একটা বড় মাজা আসে—বনে হয় সর্বাপেক্ষা বিপদজনক। প্রথম বহা-বুদ্ধের সময়। ভারতবর্ষে বিব্রাহ বখন গুরে উঠছে আর বাহিরে ইউরোপের বুদ্ধও তেনন সুবিধা হচ্ছে না। বৃটিশরা তাই চাপ দিলেন ফরাসীর উপরে—রাজনীতিক পনাতকদের সঙ্গে একটা কিছু হেঙ্কনেও করতে হবে—হয় তাদের সনর্পণ করতে হবে বৃটিশের হাতে, নয় তারা ভারতবর্ষ থেকে নির্ধাসিত হোক। ফরাসী সরকার তাই প্রণাব করন তারা *Algeria*তে আনাদের জন্যে স্থান করে দেবে—হুবে বহুতলে আনরা সেখানে থাকতে পারবে—মাত্রার বশ্যাবও তরাই করে দেবে, কোন অসুবিধা হবে না। যদি না বলা হয় তবে বিপদ আছে, বৃটিশরা জোর করে আনাদের হতগত করতে পারে।

সে মৃশ্য আনার বেশ বনে আছে। শ্রীযত্ববিশ্ব বলে আছেন তাঁর ঘরে (এখনকার *Guest House*), আনরাও এসেছি—জাবিল দেশের নেতা দু'তিনজন যারা পণ্ডিতেরী আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা এসে শ্রীযত্ববিশ্বকে বললেন *Algeria*-র প্রস্তাব এবং ইম্মিতে প্রকাশ করলেন তাদের সম্মতি। শ্রীযত্ববিশ্ব একটু চুপ করে থেকে পরিকার দির কঠে বললেন—“*I do not budge from here!*” তাঁরা জে বহুতাহত, এ রকম আশা তাঁরা করেন নাই। *Algeria*-তে পাব স্বাধীন বহুতল জীবন আর এখানে বিপদের মধ্যে অনিশ্চিত জীবন। তবে তাঁরা নিরুপায়—শ্রীযত্ববিশ্ব বখন নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা অন্য রকম কিছু করতে পারেন না, অগত্যা ক্ষুণ্ণবনে বেনে নিলেন শ্রীযত্ববিশ্বের সিদ্ধান্ত।

মনে পড়ে ফরাসী বিপ্লবী নেতা Danton-এর কথা। Danton এতদিন ছিল বিপ্লব-জরুরের শিখরে সর্বোচ্চ নেতা, এখন ভাগ্যচক্র তার নীচের দিকে ঘুরেছে—আর একঘন, চরমপন্থীরা, তরলের শিখরে—হুকুম হয়েছো তার শ্রেষ্ঠারের, তার অর্থ শিরশ্ছেদ (gillotins)। বহুদূর গাইলুটে এসে উপদেশ দিল, "পাশাও দানব, এখনো সবর আছে, পাশাও।" দানব নিবিষ্কার, উত্তর দিলেন বীরে শান্তভাবে—জা হয় না, on n'emporte pas le pays à la semelle de ses souliers—জুতোর তলায় করে দেশকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় না।

অবশ্য আশ্রমের উপর আক্রমণ পরেও এসেছে—ভেঁষরা অনেকই তার শাক্তী ছিলেন ; কিন্তু আশ্রমের ভিত্তি তখন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে, লোব উঠে গিয়েছে বহুদূর। আবি বলছি সেই যুগের কথা যখন ভিত্তি বলে কোন কিছু ছিল না। আজ যেমন আশ্রম-টট মাথা তুলে ঠাঁড়িয়েছে, শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে গিয়েছে—তার ঠাঁড়ি নিরোট্টে আঁট, তার শিকড় দুটু অচল বৃক্ষ-প্রসারিত। তার উপর আক্রমণে পাড়াপারব শাখা প্রশাখা দু'একটা বলে ভেঙে পড়তে পারে। তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু সে যুগে গাছটী আঁচল উপড়ে কেনবার সম্ভবনা ছিল, প্রচেষ্টাও ছিল। ঠাঁড়াবার ভারগাটি করে বেঁধার জন্য ছিল সমস্ত পুরান প্রবন্ধ। গ্রীষ্মকাল চলেছিল, বৈদিক ঋষিরা যেনন বনেছেন—অপনে পদ ধাতবে—পদক্ষেপের অবকাশ নেই যেখানে, সেখানে পদক্ষেপের স্থান করবার জন্যে।

সেই প্রথম যুগে পণ্ডিতেরী ফরাসী কলমে একজন প্রফেসর ছিলেন ফরাসী, নাম Jouveau Dubreuil. পরে বেশ নাম করেছিলেন—তিনি প্রকৃততঃ (অর্থাৎ পুরাকালের ইতিহাস) নিয়ে গবেষণা করতেন। আবারের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি পণ্ডিতেরী পুরাতন কারিগরী আবিষ্কারে লিপ্ত ছিলেন। পুরাতন গ্রন্থ, নিরানিদি প্রভৃতি হাতে আবিষ্কার করলেন যে বর্তমান পণ্ডিতেরী, আবি যাকে বলেছি শ্রেষ্ঠপুত্রী, তা এক সময়ে ছিল 'বেদপুত্রী' অর্থাৎ এখানে বেদ পঠন-পাঠনের একটা কেন্দ্র ছিল। এহ; তিনি আরো আবিষ্কার করেছিলেন—পুরাতন নির্দেশ এবং মানচিত্র ধরে যে সে বেদ-বিদ্যালয় ছিল ঠিক আবারের আশ্রমের প্রধান বাড়ীটি যেখানে সেই আরগায়।

প্রাচীন ঐতিহ্য এই : ঋষি অগস্ত্য দক্ষিণে এসেছিলেন বেদবিদ্যা (অধ্যাপিকা) প্রচার করতে। জাতি সত্যতার মধ্যে তিনিই প্রথম আর্ষ। সত্যতার অভিধান এনেছিলেন। বাঙ্গালী কবি হেনচন্দ্রের একটি কবিতা এই প্রসঙ্গে অনেকের মনে পড়তে পারে।

উঠ উঠ পিঙ্গবর অগস্ত্য ফিরেছে,

উড়েছে নব নিপান

ছুটেছে আলো-ভুকান

নব রবিচছবি বেধে গগন ধরেছে.....

এই ভ্যোতিঃ ধর গিরি
ভারতে প্রভাত করি,
ধরক নৃতন জ্ঞান,
ধরক নৃতন প্রাণ
নৃতন স্বপনে সাধে দেখুক স্বপন—
নীল অঙ্গণের কায়া কর উজ্জ্বলন।

কিষ্কিন্ধ্যী এই যে অগস্ত্যা দক্ষিণে চলেছিলেন, বিছা পর্বত নত হয়ে তাঁর পথ করে দিয়েছিল—
এবং নত হয়েই ছিল এবং আছে বতর্দিন অগস্ত্যা ঋষি ফিরে না আসেন। কনকঃ শ্রীঅরবিন্দের
প্রচেষ্টা সম্পর্কে স্বতঃই মনে পড়ে যার এই বৈদিক ঋষি অগস্ত্যের কথা। অগস্ত্যেরই মত
শ্রীঅরবিন্দ উত্তর হতে দক্ষিণে এসে স্বামী আসন পেতেছিলেন একটা নৃতন ভ্যোতিঃ পত্রি-
বেশনের জন্য—তাঁকে এক সবচেয়ে এদিকে নাব দেওয়া হয়েছিল উত্তর-যোনী। তাঁর কাজ
সাধনার ধাপেতেও একটা জায়গায় আশ্চর্য্যাকর নিম্ন পাই অগস্ত্যের প্রয়াসের সঙ্গে।
অগস্ত্যা কত বৎসর ধরে নুড়ে চলেছেন বাটির নীচে (অবচেতনায় অতনে), তিনি পরিপুষ্ট
করেছেন উভয় লোক—ঋণ ও পৃথিবী। তিনি তাঁর সঙ্গিনী লোপামুদ্রার সঙ্গে প্রবর করে
চলেছেন এখানেই যাতে জর জর শতনুখী বুদ্ধবজ্র।

জয়বেদজ্ঞ শতনীধনাভিঃ বৎসমাক্ষা নিধুনবিভ্যাসাব—কারণ, যে প্রয়াসকে স্বাক্ষা
করছে সেবতারা তা কখন ব্যর্থ হয় না—ন মুখা শ্রুতঃ যদবশি দেবাঃ। বৈদিক ঋষিদের
প্রয়াসকে পূর্ণতরভাবে 'শতনীধ' (শতনুখী গতি) নয় 'সহশ্রনীধ' ভাবে পূর্ণ সিদ্ধ করাই তাঁ
ছিল শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশ্য।

শ্রীঅরবিন্দ পট্টচেষ্টীতে ছিলেন ৪০ বৎসর। প্রধান কয়েকটি বৎসর তাঁর লেগেছে
আসন স্থির করতে—হান বেছে নিতে এবং স্থির হয়ে স্বামী হয়ে সেখানে বসতে। আসন
নির্ব্বাচনের কথা সকল সাধক ও সাধনার ইতিহাসে দেখতে পাই। তান্ত্রিকদের পক্ষনুগীত
আসন প্রয়োজন ছিল। রানক্কের ছিল পঞ্চাটি। পঞ্চ কেন? হয়ত যে পাঁচটি অক্ষ
নিরে মানুষ এবং যে পাঁচটি লোক নিয়ে সৃষ্টি—উপনিষদ নাম করেছে সেহ-প্রাণ-মন-বিজ্ঞান-
আত্মা। ঋষিরাও বলেছেন পঞ্চকৃতি (বাস্তবান) বা পঞ্চকৃষ্টি (কর্ষণকেন্দ্র) বা পঞ্চজনের
কথা (শ্রীকৃষ্ণের পাক্কন্যা শব্দের কথা স্মরণ করতে পারি)। বুদ্ধদেব সম্পর্কেও কথিত
আছে যে বোধিবৃক্ষমূলে আসন নিয়ে তিনি বললেন, এই যে বসেছি, উঠব না—শরীর ওকিরে
হাক্ হয়ে হাক্ বতর্দিন লক্ষ্য না সিদ্ধ হত—ইহাসনে শুধ্যত্ব যে শরীরঃ।

স্থান আসন বেছে নিয়ে ভৈরবী করতে হয়েছিল আরগাটি—বলেছি চকল মানুষাকারানি
সর্ব্বজ্ঞ—অগস্ত্যের প্রতীক, চলমান অগস্ত্যে সবকিছু চলমান—বৎসিক অগস্ত্যাঃ অগস্ত্য, সেসব
সব্বিরে শক্ত বাটিতে পৌঁছিতে হবে, অগস্ত্যের মত তাই ঋষিদের সহারে ধননকার্য্যে

তাকে বহু বৎসর অতিবাহিত করতে হয়েছিল। তাঁকে বিরাট সৌধ তৈরী করতে হবে, ভগবানের জন্য মন্দির। একবার তিনি যশু দেখেছিলেন, দেশনাড়কার প্রতিষ্ঠার জন্য চেয়েছিলেন 'ভবানী মন্দির'—এখনও তাই চাইলেন ভবানীর জন্য মন্দির, পৌর মন্দির (Temple City)। তার জন্য প্রয়োজন পাকা অচল অটল প্রতিষ্ঠা। বুড়িতে ঘল বতসুর সত্ত্ব অতলে—বলতে পারি পঞ্চতত্ত্ব প্রোথিত করবার জন্য। একাজ তিনি একাই করলেন চার বৎসর ধরে। ১৯১০ থেকে ১৯১৪—ভারপর শ্রীমা এলেন যদিও অল্প কিছুদিনের জন্য। তখনই ভবিষ্যতের পরিকল্পনা পরিস্ফুট হয়ে উঠল—কি কল্প কি আকার গ্রহণ করবে তার নবকল্প। ১৯২৪ অবধি এই প্রতিষ্ঠা গঠনের কাম তাঁর চলেছিল এবং শ্রীনারায়ণের সঙ্গে ১৯২৪ থেকে ১৯২৬ অবধি দু'জনে প্রতিষ্ঠাকে শক্ত করে তুলেছেন, পরীক্ষা করে দেখেছেন, ভবিষ্যৎ তার বহনের জন্য উপযুক্ত ও সমর্থ করে ধরেছেন। ১৯২৬ থেকে উপরের গঠন শুরু হয়েচে—সে-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী স্থাপনা। প্রথম বার বৎসর সেই স্থাপনার প্রস্তুতি এবং পরের বার বৎসর তাকে স্থায়ী করা। একাজ যখন তাঁর শেষ হয়েচে তখন তিনি সবে মীড়িয়েছেন অন্যতর নবতর কর্ম ও কর্মধারার জন্য।

শ্রীশ্রবিশ্বের এই শরীরের সমস্ত কাজই ছিল ভাগবতী জননীকে পার্থিব দেখে স্থায়ী করে প্রতিষ্ঠিত করা, তাঁর নব প্রকাশের জন্য, তাঁর মূল সান্নিধ্যের তপোবলে এট মন্দির—যাকে আনন্ড বলি আশ্রম—গড়ে উঠেছে; প্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন দেবী ভগবতী বিশ্বজননী। সোনার মন্দিরে জীবন্ত সিদ্ধি দেবী আকর্ষিতা। এবার কর্ণের তার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এবং সমস্ত পৃথিবী ও মানবজাতি যাতে হয়ে ওঠে তাঁর জীবন্ত প্রকাশ সেই লক্ষ্যে চলেছে তাঁর কারুণ্যশক্তি।

যোগসমস্কর-প্রসঙ্গ

অনির্বাক

[দ্বিতীয় পদ—সম্বন্ধ-আলোচন]

১৬

একতম

জ্ঞানযোগের সাধনার উদ্দেশ্য-ভাটা দুটি হারার কথাই বলাহি। প্রথম উদ্দেশ্যসাধার ধরে চলতে হয়, অল্পত অধিকাংশ সাধকের পক্ষে তা অত্যাশংক্য। যে-অচ্যুতেনা সে-প্রাণ-মনকে জড়িয়ে আছে, তাকে বিবিকল এবং পরিত্যক্ত করে স্থাপনস্থিত করতে হবে আর-চৈতন্য এবং তাঁকেও উজিয়ে নিতে হবে অক্ষরবৃক্ষের নিবিশেষ চৈতন্য। অনেক জ্ঞানযোগীর কাছে অক্ষরস্থিতিই হল পরমপুরুষার্থ। উদ্দেশ্য পথে যেতে-যেতে অহংকার কুণ্ডলী ভেঙে যাওয়ার চেতনা বিশৃঙ্খলিতনা পরিব্যাপ্ত হয় এবং বিশেষ অস্ত্রাবী টেশনকেও আবিষ্কার করে, এমন-কি পুথানে বিশৃঙ্খলিতাবের অনুভবও জ্ঞানযোগীদের আসে। কিন্তু সাধারণত তাঁরা এট অনুভবগুলিতে অক্ষরস্থিতির পুণ্যতা না দেখে দেখেন নান্যতা। কিন্তু পূর্ণযোগীর ধারণা তাই বিপরীত। অক্ষরস্থিতি তাঁরও কানা কিন্তু তাঁর কাছে তাই তাৎ-পর্য শুধু প্রপঞ্চের উপশমে নয়, উন্মাদেও। যেকের পরিণাম শুধু জীবনবিমুখ নৈরুদ্য নয়, দিব্যজীবনের দিব্যকর্মেই তার সত্যাকার সাধকতা।

অতিসূত্র চেতনায় যেখানে উন্মাদ আছে, সেখানে বচন স্বীকৃতিও আছে। বহর প্রপঞ্চ সেখানে একেরই শক্তিসৈচ্ছিক্রীর উন্মাদ। একই রূপে-রূপে সৃষ্টিচেন প্রতিরূপ হয়ে। বাইরের দৃষ্টিতে রূপের সীমা আছে, কিন্তু ভাবদৃষ্টিতে তো তাই সীমা নাট। উজ্জ্বল যাকে সঙ্গীত দেখছে, তাই তারই যাকে আবিষ্কার করছে অসীমকে। বরবীণাল দৃষ্টি তাই শিল্পর যাকে দেখে শিল্পর উদ্বেজন, যকের যাকে অর্থের পরিপূর্ণ প্রকাশ।

এই অনুভব আসে দৃষ্টির গভীরতা হতে, যার পরিচয় পুচ্ছলিত জ্ঞানযোগের যাকে আরম্ভ পাই না। সেখানে একরকে রূপনা করা হয় তাঁর আধাররূপে—বহর বেলাকে সে ধরে আছে যাত্র। কিন্তু সে-ই যে বহ হয়েছে এবং বহর স্রোতাকর্ষি বিভাবে পূর্ণরূপেই আবিষ্টি হয়ে আছে, এ-চেতনা সেখানে স্বীকৃত। আরম্ভ উপরভাস। দৃষ্টিতে জগৎটাকে দেখি, বেন একটা আবছা একরের পটভূমিকার বহর স্রগৌচর বেন। জ্ঞানযোগীরা আবছা একরকে স্রগৌচর করতে গিরে বহকে আবছা করে ভেদেন। ফলে দুটি দৃষ্টির কোনটিই পরিপূর্ণ অধৈবদৃষ্টির গভীরতা পায় না।

পূর্ণবোণীর সম্যকজ্ঞানে কিন্তু এক আর বহুর নাথৈ এই বিরোধ নাই। অবাঞ্ছ-
বাস্ত্বে নিৰ্গুণ-গুণে অবিগ্রহে-সাবিগ্রহে তিনি পান এক পরমেরই নিবিড় অনুভব। তাঁর
দৃষ্টিতে অরূপ যেমন রূপে অপরূপ, তেমন অরূপের মাথোঁই রূপের স্ব-রূপ। আর তাঁর এই
অনুভব গুণ ধ্যানের নিম্নতর গভীরতাত্ত্বি নর, বাবহারের স্বচ্ছন্দ প্রবর্তনাতোও।

*

*

*

ব্রহ্মস্বরূপের সাতটি বিভাবের কথা অন্যত্র বলেছি : ব্রহ্ম সন্মাত্র (Being), চিত্-
তপস্ (Consciousness-Force), আনন্দ, অভিনান সত্ত্বপশক্তি—এই তাঁর
স্বরূপের পরার্থ আবার তিনি ষিগুভূত বন, প্রাণ এবং রূপধাতু (Substance)
—এই তার অপরাধ। সাধারণত এই পরার্থ আর অপরাধের মাথৈ একটা ভেদ বা তার-
ভেদের কল্পনা করা হয়। প্রবর্তনাধকের কাছে পরার্থের চেতনা অশষ্ট বলে তাকে শষ্ট
করবার একটা আগ্রহ থাকে স্বাভাবিক এবং তাইতে ভেদবুদ্ধিকে ঝানিকটা আমল বেওয়া
খুব পোষের নয়। কিন্তু সিদ্ধের অনুভবে আবছা বলে কিছুই নাই। অতএব পরার্থে এবং
অপরাধে, প্রপঞ্চের উপশবে এবং উন্নাসে তাঁর কাছে তারতব্যের কিছুই নাই। উপশবকে
হদি বলি পুরুষ এবং উন্নাসকে প্রকৃতি, তাহলে তাঁর অর্থনায়ীশুর চেতনার পুরুষ আর প্রকৃতি
দুগুনত্ব এবং ব্রহ্মস্বরূপের সাতটি বিভাবই কে-কোনও ভূমিতে ওতপ্রোত।

আপাতদৃষ্টিতে পরার্থ আর অপরাধের মাথৈ যে-তারতব্য আমরা দেখতে পাই, তা দুচে
যায় বহন পরার্থের মাথৈ অপরাধের রূপায়র ঘটে। আর এই রূপায়রই বস্ত্ত সিদ্ধির
পূর্ণতা। হদি অনুভব করি যে-জড়ে রূপধাতুর প্রকাশ এবং যা আবার এই দেহের উপাদান,
তা ব্রহ্মের সন্মাত্রেরই বিভূতি এবং তাঁর জ্যোতি আমল আর শক্তি বিচ্ছুরণের আধারমাত্র ;
আবার প্রাণে ব্রহ্মেরই চিন্ময় তপঃশক্তি হিম্মোন ; আবার বন ব্রহ্মেরই অভিনান সত্ত্ব
এবং সত্ত্বলপের প্রতিভূ, আবার হৃদয়ের বৃত্তিতে ব্রহ্মেরই জ্বাদিনি শক্তি উন্নাস, তাহলে
ঐ পরার্থ আর অপরাধের আড়াল দুচে যায়—আবার চেতনার। আবার মাথৈ যা সিদ্ধ, তা
বিশুর স্তম্ভিষ্ঠত সাধা—কেননা আবার আশ্চর্য্যেতন্য বিশৃঙ্খলিত্যেরই প্রতিভূ। সুতরাং
কি ব্যক্তিতে কি বিশুর পরার্থে এবং অপরাধে বস্ত্ত কোনও ভেদ নাই। ব্রহ্ম সর্বত্রই সন্-
মাত্র চিন্ময় এবং একরস।

*

*

*

পরার্থে এবং অপরাধে ভেদ ঘোচে যেমন রূপায়র, তেমন রূপায়র সিদ্ধ হয় অভিনানের
মাথৈ। অভিনান ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি। তার একটি লক্ষণ, প্রজ্ঞা আর সত্ত্বলপ সেখানে
এক এবং সত্ত্বলপ আর সিদ্ধিতেও কোনও ব্যবধান নাই। অর্থাৎ জ্ঞান আর হওয়া সেখানে
এক ; আর সে হওয়ার প্রবেশ চিৎ হতে জড় পর্যন্ত অকুঠে প্রবাহিত। আবার
বন এই অভিনানেরই বিভূতি। কিন্তু জ্ঞান আর হওয়া তাঁর মাথৈ এক নয়। বন জ্ঞানে
পারে অনেক-কিছুই, কিন্তু শক্তি কুণ্ঠার তার জ্ঞান হওয়াতে পর্যবসিত হয় না। শক্তি

কুণ্ঠা আসে ইন্দ্রিয় হ্রাস আর বুদ্ধির সঙ্কোচ হতে। এই কুণ্ঠাকে দূর করবার জন্য সাধারণত জ্ঞানবোধগীতা বনোদয়ের পথ ধরেন। তাতে পরার্থভূমিতে ব্রহ্মের অপস্রোক অনুভব তাঁদের হতে পারে, কিন্তু সে-অপোরকৃতাকে অপার্থভূমিতে নাবিধে আনা সম্ভব বা সম্ভব হয় না।

উৎকণ্ঠের পথ না ধরে বাঁয়া আবেশের পথ ধরেন, গোড়া হতেই একটা সংবর্তন প্রত্যয়ের স্বাচ্ছন্দ্য ত্রীনের মাঝে থাকলেও বনের বাঁয়া তাঁদের বেলাতেও পুণঃবচায় একেবারে দূর হয় না। পরার্থচৈতন্যের আবেশ আসে স্বলকে-স্বলকে কিন্তু অপার্থভূমিতে তা স্থায়ী হয় না। তবে এক্ষেত্রে এপারে-ওপারে বাধাবানের কোনও পাকাপাকি সংস্কার সাধকের মাঝে না থাকায় প্রতি আবেশেই স্থাবিরের সত্তাবনা উচ্ছলিত হয়ে ওঠে।

অবশেষে উপর্ষ হতে আধারে অভিবাসন ছোঁড়ির নির্বরণ হয় নিরন্তর এবং তার আবেশে অপাতকের ত্রিসা হয় বেন অন্তর্গুচ দিব্যস্বভাবের প্রস্ফুটন। বনের বিক্ষেপ তখন সংবর্ত হয় এক অর্থও সত্যভাবনার সৌম্যতা, কানশঙ্কলের অর্থ আবর্তন মুক্তি পায় সত্যসঙ্কলের স্বল্পসংসারী সার্বকতার ভ্রমে, হ্রস্বের হ্রস্ব ও বেদনার বিবৃতা নিম্নস্থিত হয় এক অকৃত আনন্দের গহন গভীরে। এমনি করে জীবনের সবস্ত বিরোধের সমাধান হয় এক পরম জীবনের মহাবৈপুল্যের সুর-সঙ্গতির মাঝে। সুর ধ্বংস আর বোধ তখন রূপান্তরিত হয় স্বরূপ-স্থিতির আনন্দে, সিদ্ধি আর অসিদ্ধি এক মহাসক্তির অবস্থা লীলায়নে, বিদ্যা আর অবিদ্যা এক সর্ববিশাল ভাস্বরভাব, সত্তার সঙ্কোচ আর প্রশার এক অনিবাধ সন্মাত্রের আরম্ভপাতনের বিচিত্র ভাসিনায়।

এমনি কবে অর্থও সচিচ্চানন্দের আবেশে এপারে আর ওপারে একে আর বহুতে বনকেলিপ্ত সকল বিরোধের অবসান ঘটে।

*

*

*

জ্ঞান কর্তৃক আর ভক্তি—সাধনার এই ত্রিবার্গের মাঝেও তখন আর ভেদ থাকে না। জ্ঞানের লক্ষ্য ব্রহ্মের সহজাবে স্থিত হওয়া; কর্তৃক লক্ষ্য তাঁর চিত্ত-তপসের পরীক্ষা হওয়া; আর ভক্তির লক্ষ্য তাঁর আনন্দস্বরূপে অবগাহন করা। অর্থাৎ তিনটি সাধনারই লক্ষ্য সেই সৎ-চিত্ত-আনন্দকেই উপলব্ধি করা—যার-বার নিম্নস্ত ভাসিতে। কিন্তু উপলব্ধির বস্তুটি জিহ্বাদিন হয়েও স্বরূপত এক। সুতরাং কে-পথই ধরি না কেন, চরম উপলব্ধিতে ভেদ কারও সঙ্গে করাও বিরোধ থাকতে পারে না।

বুদ্ধিগতিই হল জ্ঞানবোধগীর প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু আগেই দেখেছি, এই স্থিতি বিশেষাভিগতার নিবিশেষ প্রাপ্তিতেই নয়, বিশুদ্ধকতার অনিবাধ উন্মাদেও। আবার মাঝে আনি বেনন একা, তেননি আবার সবার মাঝে আনি এক। এক বহুতে ছড়িয়ে পড়ছেন শক্তির উন্মাদে। ব্রহ্মের জ্ঞান আবার সম্পূর্ণ হবে না যদি তাঁর শক্তির জ্ঞানকে অসীকার না করি। শক্তির উন্মাদ তাঁর দিব্যকর্তব্য এবং সে-কর্তব্যের আবিষ্কার পরীক্ষা। স্বপ্নি বেনন তাঁর

‘জানমঃ তপঃ’, আনন্দের জীবনও আবার কাছে ডা-ই। ব্রহ্মের জ্ঞান আনাকে সর্বভোক্তায়ে মুক্ত করেছে বলেই কর্ম আবার কাছে আর বন্ধন নয়, আমার স্বরূপশক্তির বিচ্ছুরণ।

এই বিচ্ছুরণে বস্তু সঙ্গে একের সম্পর্ক নির্বিড় হয়—বস্তুই উদ্ভাসে। যেমন ব্রহ্ম সং এবং চিং, তেমনি তিনি আবার শক্তি এবং আনন্দও। একটিতে তিনি পুরুষ, আরেকটিতে তিনি প্রকৃতি। কিন্তু দৃষ্টিতে আবার এক যুগলই তথ্য। তাঁর দিব্যকর্মের যেমন তিনি ব্রহ্ম এবং ভর্তা, তেমনি তার ভোক্তাও। অর্থাৎ মহেশ্বররূপে তাঁর আত্মপ্রকৃতিরই তিনি ভর্তা এবং ভোক্তা। ভরণে শক্তি, ভোগে আনন্দ। তাঁর প্রকৃতিকে অস্তর হতে বিচ্ছুরিত করে আবার অস্তরে আকর্ষণ করছেন। এই আকর্ষণে পুরুষের আনন্দ আর প্রকৃতির শ্রেয়। তাঁর উপলব্ধিতে আনন্দের আবিষ্কার করি ব্রহ্মের রসস্বরূপ। স্বর্গে বিধৃত আকাশের এই রস-চেতনায়। একে উপলব্ধি না করলে তো ব্রহ্মোপলব্ধি পূর্ণ হবে না।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, সত্য-জ্ঞানের সিঁড়ি শেষপর্যন্ত আনন্দের পৌঁছে যেবে পরম এককের উপলব্ধিতে। সে-একই সর্বস্বরূপ—যেমন ব্রহ্মের স্বরূপে, তেমনি আনন্দের সাধনায়। জ্ঞান শক্তি ও আনন্দ হতে বিযুক্ত নয়। তিনিই ব্রহ্মের স্বরূপ এককেরই বিভক্ত।

১৭

পুরুষ ও প্রকৃতি

এতকণ যে-এককের কথা বললাম, বস্তুত তা বিদ্য। বিদ্যাতা এককের স্বভাব। বিশ্বের সর্বত্র এক ভেঙে দুই হচ্ছে, আবার দুই জুড়ে হচ্ছে এক। এই বৈতলসম্পর্ক আরেতে সম্পূর্ণ। আরেতে ত্রেয় আর ভেগে অত্রেয়—এই তাঁর নরনরত্যা।

একের চেতনাকে অস্বাভাবিত রেখেই তাঁর মাঝে পুরুষের নীল্যাকে দেখতে হলে চাই দৃষ্টির গভীরতা। ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’—একই আছে দুই নাই, এ-দৃষ্টিতে আছে নির্বিশেষ ব্যক্তি-চেতনায়ের প্রপাতি। এ-অনুভব নিঃসন্দেহে সত্য, কিন্তু এ-ই সব নয়। তাই উপনিষদই আবার বলছেন, ‘স একাকী নৈব রেবে’—তিনি একাকী থেকে কিছুতেই নশিত হনেন না। তাঁর শক্তি ও আনন্দ বিচ্ছুরিত হল শতরূপা প্রকৃতিতে। সেই প্রকৃতি আবার ফিরে এল তাঁরই মাঝে। বিচ্ছুরণ আর সঙ্কর্ষণে সত্তা আর আনন্দের মাঝে খেলতে লাগল চেতনার বিদ্যুৎ। সমস্ত ভগৎ এই অনাদি-নিবৃদের নীলাম্বিনায়ের অপকল্প কাব্য। ভগৎসম্পর্কে এই রসানুভূতিতেই দৃষ্টির পূর্ণতা। আর এই দৃষ্টিতেই প্রকৃতির রূপান্তর সম্ভব হয়—যা পূর্ণমোহীর একান্ত কাব্য।

মানুষ ঝুঁকতে পরমকে (Absolute)। পরমের অনুভব সে পেতে পারে চেতনার চরম উৎকর্ষে। কিন্তু এখানে, ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাঝে তাঁর চেতনা কৃষ্টিত। তাই সে

পরকে খোঁজে এবং পায় অতীতের মাঝে। সে-পাওয়া সাধারণত হয় সর্বনাশ। এ-পায় থেকে ওপারে যে যায়, এপারে আর সে কিরে আসতে চায় না। কিন্তু এপারের প্রতি এই বিকৃত্য নবের মায়া। অন্যরিক অনুভবে ওপারের চেতনা প্রগাণ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আপনি বিচ্ছুরিত হয়। তখন এপারে মায়া সহজ হয়, ওপারের অনুভব এপারেও বজায় থাকে। তাইতে ইন্ডিয়ানভূতি অপরূপের স্বাক্ষর পতীর হয়। বা চির নিচক বস, তা হয় ভাবন, বেধার অর্ধ স্ক্রুতি চর স্বপ্নে। তখন কবির দৃষ্টিতে দেখি, পরম শুণু ওখানেই নয়, পরম এখানেও। ওখানে প্রশ্নের পরমতা, এখানে উন্নাসের। ওখানে প্রকৃতির নিমেষে পুরুষের কৈবলা, এখানে তার উল্লেখে প্রকৃতি-পুরুষের বৃণনছাড়া। বিয়মানশেও তখন ব্রহ্মানন্দ।

*

*

*

অখণ্ডের এই ফিলনতাকে দর্শনে নানা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তিনটি সংজ্ঞা আমাদের পরিচিত : সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি, বেদান্তের ব্রহ্ম-মায়া, আর তন্ত্র-পুণ্যার্থে ঈশ্বর-শক্তি। সাংখ্যের বিচার ব্যষ্টিকে নিয়ে প্রতি জীবের মাঝেই সে চৈতন্যরূপে দেখে পুরুষকে আর ক্রিয়াক্রমে প্রকৃতিকে। পুরুষ আর প্রকৃতি দুইই তার কাছে সত্য, যদিও প্রকৃতি হতে বিবৃত পুরুষের কৈবলাই হচ্ছে তার কাছে পরমার্থ। বেদান্তের বিচার সমষ্টিকে নিয়ে : বিশেষ বুলে সে দেখে ব্রহ্মচৈতন্য আর তারই মায়াশক্তি। তার মাঝে ব্রহ্মই সত্য, মায়া অনির্বিচরীয়া, আর তার কর্ণে এই জগৎ ব্রহ্মে আরোপনাম, অতএব বিখ্যা। তন্ত্র-পুণ্যার্থে বিচার সমগ্রকে নিয়ে ঈশ্বর আর শক্তি দুইই সত্য, দুইই চিন্ময়, দুইই অবিনাভূত (inseparable)। এখন দেখতে হবে, দর্শনে স্বীকৃত এই ফিলনতায় আমাদের জীবনে কি রূপ ধরেছে।

জীবনে মৈত আছে, একথা অনস্বীকার্য। এই মৈতকে বলতে পারি জীবচৈতন্য আর প্রকৃতি। প্রকৃতির ক্রিয়া চলছে যেমন আমার অধারে, তেমনি বচিবিশু। সে-ক্রিয়ার বোধ যার মাঝে হচ্ছে, তাকে বলি জীবচৈতন্য। বিগুহ জড়বাদ বলে, জীবচৈতন্য জড়ক্রিয়ার পরিণামমাত্র। কোনও-কোনও জড়বাদী তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। কিন্তু অপরের বোধকে যাত্রিক ব্যাখ্যার দ্বারা উড়িয়ে দিলেও নিজের বোধকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একদিকে ক্রিয়া, আরেকদিকে বোধ—এদটি বুঝনি দাঁড়িয়ে আছে; তাদের কাউকে অস্বীকার করা চলে না। জীবচৈতন্য প্রকৃতিপরিণামের ফল অতএব যাত্রিক একথা মেনে নিলেও দেখি, চৈতন্য ক্রমে বস্তুর কবল থেকে নিজেকে উদ্ধার করে বস্তা হবার চেষ্টা করছে, এই তার বৈশিষ্ট্য। সাংখ্যদর্শনে চৈতন্যের এই বৈশিষ্ট্য পরিস্কৃত। সেখানে বুঝিকে পর্বত প্রকৃতিপরিণাম অতএব জড় (=বুদ্বা) বলে স্বীকার করেও আরচৈতন্যের খাওয়া বোধিত হয়েছে। প্রকৃতিই সব, আরভাব বিখ্যা—এনত যেমন বাণুনিক জড়-বাসের, তেমনি বৌদ্ধদর্শনেরও। তবে জড়বাদে লোকোক্তরের প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু বৌদ্ধ-দর্শনে লোকোক্তাই পরম পুরুষার্থ।

বোনের উপর বলা চলে, আনন্দের জীবনে প্রকৃতির ক্রিয়া যেমন সত্য, তেমনই জীব চৈতন্যের স্বাভাবিক সত্য। প্রকৃতির সকল ক্রিয়াই বোধের কাছে অনুকূল বলে প্রতিভাত হয় না। প্রতিকূল বোধনাকে পরিহার করবার শূন্যে জীবচৈতন্যের একটি বৈশিষ্ট্য। এই থেকে দার্শনিক ধর্মবাদের উৎপত্তি। ধর্ম হতে ধর্মবাদের উদ্ভবকে সেখানে জীবের পরমপুরুষ বলে গণ্য করা হয়েছে। তার উপায় হল প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক অর্থাৎ জীবচৈতন্যকে প্রকৃতির ক্রিয়ার উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া। এই সাধনার ক্ষমতা তিরিকার এবং পর্যবেক্ষণ পুরুষের কৈবল্য। কৈবল্যই পুরুষ স্বরূপে অবস্থিত এবং স্ব-স্ব; অন্যত্র সে প্রকৃতিভিত্তিক। কৈবল্য জীবচৈতন্যের একটি সূক্ষ্ম এবং কাম্য সত্ত্বা, তাতে সন্দেহ নাই। সাংসারিক পরিভাষা অনুসারে তখন জীবকে বলাতে পারি পুরুষ।

*

*

*

প্রকৃতি হতে বিবিধ পুরুষ প্রকৃতির প্রতি উদাসীন। 'উদাসীন' অর্থে তিনি প্রকৃতির উর্ধ্বে আশীন, তার ক্রিয়ার অবিকৃত। অবিকৃত বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা, তার ইতিহাস হল প্রশান্তি। পুরুষের প্রশান্তি গভীর হতে গভীরতর হয়ে অবশেষে পর্যবেক্ষিত হয় আত্ম-স্বাভাবিক। পুরুষ তখন নিজের মধ্যেই ভূমি পেছেন, প্রকৃতি তাঁর কাছে উপস্থিত অবস্থায়।

সাধনার প্রথম কনসারভেশন-এ অবস্থান কাম্য সন্দেহ নাই, কিন্তু পুরুষ যার প্রকৃতির মাঝে এই চিরবিচ্ছেদই কি একমাত্র পুরুষ? এমন করে ব্যাপ্তিপুরুষ না হয় বিশ্বপ্রকৃতি হতে বিবিধ হয়ে গেছেন, কিন্তু তাতে পরমপুরুষের সঙ্গে পরমাপ্রকৃতির সম্বন্ধের সব বহন্য ভাঙা পড়ল না। জীব প্রকৃতি থেকে ধর্ম পায়, তাই প্রকৃতির সঙ্গে তার এই অসহযোগ—নিজের গরভে। কিন্তু শিবেরও কি এনিতর অসহযোগের কোনও প্রয়োজন আছে? যদি না থাকে, তাহলে জীবও কি শিবস্বভাবের অনুসরণ করতে পারে না? প্রথম অবস্থায় তা সম্ভব নয় জানি; কিন্তু স্বরূপস্বভাবের পরিপাক চৈতন্যের উন্নয়ন অসম্ভব বা বর্জনীয় কেন হবে? বরং তাই কি স্বরূপস্বভাবের স্বাভাবিক পরিণাম হবে না?

অভিযুক্তির (utter freedom) সাধনার তাই হয়। বিবেকের সাধনার চেতনা প্রকৃতি হতে ওঠিয়ে এসে কেন্দ্রে সংহত হল, গুণকোষ থেকে মুক্ত হয়ে স্বয়ং হল। কিন্তু মুক্তিতে সে কেবল উদাসীন হবে কেন, স্বাধীন হবে না কেন, প্রকৃতির প্রশাসনের তার কেন সে নেবে না?

স্বভাব চেতনার সংহতন সিদ্ধির প্রাথমিক পর্ব স্বাভাবিক। মনের বিকৃত সংস্কারের বাধা যদি না থাকে, তাহলে সংহতনের পরে স্বভাবের বিরোধে দেখা দেয় বিস্ফোরণ: আত্মচৈতন্য বিস্ফারিত হয় বিশ্বচৈতন্যে, উপনিষদের জ্ঞান-স্বাভাবিক হয় বহানু-স্বাভাবিক, চিহ্নগিরি সিদ্ধি আদিভাষ্যভিত্তিক পরিভাষার হয়ে ওঠে। বিশ্বপ্রকৃতি তখন বিশ্বচৈতন্য পুরুষ হতে বিবিধ হয়—আদিভাষ্যের প্রভাবপ্রসারই সে কৃষ্ণগুণ, তার দ্বারা অবিকৃত আদিভাষ্য: এবং প্রশান্তি। ব্যাপ্তির সত্য তখন সর্বত্রই থাকে ছায়ায় বার; অথবা: জীবই মাঝে সে কোণে থাকে জয়

প্রজা এবং সত্ত্বের বাহন হয়ে। তাঁর স্বকীয় জাবনা বেদনা সম্বন্ধ তখন স্পর্শবির হোঁচকার সোনা হয়ে যায়। বিনুভাবন পুরুষের সাবুজো প্রসুত আটচৈতন্যে নানে পতির নির্ভর।

তুমি ঔদাসীন্য নয়, ব্যাভ্যাসিচ্ছিই পূর্ণবোধীর পুরুষার্থ।

ব্যাভ্যাসিচ্ছির বাপওলির একটা ইচ্ছিত নীতার আছে। বলা হয়েছে, এই সেহেই পরমাঝা পরমপুণ্য আছে, তিনি উপভ্রষ্টা অনুভ্রষ্টা ভর্তা ভোক্তা এবং বহেশুর। প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক বাপে-বাপে নিবিড় হয়ে উঠেছে। উপভ্রষ্টের যার গুণ, নহেশুরের তার শেষ।

প্রথমত পুরুষ হতে পারেন প্রকৃতির ভ্রষ্টা মাত্র—কর্তাও নন, ভোক্তাও নন। অস্ত্রের বাইরে প্রকৃতির ক্রিয়াকে তিনি প্রশান্ত ঔদাসীন্যে দেখে যাচ্ছেন, কিন্তু সবেই ভড়িয়ে যাচ্ছেন না—এমনকি এ যে তাঁর প্রকৃতি একথাও বলছেন না। প্রকৃতি থেকে তিনি সম্পূর্ণ বিবিক্ত। অপরা-প্রকৃতির বশ্যতা হতে মুক্ত হবার জন্য এই বিবেক যে অপরিহার্য একথা আগেও বলেছি। তবে এই ভ্রষ্টের বকবকের আছে। বিত্তম্ভ ভ্রষ্টের একবারে আয়ত্ত হয় না। প্রথম তার মাঝে তিস্তির সন্ধিশূণ্য থাকে। অসাড় হয়ে প্রকৃতির ক্রিয়াকে সয়ে বাড়িছে—এ হল তানলিক ভ্রষ্ট। বিত্তম্ভ নিয়ে সইছি—এ হল রাজসিক। প্রসন্ন হয়ে সইছি—এ হল সাত্বিক। কিন্তু বিত্তম্ভ ভ্রষ্টের সওয়াপ কোনও প্রশ্ন ওঠে না। অস্ত্রের-বাইরে বিনুপ্রকৃতির নীলা দেখে তখন নশিত হচ্ছি। অশচ্য তা হতে আমি বিবিক্ত, ইচ্ছানায়ে দেখার পাট চুকিয়ে দেখার স্বাভাব্য আবার আছে।

বিনি ভ্রষ্টা, প্রকৃতির ক্রিয়ার তিনি কর্তা নন। কর্তৃর হয় ঈশুরের, নয়তো প্রকৃতির নিজের। ভোক্তাও তিনি নন, কেননা স্বধ্বংস বা ইচ্ছা-যেঘের আপোদন তাঁর মাঝে নাই। দেখার একটা আনন্দ থাকতে পারে, কিন্তু তা উন্নাস নয়, আপনাতো আপনি থাকার প্রশান্ত প্রশমুজ। আকাশের বত এই প্রশমুজ দৃশ্য থাকলেও আছে, না থাকলেও আছে। স্বভাব্য ভাকে ঠিক ভোগ বলা চলে না।

কিন্তু এই বিত্তম্ভ ভ্রষ্টাই আবার ভোক্তা হন প্রসুত অনুভবের প্রগাঢ়তায় এবং পত্রি-ব্যর্থিত। ভ্রষ্টের এসেছিল বিবেক হতে অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে তফাত হওয়া থেকে। তফাত হওয়ার মূলে ছিল প্রকৃতির সঙ্গে ভড়িয়ে যাওয়ার ভয়। কিন্তু পুরুষ অপ্রতিষ্ঠ হলে কবে তাঁর এই ভয় থাকে না। 'চায়া গাছকে প্রথম বেড়া দিয়ে রাখতে হয়, নইলে পক্ষ-ছাগলে মুড়িরেখায়। কিন্তু ও 'ড়ি মোটা হয়ে গেলে ভাতে হাড়ি বেঁধে রাখলেও কিছু হয় না।' অভয়ের সঙ্গে-সঙ্গে আসে স্বাচ্ছন্দ্য, আসে চেতনার পরিব্যাপ্তি। তখন অনুভব হয়, জগৎ আবারই মাঝে। আয়ত্ত হয়ে আমি যেমন আরম্ভপ্রকৃতির ভর্তা বা ব্যাক, তেমনই পত্রি-ব্যাপ্ত চেতনার আমি বিনুপ্রকৃতিরও ভর্তা।

পুরুষ ভর্তা, কিন্তু তবুও প্রকৃতির প্রশাসনের ভায় যেন তাঁর উপরে নাই। যদিও শক্তির সঙ্গে এখন তিনি মূর্ত, তবুও সে যেন স্ব-স্তম্ভ, সে যেন তাঁর শক্তি নয়। কিন্তু অনুভবের প্রণালীতায় সেখান এই আনন্দ তাবটুকুও আর থাকে না। পুরুষ তখন যেন, শক্তি তাঁরই আত্মশক্তি, প্রকৃতির ত্রিভা চৈতন্যেরই বিচ্ছুরণ—যেমন ব্যক্তিগত, তেমনই বিশেষ। চৈতন্যের ত্রিভা ন্যাকায়িত্যবী (teleological), তাঁর এলাবেলা চলনেরও পরিণাম একটা সুনির্দিষ্ট চক্ষের দিকে—যেমন শক্তির টলে-টলে চলার পরিণাম সুনির্দিষ্ট অথচ স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে। এর মাঝে নির্দিষ্ট রয়েছে চৈতন্যের নির্বাচনী শক্তি (selectivity), যাকে বলতে পারি চৈতন্যের একটা প্রধান লক্ষণ। পুরুষ যখন প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছেন, তখনও এই নির্বাচনী শক্তি তাঁর মাঝে কাজ করেছে, যার জন্য তিনি বনেছেন অবিরোধের ভায় আর বিরোধ উপাসেয়। বিরোধের প্রেরণায় প্রকৃতির সমস্ত ত্রিভাকে তিনি নিরুদ্ধ করতে চেয়েছেন স্বরূপাবস্থানকে অটল করবার জন্য। আগেই বলেছি, তাঁর মাঝে বানিকটা ভয় ছিল, 'পাছে বোঝাবার হয়ে পড়ি।' কিন্তু স্বরূপাবস্থান পাকা হওয়ার পর আর শক্তির রাস কোন সাধবার প্রয়োজন হয় না, তখন তাকে স্বচ্ছন্দে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে উল্লাসে। শক্তি তখন আত্মচৈতন্যেরই ছলোয়ার বিচ্ছুরণ। এ যেন যে-শক্তি একদিন টনতে-টনতে চলেতে নিশ্চল, পদক্ষেপের দৃঢ়তাকে আরও করে সে যেন আজ তাকে নৃত্যে চিত্তমানিত করে তুলন। নৃত্যের মাঝে একদিকে যেন আছে স্বাচ্ছন্দ্য, তেমনই আছে স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ যা প্রত্যেকটি অঙ্গারকে (bodily movement) একটা স্পষ্ট লক্ষ্যের অনুকূলে সেতে নিচ্ছে। এর মাঝে প্রকাশ পাচ্ছে চৈতন্যের নির্বাচনী শক্তি। চৈতন্য তখন শক্তির বিজ্ঞাতা হনুমতা এবং ঠশুর। যে-শিব কালীর পায়ে তনার নব হয়ে ছিলেন, তিনিই এখন নটরাজ।

নটরাজ আনন্দময়, তিনিই প্রকৃতির ভোক্তা বহেশ্বর। অবরতবিনতে ভোগ ছিল স্বপ্ন-পুষ্পের সঙ্গে বিশ্ব। কিন্তু পরমভূমি স্বাভাবী। এই ভূমিতে চেতনা প্রণায় বলেই প্রসন্ন, প্রসন্ন বলেই অভয়, অভয় বলেই আনন্দময়। প্রকৃতিতে শক্তির যে-উল্লাস, তাঁর নিরুদ্ধ শক্তিতেই পুরুষের আনন্দ।

অতএব আদিত্যে যে-পুরুষ প্রকৃতি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলেন তবু ভর্তা, বিজ্ঞানের পরিপাকে ও শক্তির মুষ্টিতে তিনিই এখন প্রকৃতির ভর্তা কর্তা এবং ভোক্তা বহেশ্বর।

অন্যও সচিচমানশই পুরুষ এবং প্রকৃতিতে যিদ। পুরুষে তাঁর চিন্মর সন্মাত্তের প্রকাশ আর প্রকৃতিতে তাঁর তপজিয় (radiant) শক্তি। দুটি অবিনাবৃত্ত : দুয়ের বিনাই আনন্দ। এই আনন্দ যেন লোকোত্তরে শক্তির সাহসরণে, তেমনই আবার বিশ্বলোকে শক্তির বিচ্ছুরণে।

প্রকৃতি-পুরুষের যে-সামর্য্য ব্রহ্মে, তা নিত্যবৃত্ত অতএব ব্রহ্মভূত সিদ্ধবীষের অতি বৃত্ত চেতনাত্তেও।

১৮

জীবের সৃষ্টি

যারবার বলেছি, পূর্ণযোগের লক্ষ্য প্রকৃতির দ্বাপার। তাই আমাদের জীবনে পরম পুরুষার্ঘ্য। আমরা অবিশ্যাক্তনু প্রাকৃত জীবনকে আঁকড়ে থাকতে চাই না ; আবার সৃষ্টির লক্ষ্যে লোকোক্তরে উঠাও হয়ে যেতেও চাই না। চাই দিবা জীবন—যা ওখানে যেমন পূর্ণ তেমনি এখানেও পূর্ণ, প্রতি বৃহত্তে যার পূর্ণতা হতে পূর্ণতাই উপচে পড়ছে, আবার সর্বপূন্যতার অগম রহস্যোও যা অনিশেষ পূর্ণতার বরখব করছে। আমরা যেমন দাকাশকে বানি, তেমনি পৃথিবীকেও বানি—পৃথিবীর হিরণ্যবকে সেমি আকাশেরই আনন্দরূপ, তারই আলোর আর তাপে সেমি হ্রসবে-হ্রসবে পূর্ণতার অপূর্ণের দল বেকা। আমাদের চেতনার পুরুষ শুধু প্রকৃতির বিবিধ উপদ্রষ্টা নয়, তিনি তার ভোক্তা নন্দেশ্বরও।

এই বোধ এক সর্বসম্বলস অমৈতপনছির উপর প্রতিষ্ঠিত। সব-কিছু ছাপিয়ে যেমন অমৈত, তেমনি আবার সব-কিছু নিরেই অমৈত—এই হল সনাক্ত জ্ঞান। এই অমৈত একটা আচ্ছিন্ন প্রত্যয় (abstraction) নয়। সেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তার প্রতি কোষে প্রাণ যেমন ওড়প্রাত হয়ে একটি সমগ্র অর্ধের বিধান করে চলেছে এখানে-সেখানে আপাত-বিকলতা সবেও, তেমনি ব্রহ্মের একর সর্বানুসৃত হয়ে সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিনোদনের সনাতার ও সনাতানের ভিতর দিয়ে সৃষ্টিয়ে তুলছে এক বৃহৎ স্রবসততি। সৃষ্টির কলিপত স্বগতভেল সেখানে বোধির দৃষ্টিতে সর্বগত অভেদেরই বিলাস। অস্তরের গভীরে এই অভেদের অনুভবে চেতনা যখন ব্যাপ্ত হয়, তখন ইন্দ্রিয়মনের সেবা বাইরের ভেদকে সে অনায়াসে বহন করে চলে। জগতের সঙ্গে জীবের কোথাও আর তখন বিরোধ থাকে না।

অর্গেও বলেছি, এই এক কিছ একা নয়—বিদল। তার একটি দল পুরুষ বা চৈতন্য, আরেকটি দল প্রকৃতি বা শক্তি। চৈতন্য যখন আপনাতে আপনি বিভোর শক্তি তখন গুটিয়ে আছে তার মধ্যে। আবার সেই চৈতন্যই যখন আত্মবিচ্ছুরণে উন্নতিত, শক্তি তখন ছাড়া পেয়েছে বিচিত্র কর্বে। অথচ এটি পর্যায়ক্রমে ঘটছে না, ঘটছে যুগপৎ। যেমন দীপের শিখা গুটিয়ে পেকেই ছড়িয়ে পড়ছে—প্রকাশ আর বিকিরণ সেখানে সহচর। আত্ম-চৈতন্যও আমরা এই অনুভবই পেতে পারি—স্বষ্টির সহজ্ঞানলে বেখতে পারি নিম্মল চৈতন্যের হ্রস্ব-শ্মশ। যেমন আকাশের বৃকে আদিভা, আবার আদিভোর বৃকে পারার বত জ্যোতির টলনলানি। সত্তা (Being) আর সত্ত্বতি (Becoming) প্রকাশ আর প্রবৃত্তি সেখানে সহচরিত।

জীবনে প্রকৃতি বা শক্তির সঙ্গেই আমাদের প্রথম পরিচয়। সে-পরিচয়ের আনন্দ এবং যেমনা দুইই আছে। চাই আনন্দ, কিন্তু ছয়তো পাই দুঃখ। প্রথম বনে কবি, দুঃখের কারণ বুঝি বাইরে। পরে বুঝি, দুঃখের কারণ আবার চেতনার সত্ত্বাচে—যার আরেক

নাম অধিনা। চেতনাকে যখন আকাশের রত প্রশান্ত কবি পরিবাস্য করি, মূঃধের কুম্ভা তখন কোণার মিলিত মন। যত্নের অনুভব করি প্রকৃতির আরেক রূপ—স্বঃমূঃধকে ছাপিয়ে তার অমলরূপ। এই আনন্দে প্রকৃতি আমার স্বকীয়া—আমারই আত্মপ্রকৃতি, অতএব স্বপ্নতিনী। অতঃপ্রকৃতির স্বকীয়ারে আমি স্বপ্ন চই। স্বপ্ন চয়ে ননি স্বপ্ন-প্রকৃতির স্বকীয়ারে চাই নিই অর্থাৎ যোগ্য হয়ে কর্তব্য করি, তবই কন্যা। অতঃমূঃধেরে তখনই আমি প্রকৃতির সহধর্ম। আমি ব্রহ্ম, আমি সচিৎসানন্দ। পুরুষ-প্রকৃতির স্বপ্নরূপতার পূর্বব্রহ্মের অধিগমই যোগের লক্ষ্য।

*

*

*

অনুভবের পরব্রহ্মিতে যেমন আছে পুরুষ-প্রকৃতির স্বপ্নরূপতা, তেমনি অপরভূমিতে আছে তাঙ্গের অধিব্যক্তি। স্বপ্নরূপতার পুরুষ স্ব-জ্ঞা, অধিব্যক্তির প্রকৃতি-তত্ত্ব। প্রকৃতি-তত্ত্বিত পুরুষকে বলি জীব—সত্য জীব নয়, প্রাকৃত জীব। অবিদ্যা এই জীবের অশ্রুতি, আর অবিদ্যাই মূঃধের দেহ। অবিদ্যাজন্য জীব রূপ, কিন্তু এই জীবই আমার মূঃধ।

বহন হতে নৃষ্টি পর্যন্ত অনেকগুলি ধাপ। ধাপে-ধাপে চেতনাকে বিকশিত করে জীব যেমন নৃষ্টিতে পৌঁছতে পারে, তেমনি পারে সব ধাপ ভিত্তিতে চেতনার পরিনির্ধারণও। নির্ধারণ উপন্যাস, বিকাশে উন্নয়ন। কোন্ পথ সে ধরবে, তা নির্ভর করে মনের সংস্কারের উপর। অমলভাবেরও যেমন নৃষ্টি, তেমনি অভিনবদের ভোগ্যঃপদ্ধিতে মনের রূপান্তরেও নৃষ্টি। যখন পুরুষেরই নৃষ্টির পূর্ণতা, তখন তাকে বলি অতিনৃষ্টি। অতিনৃষ্টিতে জীবতার মূলো মিলিত মন না, প্রাকৃত জীব সত্য জীব হয়ে ওঠে। সেই সত্যজীবের সঙ্গে তখন চলে প্রাকৃতের বিভিন্ন সঞ্চয়ের উন্নয়ন। প্রাকৃত সঞ্চয়ের মূল্যতা পরিপূর্ণিত হয় অপ্রাকৃত আনন্দের অনুভব-সংস্কারে।

জীবনের মূল হাফলে পুরুষ বা ব্রহ্ম, প্রকৃতি বা নৃষ্টি, আর তত্ত্ব জীবন—এই তিনটি ভয়। সত্যজ্ঞান এদের কোনটিকেই প্রত্যাখ্যান করে না—প্রত্যাখ্যান করে তথু অবিদ্যাকে আর মূল হাফলে অস্থায়ী সত্য। আমার স্বকীয়া আমি ব্রহ্মকে বা আত্মচেতনায় ব্যাপ্তিকে জানে না, তাই সে প্রকৃতির জীড়নক হয়ে মূঃধ পায়। এই তার বহন। পাকা আমি সবার মাঝে চড়িয়ে পড়ে সগাটকে ছাপিয়ে যায়। তার চেতনায় তখন নাম-রূপ লেখ-কান বা জন্ম-মৃত্যুর কোনও গতি থাকে না। আকাশের রতই সে শাশ্বত সর্বগত; সর্বধার হয়ে সে সবার প্রবর্তক। সে সবার স্বকীয়া, এই তার অসম্প্রতি (Non-birth); আমার সে তার স্বকীয়ারে সহজ, আর সেই কেন্দ্র থেকে সবার মাঝে নিজে থেকে বিনিয়োগ দিয়ে বিপুলরূপ—এই তার সম্প্রতি (Becoming)। অসম্প্রতি আর সম্প্রতির সহবেদনাই নৃষ্টি এবং অনুভব।

*

*

*

নৃষ্টি আর অনুভব : কিন্তু চেতনার কোন্ ভূমিতে ? একটা সাধারণ অর্থই হচ্ছে—সাক্ষ্যভেদে। কখনো একেবারে উপেক্ষণীয় নয়, কেননা তার মাঝে অনুভবের সার আছে।

প্রাকৃতভূমিতে বহন আর বড়া অবিশ্বাস্য প্রত্যক্ষ। তাকে ছাপিয়ে ওঠবার তাগিদ যদি যোগীর মাঝে প্রবল হয়, সে মাঝপথে কোথাও থামতে চাইবে না। কোনও-কিছুই সঙ্গে রাখা করতেও চাইবে না, যেহেতুক অবস্থান অনুভবের কল্পনাও তাকে লুপ্ত করবে না। যেখানে রূপ আছে, ভোগ আছে, বৈভবের এতটুকু অভাস আছে, তাইই শেষে ছাঁ করে আছে বিনাশের অতল গহ্বর। অতএব অস্তিত্বের পরিনির্ধারণই একমাত্র সত্য। সে-নির্ধারণ আত্মভাবের, জগতের, ঈশ্বরের—এককথার সব-কিছুর। চাড়তে যখন একবার আরম্ভ করেছি, তখন কিছুকেই আর বাকড়ে থাকব না। 'পেঁয়াজের পোকা চাড়তে-চাড়তে শেষ পর্যন্ত আর-কিছুই থাকে না'। কোনও কার্য নয়, ভোগ্য নয়—এমনকি মৃণাও নয়। এরাই প্রকৃতি, এরাই বহন। এরা থলে পড়লেই পুরুষ বুজ, প্রকৃতি হতে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। এবং তিনি অমৃত, কেননা শক্তি নিম্পশ বলে তার মাঝে আবৃত্তি নাই, স্রুত্যাঃ সূত্যাঃ নাই।

এই অনুভবের সঙ্গে-সঙ্গে জীবনের দীপও যদি নিবে যায়, তবে তো সব চুকেই গেল। অধ্যাসাধনার লক্ষ্য তাহলে হলে উল্কার বেগে এক মহানবনের মাঝে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। উল্কা মনতে-মনতে ছুটেছে বটে; কিন্তু অন্যতর তার লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য নিবে যাওয়া। জীবনের পরিসমাপ্তি যেমন নরণে, তেমনি চিত্তপ্রসারেরও পর্যায়সম নির্ধারণে। পৌক এবং নিবিশেষাচ্ছৈত্বাদীর দর্শনের মূল সূত্রটা এখানে একই।

কিন্তু চরম অনুভবের পর সবারই জীবন ফুরিয়ে যায় না, অনেককেই আবার এখানে ফিরে আসতে হয়। তখন জগৎকে তাঁরা কি দৃষ্টিতে দেখেন তা আগেই বলেছি। দার্শনিক পরিভাষা ব্যবহার করে বলতে পারি : তখন তাঁর নব্যে সৃষ্টির স্বৌক প্রবল, তিনি হন অজ্ঞাতি-বাদী—জগৎ তাঁর কাছে থেকেও নাই; বস্তুপূর ঘোর ধীর মাঝে থাকে, তিনি হন নাথবাদী—জগৎ তাঁর কাছে আবছা; আর যিনি আবার এখানে ভেগে ওঠেন, তিনি হন জীবনমুক্তিবাদী—কিন্তু জগতের উপহ্রষ্টা হয়েও তিনি উদাসীন, তার জীবনের ভোগ বা কর্তব্য কেবল প্রারম্ভ-করের জন্য। তিনটি অনুভবই উচ্চকোটির, কিন্তু কোনটিই অমৈত্রে পূর্ণতায় নিবিড় নয়। বুদ্ধ আর জগতের মাঝে পর আর অপর (higher & lower) সত্যের বেতন নিয়ে মন সাধনা শুরু করেছিল, তার সংস্কার এসের মাঝে এখনও অনবলুপ্তই আছে।

*

*

*

কিন্তু পূর্ণযোগের অনুভব হবে আরেক ধরনের। পূর্ণযোগী হয় জাগ্রৎএর অনুভবকেই ক্রমে নিবিড় হতে নিবিড় করে তোলেন—তাকে আর উৎক্ষেপের পথ ধরতে হয় না; অথবা ধরলেও তিনি আবার জাগ্রৎএ বন্ধন ফিরে আসেন, তখন বস্তু আর সৃষ্টির গাঢ়তাকে তাঁর মাঝে গভীরিত করেন। ফলে সকল অবস্থাতেই বস্তু তাঁর কাছে অন্য অতএব বহিঃস্তব নয়, জীব ও শক্তির আবেশে তা তাঁর অন্তরঙ্গ এবং আকর্ষিত। জাগ্রৎএর প্রাকৃতভূমিতে বস্তু শব্দ, কিন্তু তাই আবছা, শক্তি অদৃশ্যপ্রায়। যেমন একটা মানুষকে চর্যচকে খুব শব্দ

করেই আনন্ড দেখতে পাই, কিন্তু বর্ষকে তার ভাবের অভিসামান্য পরিচয় পাই, আর তার অস্বচ্ছন্দতার গভীরে শক্তি ব্যক্তাকে ত্রে নোটেই দেখি না। কারণ আর কিছুই নয়—মানুষটি বহুদূরে আমার কাছে অবস্থায়। আমি আযোগী, আত্মবোধহীন; তাই বহু আমার কাছে বহুদূর, অথবা তার মাঝে আমি কে-ভাবেই আবেগ করি তা বস্তুকল্পিত। মুশকিল এই, যোগ করতে গিয়েও বহুদূরপ্রান্তে প্রুতি অবস্থায়তাবনা সংতার আবেগের হেড়ে যায় না। ফলে, যোগে আমি আনন্ড পাই, কিন্তু জগৎকে আমার করে কিংব পাই না। উৎক্ষেপের সাধনাতেও সাধককে ভাব আর শক্তির অগতির ভিতর দিয়ে যেতে হয় ত্বরীয়ে—উপনিষদ বাদের বদলেছেন যশুস্থান আর যশুস্থিস্থান। উজিরে যাবার সময় এসের যদি আরচেন্তনোর সত্য সমুত্তি বলে শীকার না করি, তাহলে ভাটিয়ে এসে বহুদূরপ্রান্তে আমি এসের খুঁজে পাব না—বহুদূরপ্রান্তে যোগকার বহুই আমার কাছে অবস্থা হয়ে থাকবে, তবে হলে শক্তিতে নিবিড় স্বাভাব্য ও শীঘ্র হয়ে উঠবে না। অর্থাৎ সচিচলানশবন অমৃতব আমি পাব তবু বিবিধ আত্মনুভূতিতে, সে-অমৃতব গভীর হয়ে সচিচলানশবন বিশ্রামভূতিতে উপচে পড়বে না।

বলা বাহুল্য, পূর্ণযোগের লক্ষ্য ব্রহ্মসুখের এই সৈন্যকে নিগ্রাস্ত করা। বুদ্ধই জীব আর ভগ্নং হয়েছেন একথা যদি সত্য হয়, তাহলে জীবও যেমন সচিচিদানন্দ, ভগ্নংও তেমনই সচিচিদানন্দ। ভগ্নং যে সচিচিদানন্দ তা বুঝবে কে? বুঝবে আমি—প্রাকৃত জীবদের সচেতন পরিহার করে আমি যখন সচিচিদানন্দ হব। কিন্তু সে-আমি তখন আর কাঁচা আমি নয়—পাকা আমি, সবার আমি। সবার সঙ্গে আমার অভেদই তখন সত্য, তেমনটা আপাতিক (apparent)। যেমন সন্মুখের উপরে-উপরে ধীপগুলি আনন্দা হয়ে ভাসছে, কিন্তু সন্মুখের গভীরে তারা এক। আমার চেতনা সেই বিশাল গভীর সন্মুখের চেতনা। এই চেতনাই ব্রহ্ম চেতনা। 'অয়নাত্মা ব্রহ্ম'। আমার দৃষ্টি ব্রহ্মেরই দৃষ্টি। ওখ দৃষ্টি নয়, তুচ্ছ এবং পঙ্কিও। দৃষ্টিতে হল বিশেষাঙ্গীভাব প্রতীতি, আর তুচ্ছ ও পঙ্কিতে বিশ্বাস্যকর। আরেকভাবে বলতে গেলে পুরুষের দৃষ্টি বা চৈতন্য, আর প্রকৃতির পঙ্কি। দুয়ের যুগলভাবই আনন্দ। সব মিলে ব্রহ্মসুখতাব।

এই অৰণ্ড ব্ৰহ্মানুভবেই আত্মানুভবের পূর্ণতা। বিশ্বেশ্বরীয়তার আনি বেদন প্রকৃতির অতিষ্ঠা (transcendent), তেমনি বিশ্বাত্মকতার তার প্রতিষ্ঠা (essential substratum)। একা আনাকে নিয়ে বেদন আবার পূর্ণতা, তেমনি সবাইকে নিয়েও আবার পূর্ণতা। এই পূর্ণতাই অভিব্যক্তি। ব্যক্তির নিজের তপস্যা তখন শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু চলেছে বিশ্বের নিজের তপস্যা। সে-তপস্যা আর আরাণ নহ—উন্নাস, পতনের অব্যবহিতিকি বহুত্ব বিকিরণ। তাও আনন্দ। বেদন ফুল কোটানোতে আনন্দ। আবার ফোঁটা কল বেদার আনন্দ। বেদা বর্ধে—প্রকৃতি বেদানে সহস্রাব্দে বিকসিতা করল।

(अथर्वः)

বাসবদত্তা

[অনুবাদ]

ঐশ্বর্যবিশ্ব

পঞ্চম অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

অনুবাদের লেখক: মোহনলাল সান্যাল।

(১৭শ, দ্বাদশশতাব্দী, বঙ্গদেশ)

- বৎস । চমৎকার লাগান ধরেছে তুমি।
এবার আবারের মতোই পানিতে
পৌঁছানো হবে।
- বহুলিকা । কিন্তু চারদিকে তো শূন্য।
- বৎস । ভেদ করে যাব
যেমন আগে দু'বার গিয়েছি।
ওই বিকর্ণ আসছে।
(উল্লসিত হয়ে এসে বৎস)
- বিকর্ণ । বৎস, রেড তৈয়ারি সঙ্গে কথা বলতে চায়।
সন্তোষ দিচ্ছ তুমি ?
আমি তাকে এখানে আটকে রাখব,
সেই অবসরে আবার জানা এক দীর্ঘ পুরোঁষ অধ্যাপন দিয়ে
নিঃশব্দে আবার ওদের বাহ্যে অভ্যস্ত করব।
- বৎস । বাহ্যবলই শ্রেষ্ঠ বল।
- বিকর্ণ । বৎস, আবার কাছে শ্রেষ্ঠেরও বেশি কিছু।
তবে এসব দারুণ উষ্মেণ থেকে
আবারের বাসবদত্তার হৃদয়কে রেখাই দিতে চাই।

মুখে সে কিছু বলে না,
তবে কষ্ট পার ভিতরে।

বৎস। বেশ।
তোমার বিরূপত্ব পথই আমার গ্রহণ করব।

(মেয়ে চলে বেশ বিকর্ণ)

বাসবদত্তা। বৎসরাজ, আমি যদি বাঁড়িয়ে
ওলের দলপতিকে অনুসরণে বিরত হতে আদেশ দিই,
বলি যেচ্ছায় এসেছি আমি,
তাহলে নিশ্চয় সে বিরত হবে।

বৎস। প্রিমা, কিন্তু তাতে যে আমার নিজের ও গৌরব হবে যাবে,
আর ভায়া তো তোমারই।

বাসবদত্তা। কর তবে যা ইচ্ছা।
তোমার স্বপ্নাননের স্বপ্ন আমি ক্ষুণ্ণ করব না,
যদিই বা তার স্বপ্নের আমার কুলগৌরব বাড়িয়ে চলে যায়।

মহানিকা। (হাটুতে) উঃ। একটু দুখায় জন্য
যদি সচ্ছিন্ন আনোচনা চলত।
এমন মুহুর্তে চোখের পাতা বুজে আসে।
(বেজকে দিয়ে বিদ্যর্পণে প্রবেশ)

বৎস। সেনাপতি, বলুন তবে দাবি আপনার।

বেত। বৎসরাজ, চতুর্দিকে আপনি শত্রুবেষ্টিত।
আত্মসমর্পণ করবেন কি ?

বৎস। পরিহাস করছেন।
ফিরে যান ;
আপনার ডাক্তর শৃঙ্খল

শেষ বারের মতো তৃতীয়বার ছিন্তা করব।
আপনার মৃতদের সংখ্যা গুণেছেন ?

হেড । প্রথমে যে সংখ্যা ছিল
এখন জীবিতরা তার চেয়ে বেশি ;
আরো সৈন্য ধরে আসছে উজ্জয়িনী থেকে।
আপনি নিজে স্বাধীনভাবে কিরে যেতে পারেন মদেশে।

মংস । আপনার প্রস্তাব অপমানকর তা জানেন ?

হেড । রাজপুত্র, তাহলে দুর্ধশার জন্য তৈরী ঘন।
জীবন্ত এবং আট্টপুটে বাঁধা
কিন্তু মৃতদেররূপে আনরা নিরে যাব আপনাকে
আনাদের রাজধানীতে।
আপনাকে ঘিরে আনার ব্যাহের তিন বৃত্ত রচনা করেছি।
আপনার অশ্বসমূহও শ্রান্ত,
আর অর্ধনের তৃতীর বেই আপনার।
ডোক্তের আবির্ভাব আসন্ন ;
জেনে রাখুন এই আপনার শেষ।

মংস । বধ্যক্ষে আনার রাজ্যের মধ্যে
আনার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হবে।

বিকর্ষ । শিশুগিরি :
দলের সঙ্গে তার গিরে ফিলাবার
এবং ফিরে এসে উঠবার আগেই
দূরে চলে যেতে হবে আনাদের।
বহুলিকা আনার বোড়ার চড়,
বাও যৌসকরাগণের কাছে—
বল তাঁর সৈন্যবল নিরে আসতে।
কারণ, আমি দেখতে পাচ্ছি
অবতীর সবভঙ্গত্বের উপর দিগে জুড় বেগে

ছুটে আসছে সেনাপন ।
রথের পথপ্রদর্শক দ্বয় আমি ।

যজ্ঞলিকা । অশু কোথায় ?

বিকর্ণ ওই ওখানে ষোড়শের যথো ।
লাখাব ধ'র আলগা করে—
ওই এখন বুণবোজাজ ।

যজ্ঞলিকা । আনাকে আর পেঁচাতে হবে না ।
আনি চালাতে পারি না
এখন ষোড়শ এখনো জন্মায় নি ।
এই পল্লবিত গোলকধাঁসার যথো থেকে
আনার বের করার পথ কই ?

(ষোড়শের দিকে গমন)

বিকর্ণ । তুল দবার উপায় নেই—
ওপাখ আনাদের রাজ্যসীমানা পেরিয়ে যাব
ওই লোকনাথের পর্বতে ।
যাও এবার ।

যৎস । চন্দ্রিমা আর যবুর বলর
পত্রে পত্রে জ্যোতির্ঘর বর্ষর তুলেছে
আর যুদ্ধরত আবার শ্রবণে গেয়েছে নির্ধাক সংগীত ।
এখন একান্ত নীরবতার ধারায় অরা যাক জুবে,
যখন তেনাকে দিবিদ্যে যুকে নিয়ে
ষোড়শ চালিয়ে চলছে আমি ।

যশস্বিনয় । শেষ পর্বত যদি পারি জেতাকে দিবিদ্যে রাখতে ।

পঞ্চম স্কন্ধ

অবতীর নীমন্তে

(কনক, বৌদ্ধভাষ্য, অমর, দৈত্যক)

কনকঃ । উমা পাদাভের চূড়ায় চূড়ায়
পরিরে দিয়েছে গোলাপী আর রক্তগুণ্ড হুকুট ।
বংশের প্রতিশ্রুত রথে প্রত্যাবর্তনের কোনো চিন্তাই নেই ।

বৌদ্ধভাষ্যঃ । বাত্র দু'দিন হল বসন্ত এখানে এসেছে ।
তবু এক গোপন আলস্যের মতো তৈরী করে
বংশ আঘাত করেনি কিম্বা ।

কনকঃ । আমরা অবশ্য তা জানলাম অতি বিলম্বে ।
এক প্রচলন দুঃসাহস,
এক বালকের উচ্চৈশ্বর্য দুঃভিধান—
নিজের জীবন আর রাজ্য বিপন্ন করে !
বিষু দিবে গুরু হল এর রাজ্য ।

অমরঃ । দেখুন, দেখুন, অবতীর পারে এক ষোড়শোয়ার
আগছে আমাদের দিকে ।
সাননের দিকে হুকুকেছে তার অননুসৃত দৃষ্টি ।

কনকঃ । কেই হোক সে—
এসেছে বহু বুরের পথ পায় হয়ে ।
তার বাঘনটি চলেছে কটে
স্থলিত পদক্ষেপে ।

বৌদ্ধভাষ্যঃ । কোনো অশুভগোষ্ঠী বলে ও বলে বহু মা,
ভ্রমগামী এবং সন্দেহ হলেও
এ বে দেখছি দারী ।

অমরঃ । আমাদের দেখতে পেরে ও মামল ।

বৌগদ্ধায়ণ। নারী অশুরোহী।
 মনে লশেহ আগছে।
 কোনো দুর্বন্ধ কি?
 মর্মান্ত হরে আসছে কি পুংখের পুতী?
 অনুবৃত্ত হরে ছুটে আসছে যেন।

অনর্ক। ঘুবতী, সুশরী।

(ছদ্মসিদ্ধ উপস্থিত)

মহালিকা। আপনি বৎসরাজের সেনাপতি।

কনকুৎ। আনিই সে-ব্যক্তি বটে।

মহালিকা। সব সৈন্য একত্র করুন;
 বৎসরাজ রথ চালিয়ে ক্রান্ত আসছে এখানে
 তার অনুসরণে সাগরতরঙ্গের বড়ো পত্নমাহিনী।
 সবার, সবার ওই বহন
 সাহায্য নিয়ে আনুন—
 বিনয়ে তার গ্রাস্ত বাহন এবং শূন্য তুণীর
 পত্রল বাহন এবং কিপ্রত্যয় কাছে হেরে যাবে।

বৌগদ্ধায়ণ। কনকুৎ, আর দেবী নয়।

(সমস্তের প্রস্থান)

কিন্তু কে তুমি,
 কিসে নিশ্চিত জানব যে
 তুমি কোনো অবতীর্ণানী নও—
 আমাদের সৈন্যদলকে প্রলুব্ধ করে বিপাকে কেনতে চাও না?

মহালিকা। সাধবানী পক্ষবুদ্ধি বৌগদ্ধায়ণকে চিনতে কষ্ট হয় না।
 আপনার প্রস্তুত উত্তর দিচ্ছি—
 থাকিটা ভাড়াভাড়ি সযাযান করে নেবেন,
 নতুনা পরে দৈব আপনার সব সতর্কতাকে
 উপহাস করতে পারেন।

আবার নাম বহুদত্তী,
আবার পিতা ছিলেন পৌরস্বামী ;
দেখে অপছন্দ তাঁর কন্যা আমি
অবস্খাতে হয়েছি বাসবস্তার পরিচারিকা ।
চিনতে পারেন এই আঁটি ?

বৌগদ্ধরায়ণ । এ জে বৎসের ।

মহালিকা । আমি জানিয়ে এসেছি ভরুণ বিকর্ণের অশু,
তিনি তাঁর ভগ্নীর চিত্তচোরকে আপনে আছেন
ক্রুদ্ধ উদ্ধারকারীদের বিরুদ্ধে ।
বিজ্ঞতন রাষ্ট্রভরু, এ সব প্রবেশী
আপনার মনেই ভরুন করতে পারবে কি ?

বৌগদ্ধরায়ণ । অসুত তোমার কাহিনী ;
তবে তুমি অসুত সত্যগর্ভ ।

মহালিকা । আপনি সাবধানীই শুধু নন !

বৌগদ্ধরায়ণ । চন তাইলে এগিয়ে ।
কনকুতের কাহিনী ওই শুভ কবল দাতা ।

বর্ষ দৃশ্য

অবস্খীঃ আশ্রয় কেনহাঙে
(কবচ, পৌরস্বামী, অদর্শ, অসুত, সৈন্য)

কনকুত । বঁড়াও, বদ্ধ কর চলা ।
বৎসের রথ ওই আসছে ।
দেখ, তার শ্রান্ত বোঁড়াগুলি খানতে গিরে পড়ে যার বুঝি ।

বৌগদ্ধরায়ণ । পিছনে একেবারে কাছে সৈন্যদের আগ্রাস,

অবধা থেকে নিজস্ব হল অবতীর রথ ।

(৬২৯, বিকল ও হাসলতা উপহিত)

৬২৯ । পিতা, প্রতিটি জিনিস ঘটেছে ঠিক তার সবচেয়ে,
আর এই আমি নিজে এসেছি আমার সৌভাগ্য ।
গোপনভাৱে জন্ম করা পান কি ?

ষোড়শরায়ণ । আর শিষ্য বা পুত্র নও,
এখন তুমি বীর এবং রাজা ।
অবতীর নিচ-পরে পদস্থাপনা করেছে ।

৬৩০ । তবু ত আপনার পুত্র ।

ষোড়শরায়ণ । স্বাগত, বাসবদত্তা, সুপ্রসিদ্ধ কৌশাধীর রাণী ।

বাসবদত্তা । (৬৩০এ প্রতি দানব হস্তে)

দরুণ বিপদের মধ্যে দিয়ে অস্ত্র করতে হয়েছে আমার মুকুট ।

৬৩১ । সে এক বিপজ্জনক প্রতিযোগিতা
আর ভাগ্যের জয় হল শেষে
মানানো নাত্র অগ্রপঞ্চাভের জন্য ।
মুন্সহ পথ ডালের দলবলকে যদি বাধা না দিত
তাহলে কি আমরা এখানে পৌঁছাতে পারতাম ?—
এভবার আমাদের খাবতে হয়েছে পথে,
এভবার বিশ্বাস বিতে হয়েছে অশ্রুদের ।
আবার কম সৈন্য নিয়ে এগুতেও
ভাড়া সাহস পারনি ।

ষোড়শরায়ণ । এখন ভাড়া মুন্সের জন্য তৈরী হচ্ছে ।

৬৩২ । আপনি কথা বলুন ওদের সঙ্গে ।
বুঝ হতেই পারে না ।

বৌদ্ধদ্বারায়ণ । এক আলাপের জন্য চেয়ে পাঠাও ।

বৎস ।
 বুদ্ধ যদি অগত্যা করতেই হয়
 তবে করব আদরকার্ণে—
 বুদ্ধ করতে করতে পিছন ঘটে আসতে,
 অবশ্য তারা যদি বেশি দূর এগিয়ে না পড়ে
 আবাসের রাজ্যের মধ্যে ।

বিকর্ণ । ওই যে রোড ।

(বিকর্ণ একজন)

রোড । আপনাত্মা গড়ির আলাপ-প্রার্থী ?

বিকর্ণ । রোড, পরাক্রান্তদের সঙ্গে ।

রোড ।
 আপনার ভগ্নী আপনাদের সঙ্গে রয়ে ছিল বলে
 আনন্ডা যথেষ্ট তাঁর নিকেপ করতে পারি নি ।

বিকর্ণ ।
 তরোয়াল নিয়ে এত শত জনও
 দুই হালকের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলে না ।

রোড ।
 রাজকুমার বিকর্ণ, আপনি আপনার নামের বংশের বিরুদ্ধে
 যাত্রা যে কাঙ্ক্ষ করলেন
 তার মূল্যায়নে বিরত থাকুন ।
 এই আপনার প্রধান অঙ্গ-প্রয়োগ প্রচেষ্টা ।

বিকর্ণ ।
 আপনার চেয়ে কৌশলী যে
 তার বিচারে বিরত থেকে ভালোই করলেন ।

বৌদ্ধদ্বারায়ণ ।
 রোড, এখনো আপনি অনর্থক বুদ্ধ চান ?
 এতাবৎ বা হয়েছে
 তা ব্যক্তিগত সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব ;
 লড়াই যদি আপনি করবেনই

- তার অর্থ দুটি বেশকে জড়ান ;
কোন্ উদ্দেশ্যে দান হবে তাতে ?
- রেভ । বৎস এবং রাজকুমারীকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাব ।
আমার রাজ্যের এই আদেশ ।
- বৌদ্ধস্বামী । কোনো মানুষের বাধ্যবাধকতা কিন্তু নেই
অসন্তোষের জন্য চেষ্টা করবার ।
আমরা যখন বুদ্ধ করছি
সেই অবসরে বৎসরাজ বশিনী রাজকন্যাকে নিয়ে
অবাধে ঘুরে চলেছেন
দুর্ভিক্ষ প্রাচীর-বেষ্টিত তাঁর রাজধানীতে ।
- রেভ । আমার রাজ্যের আদেশ তাই ।
আমি তাঁর বাহ্যে যাত্রা
উপদেশে নই ;
নিজের বুদ্ধি খেলাবারও আমার অধিকার নেই—
তবু আছে তাঁর অপার অবাধ আদেশ
স্বতন্ত্র পালন করবার অধিকার ।
- বৌদ্ধস্বামী । যদি আদেশ আসে উজ্জয়িনী থেকে
তবে তো বদ্ধ হবে এই অনুধাবন ?
- রেভ । তবু তা চলেই ।
- বৌদ্ধস্বামী । রেভ, অশুরোধী পাঠাও, ধর্মের নাও ।
ইতিবশ্যে সব যে বেধানে আছি, থাকলাম ।
- রেভ । অশুরোধী কঠিকে পাঠাও না ;
আমি বুদ্ধ চাই ।
- বৌদ্ধস্বামী । বুদ্ধই জয়লো !

রেভ । ওতে মানস ভর করি না ।
এ বড় অযুত উদ্ভতা—
অস্ত্রহাতে অবসীর মাটিতে বাঁড়িয়ে
তারই মনিবের উপর হুকুমখারি করা ।

(প্রহরদাত্ত)

কমলত্ব । রেভ তবু বাঁড়াও একটু ।
দুত পাঠাবার প্রয়োজন নেই ।
'ওই দেব সাননে ছুটে আসছে সবেগে এক রথ—
চুড়ায় তার অবসীর স্বাক্ষপতাকা ।

রেভ । যুবরাজ গোপালক আসছে ।
কুণীই হনাব এতে ।

বাসবদত্তা । ও যদি আমার ভাই হয়
তার নামে সব ঠিক ।

কংস । যেহেতু বৃত্তিমতী লক্ষ্মী তুমি ।
তুমি পাশে থাকলে
নিয়তি আর ভাগ্য
শাস্তি আর সংগ্রাম
আমার অতি লম্বুপক্ষ চক্কা কারনারও অনুগত থাকবে ।

(গোপালদেবের প্রবেশ, সঙ্গে সখ্যা)

গোপালক । প্রহরত্ব, কংস ! আমাদের দুই রাজ্যের মধ্যে
আত্মক শাস্তি ও সম্মতি ।

কংস । ও-দুটির মূর্ত্তরূপ আমি ধরে রেখেছি এখানে ।
স্বাগত্ব তোমাকে—
বীর তুমি সস্তব করেছে জ ।

গোপালক । আমাদের আত্মরিক্ততার চিহ্ন ও প্রমাণস্বরূপ
তোমার পনায়নের এই লহরোপিবীকে

বিনা দেও গ্রহণ কর।
ভগ্নী, একে নাও তোমার বাহুবলনে।

বাসবদত্তা । অধা, নিরাপদে তুমি আসতে পেরেছ আমার কাছে !

গোপালক । আমি আমার ভগ্নীর সৈন্যলিঙ্গ যাবতীর সান্থনী
তাব সকল ধনসম্পদ
আমার অনুসরণে আসছে অন্ত ।
অবতীর তবু একটি লাবি :
আমার ভগ্নী তোমার একমাত্র স্বামী হয়ে
বসবে স্বাস্থ্যসনে—
কিছু নহে ক'রোনা, এটি স্বচক্ষে দেখে যেতে চাই আমি
আমাদের বংশোদ্ভিত প্রাণী বর্ধার সহরে ।

বৎস । কোশাখীর সাতা এতেও বাজী হতে পারে না, গোপালক—
সিন্ধুখীর আদেশ ।
আমাব ইচ্ছা আমারই শ্রেন নিশ্চয়
সদৃশ আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে
পত্নীমান অবতীর সন্তানকে নয়,
বাসবদত্তাকে ।
কেবল আমার আর তাঁর সম্মিলিত ইচ্ছা
দেশ ও দেশের কল্যাণ নির্ধারিত করবে ।
ভাই, তাই তুমি এলাখির উপরও জোর দিও না ।

গোপালক । এতকুর জন্যে যেন আমাদের বিচ্ছেদ না ঘটে ।
বর্তমানের আনন্দই যথেষ্ট ;
ভবিষ্যৎ বাসবদত্তার এবং উদয়ন, তোমার—
কেউ তোমাকে জোর করবে না ।
বালক, তোমার বিরোধে ছিল দঠকারিতা ও কঠোরতা,
তোমার বংশের এবং তোমার মহান পিতার পক্ষে অপমানকর
নির্ধাসনে তোমাকে থাকতে হবে এই পুত্র কোশাখীতে
হতদিন না ক্ষর হর তাঁর যোগ ।

বিক্রম ।

লান্না, ও আমি গ্রাস্য করি না ।
 নিজেই সঙ্কল্প পালন করেছি,
 যা উচিত ডাই করেছি ।
 বৎসের পাশে
 আর আমার ভগ্নীর গৃহে—
 এই-ই যথেষ্ট ।
 এছাড়া, নানা নূতন বেশ দেখব আমি ।

বৎস ।

পরে এস তুমি, গোপালক ;
 তোনার ভগ্নীর স্বাক্ষরীয় সাক্ষ্য
 আর বত্ন ন্যাকবন তুমি চাও সব নিয়ে ।
 আরো আগেই চলে যাই
 বত্ন নীচ দর ।
 মলক, তুমি যোড়া চানিরে এস আশ্রয়ের পাশে পাশে—
 তোনার বীণায় বাজুক শ্রবণের বন্দনা
 আর হাসবদন্তার জন্য তাঁর সোনালী জীবন ।
 শ্রিতা, ঝড় এবার পাশে—
 বিপদ শেষ ।
 রাণী আমার, এবার আমার খেলে ঘাষ
 সোনালী-সবুজ অরণ্যের মধ্য দিয়ে
 এক সুবর্ণ স্বপ্নের ভিতরে অমঙ্গল ভেসে ভেসে,
 ওপো মর্ত্যের কনকোচ্ছল লক্ষ্মী, বত্নদিন না
 আমাদের কাছে বুলে দিচ্ছ
 তোনার স্বর্ণপূরী
 জ্যোতির্বিদ্যে দূর ।

মায়ের সঙ্গে কথা

[প্রবেশঃস্বর]

(১)

প্রশ্ন : নিজের উপর প্রভু বা দখল থাকা, আর জীবনের ঘটনাগুলির উপর দখল থাকা, এ দুটি কি স্বতন্ত্র জিনিস, অথবা তা একত্রে সংযুক্ত ও পরস্পরনির্ভর ?

উত্তর : তুমি যেমন দু'টোতে নেবে তারই উপর তা নির্ভর করবে। যেমন মনে করো পুলিশ কমিশনার, ঘটনার উপর তাঁর যথেষ্ট দখল রয়েছে, কিন্তু নিজের উপর দখল নেই। (হাস্য) অথবা আরম্পল থেকেই কাজ শুরু করা উচিত, নতুবা জীবনের ক্ষেত্রে যাতে হাত নিতে যাবে তাতেই বেশী গুণগোল পাকাবে।

★

প্রশ্ন : কিন্তু সেলুন, বিবেকানন্দ রঠাং রেগে উঠতেন, নিজের মাগের উপর তাঁর কোনো দখল ছিল না, অঞ্চ অন্য সকলের উপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ও কর্তৃত্ব ছিল।

উত্তর : এ কথা আমি প্রথম শুনিছি। মাগের উপর তাঁর দখল ছিল না ? কার কাছে শুনেছ ?

★

প্রশ্ন : তাঁর জীবনীতেই লেখা আছে।

উত্তর : তিনি নিজে বলেছেন ? নিঃসন্দেহ প্রমাণ আছে ?

★

প্রশ্ন : হাঁ, সত্য কথা, রাগ হলে তিনি সংঘন হারিয়ে ফেলতেন।

উত্তর : তিনি নিজে সে কথা জানতেন ?

★

প্রশ্ন : হাঁ, ভালো রকমই জানতেন।

উত্তর : সে মাই হোক, কিন্তু আরম্পালের লোকদের উপর “কর্তৃত্ব” ছিল এ কথা বলা

ঠিক নয়। প্রভাব থাকতে পারে, কিন্তু তা যত্ন কণা। ভিতরের দিকে কর্তৃত্ব না এলে বাইরের দিকে কর্তৃত্ব আসে না, কারণ দুইই এক জিনিস।

বিবেকানন্দের একটা নিজস্ব প্রভাব ছিল, অর্থাৎ তার ফলে অন্য সকলের মধ্যে এমন কিছু শ্রমণ জাগিয়ে দিতেন যাতে তারা সংকট হয়ে যেতো ; কিন্তু তাঁর নিজের সক্রিয়তা কিছু জোড়ে থাকতো না, তাদের নিজস্বের দ্বারাই তা সম্ভব হতো, ঐরূপ শ্রমণ জাগার ফলে ; এখানে আমি “তাঁর সক্রিয়তা” বলান, কিন্তু প্রত্যেকের প্রভাবেই ঐরূপ হয় ; তাই হলো সাধারণ নিয়ম।

কর্তৃত্ব বা দখল থাকা মানে বিভিন্ন বস্তুকে শ্রমণ এসে পড়লে তাকে কি তাতে সাহায্যে হবে তা জানা ; তা করতে পারলেই তার উপর তোমার দখল এলো। আর তার পক্ষে সব চেয়ে ভালো পরীক্ষামূলক হলো তোমার নিজেরই মধ্যে। প্রথমে নিজেরই সম্পর্কে অর্জন করবে সেই কর্তৃত্ব ; তারপরে তখন অন্যের মধ্যেও অনুরূপ ক্রিয়া জাগাতে পারবে ঠিক ততখানি, যতদূর পর্যন্ত তুমি তাদের সঙ্গে একত্র হতে পারবে। কিন্তু যদি নিজের মধ্যেই তেনে কিছু করতে না পারো তাহলে অন্যের মধ্যে তা পারবে কেনন করে ? হয়তো তোমার কথা দিয়ে বা প্রভাব দিয়ে তাদের মধ্যে একটা আত্মসংযম উদ্ভূত করতে পারো, কিন্তু সরাসরি তাদের উপর কর্তৃত্ব বা দখল আসবে না।

ঐরূপ কর্তৃত্ব থাকার অর্থ, কোনো কথা না বলে বা বোঝাবার চেষ্টা না করে কেবল তোমার ব্যক্তিগত উপস্থিতির দ্বারাই কারো অন্তরে বস জিনিসের তরঙ্গের পরিবর্তে ভালো জরাজাগ্রিয়ে তোলা। একেই বনে আধিপত্যশক্তি, তার জন্য মুখে কিছু বলা বা বোঝানোর দরকার নেই। সেগুলির বহন প্রয়োজন হবে, কিছু তখন শক্তি প্রয়োগ করা হলেও জোড়ে প্রভাবের কাজই শুধু হবে, কিন্তু ভিতরের ক্রিয়ার উপর আধিপত্য আসবে না। সে আধিপত্য থাকার মানেই হবে ভিতরে বিপরীত শ্রমণ জাগানো, যার জোরে সেখানকার পূর্ব-শ্রমণ একেবারে ধ্বংস হয়ে।

একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি। তোমার সামনে দুটি মানুষ খণ্ডা করতে এবং নড়া-বারি করতেও উসাত হয়েচে। তুমি তাদের বুঝিয়ে বলবে যে তারা অন্যায় কাজ করছে। তোমার সমুদ্রভিত্তে তাক খেনে গেল। এতে তোমার প্রভাবই সেখানে কাজ করলে। কিন্তু যদি তুমি সেখানে ঝড়িয়ে নীরবে একবার তাদের দিকে চাইলেই তারা শান্ত ও স্তব্ধ হয়ে যায়, এবং শান্তির ভরসা সেখানে আপনিই জেগে ওঠে, বিনা বাকাবায়ে যদি বিরোধী শ্রমণ-জগিকে শান্তই খানিরে দিতে পারো, তবে তাই হবে আধিপত্য।

অজ্ঞানতা দূর করা সম্ভবও ঐ কথা। তোমাকে যদি অনেক কথা বলে কিছু বোঝা-বার চেষ্টা করতে হয়, তবে তা পুঙ্ক্ত জ্ঞানদান হলো না। তোমাদের কিছু বোঝাতে যদি আবার অনেক কথা বলতে হয়, তাহলে সেখানে আবার আধিপত্য খাটানো না ; আমি তোমাদের বুঝির উপর নিজের প্রভাব খাটিয়ে তোমাদের বুঝতে পারার পক্ষে কিছু সাহায্য

করান, তাতে হয়তো কিছু আনবার ইচ্ছা আনিরে তোলা হলো, কিছু পিকা সেওয়া হলো ইত্যাদি। আমি যদি বিশেষ কিছু না বলে শুধু ভেবানদের দিকে দৃষ্টি দিতেই ভিতরে বোঝের আলো অেনে দিতে না পারি, তাহলে ভেবানদের অজ্ঞানতার উপর প্রকৃত আবিপত্য বলে কিছু রইল না। এবার বুঝলে কি? (প্রশ্নকর্তা মাথা নেড়ে সন্ততি জানালে)। আচ্ছা।

তাহলে এখন বলি শোনো। ইতিহাসে যদিও লিখেছে যে বিবেকানন্দ রেগে উঠলে নিজেকে সংবত করতে পারতেন না, তাঁর বাক্যে ও ক্রিয়াতে তখন সংঘন প্রকাশ পেতো না, তথাপি কেবল সেই হিসাবেই তাঁর আশপাশের ব্যক্তিদের উপর তাঁর কোনো আধিপত্য তখনকার মতো থাকতো না। তখন তাদের মধ্যেই অনুভূত ম্পন্দন হতো এবং তাদের সেই দুর্বলতাকে তিনি ক্ষমা করতেন। তাদের তিনি যদি বলতেন, “কোনোমতেই রাগ প্রকাশ করবে না,” তাঁর সেই বলাতে কোনো ফল হতো না। এখানেও সেই চিরন্তন উপদেশের কথা এসে পড়ছে, “আমি যা বলি তাই করো, যা করি তা নয়।”

*

প্রশ্ন কিস্ত আনা,র পক্ষে সবল্যা এসে পড়ে যখন ত্রাসের মধ্যে থাকি।

উত্তর ও, তাই বনো। ছাত্রদের উপর যুহ রেগে ওঠে বুঝি?

*

প্রশ্ন তা ঠিক নয়, তবে নিজে সংবত না হলে তাদের কেনন ক’রে সংবত ও সুকথা করতে পারি।

উত্তর : তা তো পারবেই না।

*

প্রশ্ন কিস্ত আপনি যেমন বলছেন তেনন আতর্কর্ষ আনতে সারাজীবনই লেগে যাবে।

উত্তর : তবে তো মুশকিলের কথা সেখি! (হাস্য) কিস্ত তা ছাড়া আর কি উপায় করবে? মনে করো তোমার এমন এক ছাত্র ছুটলো যে অবাধ্য, অসংবত, গোয়ার; অর্থাৎ তাঁর নিজের আবেশভার মধ্যে রয়েছে বিরোধী স্বকরের ম্পন্দন, যা অতীব সত্যোমক; কিস্ত সেখানে যদি তোমার মধ্যে ওর উন্টো জিনিস না থাকে, যার মধ্যে থাকবে শান্তি, শৃঙ্খলা, সংঘ, নমনীয়তা, অটল স্থিরতা, তাহলে তোমার প্রভাব সেখানে খাটবে কেনন করে? তুমি কি কেবল বুঝেই বোঝাতে থাকবে যে তাঁর গুরুপ আচরণ করা অনায়াস হচ্ছে? তাতে সে হয়তো আরো বেশী বেঁকে পড়াবে, কিংবা তোমাকে তাড়িছল্য বিজ্ঞপ করবে। আর তুমি যদি রেগে উঠে সংঘন হারাও তাহলে সমস্তই নষ্ট করলে, ছাত্রদের উপর আধিপত্য তুমি সারাজীবনের মধ্যে হারাবে।

শিক্ষক হয়ে তাদের ধীরে ধীরে খাকার মতো ধৈর্য নেই, তাদের অবিচল সহিষ্ণুতা নেই, শুধু আত্মত্যাগ নিয়েই থাকে, তারা কখনই ভাতে সফল হতে পারে না। ভালো শিক্ষক হতে গেলে তোনাকে হতে হবে সাধুর মতো, বীরের মতো, দীতিমত যোগীর মতো।

সম্পূর্ণ নির্ণেয় মনোভাব থাকলে তবেই তুমি ছাত্রদের কাছে নির্ণেয় আচরণ প্রত্যাশা করতে পারো। নিজে যা পারো না, অন্যের কাছেও তা চাইতে পারো না, এই নিয়ম।

হুতরা: নিজের দিকে আগে চেয়ে দেখবে যে তোনার মধ্যে কি আছে আর কি খাটা উচিত, সেখানে যে পার্থক্য রয়েছে তারই অনুপাতে ত্রাসে তোনার চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে।

এই উপদেশই আমি তোমাদের দিতে পারি।

এই সুযোগে আরো একটা কথা তোমাদের কাছে বলে রাখি। এখানকার ছাত্রদের মধ্যে যারা বড়ো হয়ে উঠেছে আর কিছু শিক্ষাও পেয়েছে, তাদের মধ্যে অনেককেই ত্রাসে পড়বার ভয় সেওয়া হয়। কেউ কেউ অবশ্য জানে তার কারণ কি; কিন্তু অন্যরা ভাবে যে তাদের দিয়ে কিছু কাজ আদার করা হচ্ছে, শিক্ষকের অভাব আছে বলে আমাদের ভ্রান্তে সুবিধাই হচ্ছে। কিন্তু আমি তোমাদের কাছে এর স্বার্থ কারণটি বলে দিচ্ছি—এমন কাউকেই আমি শিক্ষকতা করতে দিই না যার সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ভাবে না জানি যে ওতে তার নিজেরই উপকার হবে; যে জিনিষ সে শেখাতে যাচ্ছে তা আগে তাকে নিজে ভালো করে শিখতে হবে, আর ওতে সে এমন আত্মসম্মতিপূর্ণ উদ্ভূতি লাভ করবে যা ঐক্যপূর্ণ সুযোগ ছাড়া কখনই বেলে না; তা হলো নিজেকে সুনিয়ন্ত্রিত করে নেবার সুযোগ, যা এমনিতে করা খুবই কঠিন।

শিক্ষকতায় যারা কৃতকার্য হয়—কেবল হাইয়ের দিক দিয়ে নয় কিন্তু স্বার্থ ভালো শিক্ষক রূপে যারা উভয়ের দ্বারা—তারা নিশ্চয়ই ভিতরে ভিতরে অগ্রসর হতে পারে নির্ভরশীল-কৃত্য অর্থনের দিকে, অহংকার বর্জন ও আত্মসম্মতির দিকে, ভাতে তারা এমন এক স্বচ্ছ দৃষ্টি পায় যাতে সহিষ্ণুতার সঙ্গে অন্যের দিকটা স্পষ্ট বুঝতে পারে।

শিক্ষকতায় এমন শিক্ষা যে পেয়েছে তার এখানে বাস করা বুঝা হয়নি। আর যারা শিক্ষকতা করতে চাইবে তাদেরও সকলকে বলি এইভাবে জিনিসটাকে দেখতে।

ভালো মন নিয়ে কোনো কাজে নাগা এবং কিছু সাহায্য দিতে পারা খুবই ভালো কথা। কিন্তু তা হলো কেবল একটি দিকের কথা, তার পান খুব বেশী নয়। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা এই যে তোনাকেই একটা কৃপার মতো সুযোগ সেওয়া হলো, যাতে নিজের কিছু শিক্ষা হতে পারে, আরম্ভ করা অভ্যাস হতে পারে, তা ছাড়া আরো কিছু যা এমন সুযোগ ছাড়া হয় না।

কয়েক বছর ধরে শিক্ষকতা করেও যদি কারো নিজের উপকার কিছু না হয়ে থাকে, তার অর্থ এই যে সমস্তটা তার পক্ষে বুঝাই গেছে, অন্ততপক্ষে অর্ধেক সমস্তটাকে নিশ্চয়ই।

প্রশ্ন : আপনি যা বনেন তা হলো শিক্ষকদের ব্যক্তিগত আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্পর্কে । কিন্তু আমি বলছি সাধারণভাবে কোন পথে চলতে হবে, আনন্দের ভুলের বাহা নিরন্তর পদিক দিয়ে ? তাই নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে এখন ঝগড়া চলছে ।

উত্তর : ঝগড়া ? আশা করি গুরুতর ব্যাপার কিছু নয় ।

প্রশ্ন : তা নয়, শুধু বুকের আলোচনা... (হাস্য)

উত্তর : আমি সাধারণ ভাবেই কিছু বলতে পারি, কিন্তু নিরন্তরের বিস্তারিত খুঁটিনাটি সম্পর্কে...আচ্ছা, তোমার নিজের সমস্যাটা কি তাই শুনি ?

প্রশ্ন : আপনি একটা সাধারণ নির্দেশই দিলেন, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করা নিয়ে বড়ভেদ রয়েছে : ঠিক কেনন সত্যের আশ্রয় চানবো ?

উত্তর : কিন্তু আগে তাহলে বলো কোন বিষয় নিয়ে জানতে চাইছ । শুধু নিরন্তর বললে কথটা পরিষ্কার হয় না । যদি পাঠ্যভালিকা নিয়ে বলতে চাও, তা হলো মণ্ড ব্যাপার, এ ভাবে তার সম্বন্ধে বলা যায় না । যদি শিক্ষণীয়তা সম্বন্ধে বলো, তবে সে হলো ব্যক্তিগত জিনিস (দুই দিক থেকেই) । সাধারণ নিয়ম একটা ছকে দেওয়া আছে, তার মধ্যে গুণগোণ নেই ; কিন্তু দৃষ্টান্ত দিয়ে বলো যা নিয়ে গুণগোণ বাধ্যছে ।

প্রশ্ন : বেশ, এই জিনিসটাই ধরুন আপনি বলেছেন, ছাত্রকে পুত্রো দ্বাবীনজা দেওয়া চাই । কেউ কেউ তার অর্থ করছে এই যে ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট ক্লাসই থাকবে না, কারণ আপনি বলেছেন ছাত্রেরা যা খুশি তাই করতে পারে, ক্লাসে যেতেও পারে বা নাও যেতে পারে, ইত্যাদি । কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় বেনে যদি ছাত্রেরা না চলে তাহলে শিক্ষার কাজ জটিল হয়ে পড়ে ; কি ভাবে ক্লাস নেওয়া হবে ?

উত্তর : তা তো অসম্ভব বটেই । কিন্তু আমি কখন এমন কথা বলেছি যে ছাত্রেরা খুশিভাবে ক্লাসে আসতেও পারে বা নাও আসতে পারে ? আবার বক্তব্য তোমরা এমন করে গুলিয়ে কেনোনা ।

আমি শুধু এই কথাই বলেছি এবং এখনও তাই বলছি যে, কোনো ছাত্রের যদি একটা কোনো বিষয়ে বিতৃষ্ণা থাকে, যেমন তার হয়তো সাহিত্য বা কাব্যের দিকে আগ্রহ আছে কিন্তু পণ্ডিত পছন্দ করে না, সে যদি আমাকে বলে, “আমি পণ্ডিত শিবতে চাইনা”, সেখানে আমি তাকে জোর করে বলব না, “তা চলবে না, পণ্ডিত তোমাকে শিবতেই হবে ।”

কিন্তু যে ছাত্র কোনো ক্রাসে পড়তে ইচ্ছুক হবে, তাকে সেখানে নিয়মিত ভাসে হাজিরা নিতেই হবে, এবং ক্রাসে বলে কিছু আচরণ করতে হবে, নতুবা সে খুলে আসার উপযুক্ত নয়। ক্রাসের সময় ইচ্ছানুসারে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া, কিংবা ইচ্ছানুসৃত একদিন ক্রাসে আসা ও পরের দিন না আসা, এ সব ভিনিসকে আমি কখনই সম্বন্ধন করব না, কিছুতেই না। কারণ ছাত্র যদি নিজস্ব প্রাথমিক নিয়মগুলো না মানবে তাহলে আদর্শসম্মত সে কখনই শিখবে না, চিরদিন খেয়াল ও খেচছাড়ার দাস হয়ে থাকবে।

কেউ যদি জানের কোনো বিশেষ বিভাগে শিক্ষা নিতে না চায়, ভালো কথা, কেউ তাই নিয়ে জোর করতে যাবে না। কিন্তু একটা কোন বিষয়ে তাকে শিক্ষা নিতেই হবে, তাই নিয়ে তাকে নিয়মিত পছন্ডিতে অকপট নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করে যেতে হবে। সেখানে কোনো খেয়াল বা খেচছাড়ার চলবে না, তার আমি কখনই অনুমোদন করি না এবং করব না। তেমন অনুমতি আমি কিছুতেই দিতে পারি না, কারণ তাহলে কেউই মনুষ্যসঙ্গবাসী থাকবে না, পশুদের সমান হয়ে পড়াবে। এ প্রশ্নের এট হুঁহুতাশ নিশ্চিত, এতে বডভেদ কিছু নেই।

তাহলে আর কোনো সমস্যা রইল? (হাস্য)

*

প্রশ্ন : এখন থাক, অন্য বারে তাই নিয়ে আলোচনা হবে। (হাস্য)

উত্তর : বেশ কথা, তাহলে অন্য সময় বোলো। আপাতত এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হোক।

(২)

প্রশ্ন : (হারের "চিন্তাবলী, সূত্রাবলী ও হেয়ালি" "Thoughts, Aphorisms and Paradoxes" থেকে) "শ্রেষ্ঠ বন্ধু সেই জন যে আমাদের ভালো দিকটাকে ভালো-বাসবে, অর্থাৎ চাইবে না যে আমরা যেমনটি আছি তা ছাড়া অন্যরকম কিছু হই।" একবার অর্থ একটু ভালো করে বুঝিয়ে বলবেন?

উত্তর : আমি দেখছি যে ওহা কথাই জেননা তনতে চাইছ, কিন্তু...

ঐ অনুচ্ছেদটি যখন লিখি তখন আমি মনে করছিলাম একটা কথা যা প্রায়ই লোকে ভুলে যায়। আমরা আমাদের আত্মীয় বন্ধুদের প্রায়ই বলে থাকি, তারা যেন মানুষ হয়েছে জর বসলে আমরা যেমনই চাই তেমনই যেন জায়া হয়; অর্থাৎ আমরা একটা আদর্শ ঠিক করে নিই, আর সকলের উপর তাই চাপাতে বাই। এখানে আমরা মনে পড়ছে টনটনের

পুত্রের কথা, ভাপানে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হয়। ভগবতের সবই মানুষের মধ্যে একটা সর্বজনীন একতা এনে ফেলার উদ্দেশ্য নিয়ে সে পৃথিবী পৰ্যটন করতেন। উদ্দেশ্য তার খুবই সহজ, কিন্তু তার পদ্ধতিটা কোনো কাঙ্ক্ষের নয়। সে পরম শান্তিচর্চের সঙ্গে প্রচার করতো যে সব মানুষ যদি এক ভাষাতে কথা বলে, এক রকমের পোষাক করে, একই রকম খাবার খায়, আর এক ভাবে চলে, তাহলে সকলের মধ্যে একতা আপনা দইতেই আসবে। কেমন করে তার এ পরিকল্পনা? সার্থক হবে, একথা ভিজ়াল্য করলে সে বলতো, বেশে বেশে বুঝে সে এক নতুন রকম বিশ্বভাষা আর পোষাক আর সমান আচরণের প্রস্তাব করবে। এই ইচ্ছা নিয়েই সে ভগৎ বুঝতে বেরিয়েছে।

এই ভাবেই প্রত্যেকেই রয়েছে তার আপন আপন ধারণার এলাকাতে। প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব আদর্শ তৈরি থাকে, কেমন হলে স্বার্থ সত্য, স্নেহ, বৃহৎ ও দীবা হবে সে সম্বন্ধে একটা নিজস্ব ধারণা গড়া থাকে, আর সেই ধারণাকে সে সকলের উপর চাপাতে যায়। এমন লোকও আছে—নিত্য স্বপ্নসংখ্যক নয়—যারা ভগবান সম্বন্ধে তাদের ধারণাকে ভগবানেরই হাড়ে চাপায়। জীবনের শেষ পর্যন্ত তারা এতে বিরত হয় না।

এমনি ভিনিস লক্ষ্য করেই স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রায় অচেতনে আমি ঐ কথাগুলি নিবেদিত। কোনো সম্ভব নেই যে আমি যদি কাউকে শুষ্ট করে বলি যে, “এই রকম হওয়াই তুমি চাইছ”, তৎক্ষণাৎ সে চটে উঠে খুব জোরের সঙ্গে বলবে, “কখনই তা নয়।” অথচ যেভাবে যে অন্য কারো সম্বন্ধে স্বপ্ন জোনার সমালোচনা করো, আর বিশেষ করে তাদের আচরণের উপর কটাক্ষপাত করো, তখন বাস্তবিক এই হয় যে জোনার মনের মধ্যে সে হয়নি বলেই তুমি তার নিশা করছ। যদি এই একটি কথা সর্বদা মনে রাখো যে ভগবতের মধ্যে কোনো দৃষ্টি ভিনিস এক রকমের হওয়া ঠিক নয়, কারণ তাহলে ওর একটি ছাড়া অপরটি কোনো কাজেই লাগবে না,—তার কারণ এ বিশ্ব এমনি ভাবেই গড়া যে অসংখ্য বৈচিত্র্যকে নিয়েই এর সঙ্গতি, তাই এখানে দৃষ্টি চেতনা ও তার কর্মধারা এক রকমের হবে না,—যদি এই মূল সূত্রটি ভুলে না যাও, তাহলে কেমন করে তুমি চাইতে পারো যে জোনার ধারণা ও জোনার আদর্শ অন্য কেউ গ্রহণ করবে! এখানে প্রত্যেকেই হবে তার নিজের মধ্যে, জোনার সত্যকে না বেনে সে তার নিজের সত্যকেই অনুসরণ করবে, জোনার ধারণা বা আদর্শ অন্যের পক্ষে ষাটবে না।

জোনারের শেখা দরকার বিশেষ বাস্তবীয় স্বাভাব্য ও বৈচিত্র্যকে বেনে নিয়ে তার মধ্যে একটা সম্ভতি ও সামঞ্জস্য আবিষ্কার করতে, ও প্রত্যেক ভিনিসকে তার যথাযোগ্য স্থান দিতে। সে সম্ভতি সকল ভিনিসকে একরকম ক’রে নিয়ে নয়, বিশ্ব-ব্যবস্থার মধ্যে সব কিছুই আপন আপন স্থানকে বজায় রেখে।

প্রকৃত বহুর কাছ থেকেও মূলতঃ এই রকম আশা করবে; সে চাইবে না সে তুমি তার মধ্যে হও, স্বয়ং সে চাইবে যে তুমি বেনন আছো ঠিক জেননি থাকো।

সেই কথাই আমি লিখেছিলাম, "শ্রেষ্ঠ বন্ধু সেই জন যে আমার ভালো মিকটাকে ভালোবাসবে।" সোচা কথায় অন্য ভাবে বলতে গেলে : যে তোমাকে তোমার সর্বস্বিন্দ্র করে নিয়ে যেতে চায়, সে তোমাকে দিয়ে বন্স কাছ ওলো করাতে চায় বা মনের দিকে উৎসাহ দেয় বা বন্স কাজের সমর্থন করে, সে তোমার প্রকৃত বন্ধু নয়। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে তেমন নোকের সঙ্গেই তুমি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ভাবাও যার সাননে অত্যন্ত নীচে নেমে গিয়েও তুমি অস্বস্তি বোধ করো না। তেমন ছেনেদের সঙ্গেই নিশতে চাও যারা মুলে না গিয়ে বাইরে ঘোরে, বাগান থেকে ফল চুরি করে, শিকরদের বিভ্রম করে, আর হত কিছু অকাজ নিয়ে থাকে। সেখানে বলবো, "ওরা প্রকৃত বন্ধু নয়।" কিন্তু তবু পছন্দ করো তোমরা তাদেরই, যেহেতু তারা কখনই বলবে না যে তোমার কোনো অন্যায় হচ্ছে। কিন্তু তার বললে যদি এমন কোনো বন্ধু এসে বলে, "বিনা কাজে কিংবা অকাজে বাইরে ঘুরছে কেন, তার চেয়ে ক্রাসে যাওয়া কি ভালো হবে না?" অবনি তাকে বলবে, "বিরক্ত কোরো না, তুমি আমার বন্ধু নও।"

এখানে এমন মেধাবী ছাত্রছাত্রী আছে যারা প্রথমে ক্রাসের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেক-যোগ্য ছিল, যারা তাদের কাজে খুব মনোযোগ দিত, তাদের মধ্যে আমার অনেক আশা ছিল; কিন্তু ঐ ধরনের বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে তারা নষ্ট হয়ে গেল। এখন আমি পোনাগুলি বলছি যে তাদের জন্য আমি খুব দুঃখিত। অবন বন্ধুদের আমি বন্ধু বলি না পরু বলি, সংক্রামক রোগের মত তাদের থেকে তক্ষতে থাকতে বলি। যাদের কোনো হোঁচলে বোণ আছে তাদের থেকে নিশ্চয়ই তক্ষতে থাকো। তাদের স্বস্ত্র করে রাখা হয় যাতে রোগটি চাক্রিক না ছড়ায়। কিন্তু ধানাপ ও অন্যায় আচরণের যে হোঁচল, অশস্তার ও অধঃপতনের যে হোঁচল, তা রোগের হোঁচলের অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যাধক, খুবই সাবধানে তাকে বাঁচিয়ে চলতে হবে। আর তাকেই বলবে শ্রেষ্ঠ বন্ধু যে তোমার বন্স কাজে যোগ দিতে চাইবে না, যে তোমাকে বলবে ধানাপ প্রলোভনকে ত্যাগ করতে। সেট হবে ঠিক বন্ধু।

তেমন বন্ধুর সঙ্গে অকথায় মিলবে। কিন্তু যারা মনের দিকে ঝোককে প্ররোচনা দিয়ে বাড়িয়ে দেয়, তোমার বন্স কাজে সাহায্য করে, তাদের সঙ্গে কখনো মিলবে না।

বস্ত্রত তাদেরই নেমে আপন বন্ধু করে যারা তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী, যাদের সংশ্লষ তোমাকে উন্নত করে, যারা তোমার উন্নতির পক্ষে সাহায্য করে, যারা তোমার দুটি খুলে দিতে পারে।

অবশেষে বলি, সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ বন্ধু কে হতে পারে, সে কি স্বয়ং ভগবান নয়? যার কাছে তুমি সকল কথাই খুলে বলতে পারো, সব কিছুই উন্মুক্ত করে দেখাতে পারো, যার দয়ার কোন সীমা পরিসীমা নেই, যার শক্তিতে সকল বন্ধন মোটেই মুছে যায় যদি আমার ভা করতে চাওয়া না হয়, যার দ্বারা তোমার সমস্ত উপলব্ধির পথ খুলে যায়; তিনি সেই ভগবান বন্ধু, যিনি সব যোজেন, সব কিছু রোগ সাধিয়ে দেন, যিনি এমন রাজ্য দেখিয়ে দেন যাতে

কোনো ইতস্তত করিতে না হয়, কোথাও পড়ে যেতে না হয়, যিনি তোমাকে পবন নক্সার দিকে সোজা এগিয়ে নিয়ে যান। তিনিই হলেন সব চেয়ে সত্যিকার বহু, সূর্যের দিনে ও বুধের দিনে সমানভাবে অধিগত বহু। ঐকান্তিকতার সঙ্গে যখনই তাকে ডাকতে পারবে তখনই তিনি এসে দাঁড়াবেন, ঠিক পথটি ধরিয়ে দেবেন, সকল দিক থেকে রক্ষা করবেন ও স্বার্থভাবে তোমাকে ভালোবাসবেন।

(৩)

প্রশ্ন : (শ্রীশ্বরবিশ্বের “চিন্তাকথা ও দৃষ্টিনিন্দ,” “Thoughts and Glimpses” হতে) “মানুষ প্রথমে অন্ধভাবে হাউজাতে থাকে, তখন সে জানেও না যে আপন দিব্যসত্তাকে সে হুঁতুচ্ছে”।

কী জিনিস হুঁতুছি তা না জানলে কেমন করে ধোঁজা হতে পারে ?

উত্তর : এমন অনেক কিছুই থাকে যার বিষয়ে কিছু না জেনেই তুমি ভাবো, কিংবা অজ্ঞানাকে অনুভব করতে কিংবা কামনা করতে থাকো। তোমার নিজের মধ্যে কি তুমি সম্পূর্ণ চেতন, তোমার মধ্যে কখন কি হচ্ছে তা কি জানতে পারো ? নিশ্চয়ই না। হঠাৎ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, “এই হুঁতুতে কি ভাবছো ?” শতকরা নিরানব্বই জনে তুমি বলবে, “জানিনা”। তেমনি হঠাৎ একসময় যদি জিজ্ঞাসা করি, “কোন জিনিস তুমি চাও ?” তাতেও বলবে, “তা জানি না”। যদি বলি, “এখন কি অনুভব করছ ?” তাতেও বলবে, “জানি না”। এমন প্রশ্নের সমুদ্রের তাই সত্তা সত্তা দিতে পারে যারা নিজে আপন ভিতরের দিকে চেয়ে পর্যবেক্ষণ করতে অভ্যস্ত, ভিতরে কখন কি হচ্ছে সে সব জানার যারা প্রয়োজন বোধ করে। জীবনের কোনো কোনো বিশেষ অবস্থায় যখন নিজের ভিতরকার চিন্তা ও অনুভবের দিকে নজর দায়, তখনই বলতে পারো, “এখন আমি এই কথা ভাবছি, এই চাইছি, এই বোধ করছি।” কিন্তু এমন আত্মানুভব আসতে পারে জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষণে, সব সময়ে নয়।

বস্তুত আমি কী, কেন এসেছি এখানে, আমার অস্তিত্বের কারণ কি, এই সেরবারপের হেতু কি, এ সকল প্রশ্ন নিয়ে অবিকাশে মানুষই আমোঁ রাখা যাবায় না। বাক্য বাক্য করেকখন হাতের এই বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করে। আর যারা এই সকল প্রশ্নের জবাব খুঁজতে চেষ্টা করে তাদের সংখ্যা আরো কম, কারণ জ্ঞাতার সম্ভাবনা না পেলে সে উত্তর জানা সহজ কথা নয়।

মনে করো শ্রীশ্বরবিশ্বের লেখা কোনো কিছু আমোঁ জানার হাতে পড়েনি, কিংবা এই সাধনাতেই যারা জীবন উৎসর্গ করেছে তেমন কোনো মানুষ বা দার্শনিকের লেখাও কিছু তুমি পড়েনি ; লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের হস্তে তুমিও একজন, সাধারণভাবে কিছু বোঝ-

সেবীদের কথা যা ধর্মগুলির পরিচয় ছাড়া আর কিছুই তুমি পোনোনি (তাও সকলের পক্ষে হয় না) । হয়তো তুমি নিত্যন্ত মানুষীভাবে একটা ধর্ম বেনে থাকো কিন্তু শ্রদ্ধা থুই কব, আর সেই ধর্মের শিকাত্তেও লগতে তোমার অস্তিত্বের সঠিক কারণ নয়ছে কোনো কথাই বলে না,—অন্তঃর এ বিষয় নিয়ে কিছু যে ভাষা দরকার তাও তুমি ভেবে দেখবে না । দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে থাকবে ঘটনাস্রোতের ভিত্তর দিয়ে । বয়সটা বখন বন থাকবে তখন ভাববে কেন্দ্র খোদাখানার কথা, আর বাবার কথা, আর একটু বয়স বাড়লে মেখাপড়ার কথা ; অন্তঃপর ভাবতে থাকবে জীবনের উপস্থিত ঘটনাগুলি নিয়ে । কিন্তু এই ব্রহ্মা নিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করা, “কেন আমি আছি এখানে ?” ক’জন তা করে থাকে ? নিত্যন্ত কোনো বিশেষ পড়লে তখন হয়তো কথাটা একবার মনে জাগে ; বখন দেখতে পাও যে কোনো শ্রিয়বাক্তি ঘটায় মাসা পেল, কিংবা নিজে বখন বুঝ যন্ত্রণা পেতে থাকবে কিংবা দারুণ দুঃখপাকে পড়বে, তখন (বুদ্ধিমান যদি হও) হয়তো একবার মিরে চেয়ে ধবলে, “এত দুঃখভোগ করে কেন বেঁচে থাকো ? এর কি দরকার, কি উদ্দেশ্য ? ঐ মুহূর্তটিতেই তোমরা এমন প্রশ্ন করো, তার সত্য বলে বোঝো । হয়তো তার অনেক কাল পরে বখন জ্ঞান হয় যে তোমার মধ্যে একটা পিবাস্তা রয়েছে, তখন তার সন্থে ভালো করে কিছু জানতে চাও, কিন্তু তা অনেক পনের কথা । অথচ যে মুহূর্তে তুমি সেবজন নিয়েছিলে, তখন থেকেই তোমার ভিত্তরকার চৈত্যপুরুষ আনিকাপের জন্য তোমার সমগ্র মস্তাকে প্রোৎসাহিত করেছে । কিন্তু কে যা তাই জানে ? কে না চেনে আপন চৈতাকে ? নিত্যন্ত কষ্টের অবগতে পড়লেই তখন তার বোঝ হয় । মতুবা তার কথা কিছু না ভেবেই তোমরা দিন যাপন করতে থাকো । ওদিকে তোমাদের সমস্ত গভীরে থেকে সেই চৈত্যপুরুষের অনবরত চেষ্টা তোমাদের চেতনাকে আগিয়ে তুলে পুনর্বিদন ঘটাতো । কিন্তু কাতো সেদিকে লক্ষ্য নেই ।

বখন তোমার বশ বচর বয়স ছিল, তখন কতটুকু এর জানতে ? কিছুই না ? অথচ তখনও তোমার চৈত্যান্তা চেষ্টা করেছে নিজেকে প্রকাশের স্রোথ দিতে । হয়তো সেই কারণেই তোমাকে এখানে এসে পড়তে হলো । এই ভাবে কত কিছু ঘটে বার কারণ নিজে জানো না ; “হবার ছিল বলেই হলো,” এই পর্যন্ত বলে থেমে যাও ।

জানতে ইচ্ছা হয় যে এই প্রশ্ন উপস্থাপনের আগে তোমাদের মধ্যে ক’জন জানতে চেয়েছে যে কিতাপে তাতা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে । অধিকাংশ কেত্রেই তোমরা বলবে, “আমাদের বাপনায়েরা এসেছে তাই আবারও এসেছি” । বলা বাহুল্য কেউ এখানে জন্মগ্রহণ করে নি, তবু এখানে এমন বাস করছে । কেন এমন হলো তাই নিয়ে ভেবে দেখনি । এমনই কি তা হয়ে গেছে ? বনে এমন প্রশ্ন উঠলে নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্য একটা বাহ্য বক্তবের জবাব তৈরি করে বলবে, “এটা আমার নিয়তি, জন্মেছি যে কারণে, এখানে এসেছিও সেই কারণে” বক্তবানি দুয়িরে জবাবটা তৈরি করেন ।

প্রত্যেকেই সকল প্রশ্নের এমনি বেবন তেমন একটা বাহ্য জবাব রচনা করে (বার

কোনো ব্লাইট নেই)। কিন্তু প্রকৃত গভীর কারণ কিছু অবশ্যই থাকে, হাব খবর কেউ রাখে না। তোমাদের মধ্যে কে জানতে চাও যে কেন এখানে যাচ্ছে? কার কার মনে এমন প্রশ্ন জেগেছে, “আমার এখানে এসে থাকার সত্যিকার কারণ কী?”

(একজনকে) তুমি বলো, এ প্রশ্ন করবো কি তোমার মনে জেগেছিল?

সে বললে: “আমার ভা মনে পড়ছে না।”

(অন্যদের) আরজা তুমি বলো? তুমি?...

যাহা অনেক চারপাশ থেকে তার পরে এখানে এসেছে, যাহা কোনো জানিত কারণে এখানে এসে থাকার সংকল্প নিয়েই এসেছে, তারাই বলবে, “আমি যত্ন করবো এসেছি,”—কিন্তু ভাও চলে একটা আনন্দিক কৈফিয়ৎ। সব চেয়ে সত্য ও নিগূহিত কারণটি তবুও ভায়া বলতে পারবে না, অর্থাৎ এখানে যে বিশেষ কাছটি কথা তোমাদের প্রত্যেকের পক্ষে উদ্ভিষ্ট। সে কথা জানবার জন্য চেতনার অনেকগুলি দূর অভিযান করা প্রকার।

বস্তুত স্বপ্ন তুমি আপন আত্মা সম্বন্ধে সচেতন হবে, স্বপ্ন আপন চৈতন্যের সঙ্গে একত্র হতে পারবে, তখনই জানবে যে তোমার ব্যক্তিসত্তা কত যুগের কত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে এসে উবে এখানে পৌঁছেছে। তখনই সে কথা জানবে, তার আগে নয়।

তখনই যুদ্ধের এর ত্র্যম্পর্ক, যাতে জীবনের আবুল অবশ্যতর ঘনির্মে দেয়।

তুমি আসাচ্ছে কিছু যুদ্ধে, অম্পষ্ট একটা ধারণা করে নিয়ে, কোনো পদ্ধতি বা তার আকর্ষণকে অনুভব করলে, এক দিকে জীবনের চান সেখা সেই দিকে ধুঁকে পড়লে (যদিও সৌম্য অনির্দেশা ও অম্পষ্ট), এমন অবস্থার পাকা,—কার একটা তম্পষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া, নির্দিষ্ট প্রকল্পের কিছু অনুভূতি পাওয়া, তোমার জীবনের কি উদ্দেশ্য ত্র্যম্পষ্ট করে জানা, —এই দৃষ্টান্তের ভিত্তির মধ্যে বিস্তার পার্থক্য। এই অবস্থাটি এনে কেবল তখনই তুমি তোমার নিয়তির সূত্র অনুবণ করে জানবে যে তোমার লক্ষ্য কোথায় আর কি ভাবে সেখানে পৌঁছবে। কিন্তু তার জন্য উপযুক্ত কর্তব্যের আভ্যন্তরীণ উন্নীতনের প্রকার, ঠিক যেমন ভাবে নতুন নতুন দিগন্তের পানে হঠাৎ এক একটা দূরার খুলে যায়; আসলে তখন সত্য ও দ্বারী চেতনার এক এক নবজন্ম হতে থাকে।

কিন্তু সে অবস্থা না আসা পর্যন্ত তোমাকে অজ্ঞতার মধ্যে হাড়কাতেই হবে। সবরে সবরে নিয়তি তোমাকে এমন চপে ধরবে যে মনে হবে অতঃপর এই ভাবেই বুঝি চলবে, এতে আর কিছু করার নেই। জীবনের অনেক গুরুতর তোমাকে বইতে হচ্ছে, যাড়ের বোঝার প্রবল চাপে মাটিতে হামাগুড়ি দিতে হচ্ছে, মাথা তুলে তোমার একটানা অগ্রগতির কোনো যোগসূত্র দেখতে বা অনুভব করতে পারছ না, এই বুঝি স্বাভাবিক।

একে স্বাভাবিক ছেনেও এই অর্ধচেতনার অবস্থাকে কাটিয়ে যেতে হবে—একে স্বাভাবিক মনে করো বনেই গর থেকে সরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধেতে পারোনা যে একপ্র অবস্থা কতখানি অসহ্য ও অনির্দিষ্ট। তথাপি ভা না ছেনেও যদি অজ্ঞতাবেই অজাবনার একটা

কিছুর বোঝে নেগে যাও, অমন জিহেব সঙ্গে যদি সচেতন ও সনির্ভরভাবে অসামান্য অনুসরণ করতে থাকো, তাহলে তা আপাতত অসামান্য ও অস্বাভাবিক মনে হতে পারে, কিন্তু তাই হবে প্রকৃত জীবন যাপন।

(৪)

প্রশ্ন : (শ্রীঅরবিন্দের “চিন্তাকথা ও দৃষ্টিনিবেশ” “Thoughts and Glimpses” থেকে) “এখন আমি যা করতে অক্ষম তার থেকেই আমি যে পরে আমি কিসে সক্ষম হবো। অসম্ভব হতেই সম্ভবের সূত্রপাত। এই অনিত্য বিপুল ছিল অবিশ্রাম্য ও অসম্ভব, তাই শান্ত হুটা আপন সম্মুখে হঠাৎ যাত্রা একে সম্ভব করলেন।”

এ কথাগুলির প্রকৃত অর্থ কি হলো ?

উত্তর : কথাগুলি নিত্যের গোলমালে ঠেকছে বুঝি !

এক অর্থবিরোধী ধারণা মতো মনে হচ্ছে কেন জানো ? শুধু এই কারণে যে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর চিন্তাধারার মাঝখানে সূত্রগুলিকে ধরিয়ে দেননি, যাতে তুমি এক নির্ভর থেকে অন্য নির্ভরে ধাপে ধাপে অগ্রসরে এগিয়ে যেতে পারো। এ-ছাড়া আর কিছু নয়, ওটা সোজা কথাই।

আমি এখানে একটা সম্ভব সমস্যা করি : কোনো জিনিষকে অসম্ভব বলে কখন বোঝ চলে ? যখন নিজে তুমি তা করে দেখতে যাও। যে জিনিষটা নিজে ক’রে দেখতে চেষ্টা না করলে কখনই তাকে অসম্ভব বলে তোমার ঠেকতো না।

আর কখন তুমি তেমন চেষ্টা করতে যাও ? যখন সে জিনিষ তোমার চেতনার মধ্যে এসেছে, তখনই তুমি ক’রে দেখতে যাও যে তা সম্ভব কিনা। কিন্তু যখনই তোমার চেতনার মধ্যে তার স্থান হয়েছে, তখনই জানবে যে আজ তা সম্ভব না হলেও কোনো একদিন তা সম্ভব হবে। তোমার চেতনার মধ্যে যা নেই তাই কখনো সম্ভব হবে না। এই হলো কথা, এ ছাড়া ওর মধ্যে আর কোনো জটিলতা নেই।

কথার এই ভাবে না বলে শ্রীঅরবিন্দ এমন ভাবে তা বলেছেন যাতে তোমার চিন্তা-শক্তিকে ধাক্কা দিচ্ছে উৎসাহ দেওয়া হয়। ধারণা মতো উল্লিখ করাই তাই, তাতে কৌতুহল উত্তেজিত করে তোমাকে নিবিষ্ট ভাবে চিন্তা করে দেখতে বাধ্য করার।

প্রশ্ন : তাহলে “অসম্ভব” বলতে কি বোঝাবে ? *

উত্তর : যা তোমার চেতনার বাইরে তা ছাড়া অসম্ভব বলে বসতে কিছু নেই। কিন্তু তোমার চেতনা ক্রমশ যখন যখন বাড়তে থাকবে সেই অনুপাতে আশ্চর্য্য যা তোমার

চেতনাতে নেই কান তা এসে পড়বে, কারণ চেতনা বিভা বাড়তেই থাকে,—সুতরাং শিশুত কালের মধ্যে অসম্ভব বলে কিছু থাকতেই পারে না ।

একদা তোমাদের বলা হয়েছে যে—আপাতত অর্থাৎ এই বর্তমান অবস্থায় বর্তমান নৃহর্তে অসম্ভব বলতে অনেক কিছুই রয়েছে । কিন্তু সে হলো ভোনার দৃষ্টিতে, শিশুদের দৃষ্টিতে নিবন্ধি কালের মধ্যে অসম্ভব কিছুই নয় । সবতই সম্ভব হবে । যা কিছু এখন ধারণা পর্যন্ত করা যায় না তাই শুধু নয়, কিন্তু যা সকল ধারণার অতীত তাও সম্ভব হবে, আর শুধু সম্ভবই নয়, বাস্তবেও ঘটবে । যাকে আমরা বলি শিশুত, অনন্ত, পরাংপর—তাকে আমরা যে নানই দিই কিন্তু প্রকৃতই তা অগীত ও পরবের পরম—তার মধ্যে সব কিছুই আছে বিবৃত হয়ে, যা হয়ে গেছে আর সবতই আছে অনন্ত ও শিশুত ভাবে ; সুতরাং অসম্ভব কিছু হতেই পারে না । শুধু পার্থিব চেতনার কাছে সবতই একত্রে সম্ভব হয় না ; স্থান কালের দিগার অনুযায়ী একে একে সম্ভব হয় ।

কিন্তু যা সাত্ত পর্যন্ত অভিযুক্ত হয়েছে তার অভিরিক্ত সব কিছুই রয়েছে সম্ভাব্য বিভব হয়ে যথাক্রমে ও শিশুত ভাবে ; সেই সর্ববরের যা অভিযুক্ত হয়নি তা যাকে ধারণাতীত, যখন অভিযুক্ত হয় তখন আসে ধারণার মধ্যে ।

এই কথাটী শ্রীশ্বরবিশ্ব বলেছেন : “এই অনিত্য বিশ্ব অর্থাৎ যে বিশ্ব একই স্থান কাল নিয়ে একইভাবে থাকে না, স্থান কালের অনুপূর্বক্রমে যা নিত্য উন্মোচিত হচ্ছে) পূর্বে অবিশ্রাস্য ও অসম্ভব ছিল বলেই শিশুত তাঁর আপন সঙ্গে হতে এর সৃষ্টি করলেন ।” বস্তুত যে বিশ্ব অভিযুক্তির বাইরে ছিল তা অবিশ্রাস্য ও অসম্ভব হবেই, কারণ তা অপার্থিব । পার্থিব চেতনার কাছে যা অপার্থিব তা অভাবনীয় ও ধারণাতীত ।

স্থান কালের মধ্যে যা নেই এমন কিছুর কথা আমরা ভাবতেই পারি না, যেহেতু আমরা নিজেরা আছি স্থান কালের মধ্যে । আমরা আত্মসে বুঝতে চেষ্টা করি এমন কিছুর সম্বন্ধে যা অযুক্ত ও শিশুতরূপে কালাতীত । তার জন্য আমরা মানসিক পক্ষ ব্যবহার করে বুঝতে ও নোঙরে চেষ্টা করি, কিন্তু নিজেরা স্থান কালের বাইরে যেতে না পারলে তার কিছুই প্রকৃত দ্রষ্টব্যমান কনি না । কিন্তু এই জিনিসই যদি বুঝিয়ে দেনি তে দেখবে, স্থান কালের অতীতে যে রয়েছে তার কাছে এই স্থান কালই চলে ধীরে নজো অবিশ্রাস্য, তার কাছে এর অস্তিত্বই নেই । আস তার পাকা অসম্ভব বলেই শিশুত তাঁর আপন সঙ্গে হতে একে নিসৃত করলেন, অর্থাৎ এই পদাতিরকে আনলেন অভিযুক্ত মধ্যে—তাঁর এক লীলা রূপে,—সেখতে যে তু কেমন হয় ! কারণ স্থান কালের মধ্যে এসে যুগ; সমুদ্র তা হলে এ লীলা কেমন তা জানা যাবে না !

এখন এই আনোচনার গোড়ার দিকে ফিরে যাওয়া যাক ; আমরা বলেছি যে কোন্টী “অসম্ভব” তা জানতে চলে আপে তাই নিয়ে চেষ্টা করে দেখতে হয় । এটা খুবই ব্যবহারিক ও স্থল কথা,—কারণ মনে করো যে আমি এখন যা বলছি তা বুঝতে পারা ভোনার পক্ষে

অসম্ভব হচ্ছে ; তার নানৈই হবে যে তুমি কথাগুলো বুঝতে চেষ্টা করবে ; আর চেষ্টা করার নানৈই হবে তাকে তুমি আপন চেতনার মধ্যে নিয়ে নিয়ে ; যা নিলে মোক্ষনার চেষ্টা করতেই পারবে না—যেমন এখন আমি রয়েছি তোমার চেতনার মধ্যে, আর শ্রীমদবিশ্বের ঐ কথা-গুলিও রয়েছে তোমার চেতনার মধ্যে, নতুবা তোমার সঙ্গে তার কোনো সংশ্পর্কই ঘটবে না । কেবল এখন তা বুঝতে পারা তোমার পক্ষে অসম্ভব হচ্ছে, কারণ তখন উপযোগী কোষগুলি তোমার নষ্টিকে এখন নেই,—তা ছাড়া আর কিছু নয় । এ হলো পূর্ব সোজা কথা । বনোযোগ দিয়ে ভিতরে একাগ্রতা আনতে চেষ্টা করতে হবে, তার ফলে কোষগুলি স্বয়ং প্রস্তুত হয়ে উঠবে, হয়তো করেক ঘণ্টা বা করেক দিন বা করেক মাস পরে নষ্টিকে স্বয়ং জ্বর স্বর ঘনাবে, তখন মন দিয়ে শুনে বুঝতে চেষ্টা করলে সহজেই বুঝতে পারবে । তখন আমার আশ্চর্য হবে বলবে, “এ তো সহজ কথা ! কেন যে আগে বুঝতে পারিনি !” কিন্তু যতক্ষণ ভেদন স্বরের অভাব, ততক্ষণ ভাবতে গিয়ে শিরঃপীড়া এসে ফেললেও কিছু বুঝবে না ।

কাজটা বেশ উত্তেজক, কারণ এখানে তোমাকে আনতে হবে ইচ্ছার তোর আর বৈধ । তারই সন্নিহিত অনশীলনে আত্ম যৌগ অবোধা কিছুদিন পরে তা বোধ্য হবে ।

তার জন্য প্রতি ঘণ্টার প্রতি বৃহুর্ভে ঐ চেষ্টা নিয়ে বাধ্য ধরবার প্রয়োজন নেই । একটা সোজা কাজ করলেই যথেষ্ট : মন দিয়ে শুধু শুনে, আর টচ্ছা বা আশ্রুতা রাখবে বুঝতে । তাতেই ফল হবে । নতুন কিছু জিনিস প্রবেশের জন্য চেতনার মধ্যে একটি ছিদ্র চাই ; তোমার চেতনার মধ্যে যেখানে দেয়াল আঁটা, আশ্রুতা সেখানে লাগ কেটে সেই ছিদ্র রচনা করবে, তখন সে জিনিস তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে । যতঃপর বোধের এলাকাতে আনবার জন্য নষ্টিকের মধ্যে যা করা দরকার তা সেই ঠিক করে নেবে, তোমাকে তার জন্য ভাবতে হবে না । তুমি আপাতত অন্য কিছু বোঝো, আপন কাছে মন পাও, পড়ে মোখো, যা কিছু ভাবতে চাও তাহা ; করেক মাস বাসে—কিংবা এক বছর বা কিছু অল্প-বিস্তর সময় বাসে—সেই লেগার পূর্বোক্তা তারগাটি ধুলে সেই লাইনগুলি আমার পড়ে দেখ । তখন স্বর্গীয় জনের মতো তা পরিষ্কার হয়ে যাবে, কারণ নষ্টিকের মধ্যে যে বস্তুর অভাব ছিল তা তখন তৈরি হয়ে গেছে ।

সুতরাং আমার কাছে এসে আর যেন বনোনা, “এ জিনিস পড়ে বোঝার কবতা আমার নেই, বর্ণন আমি বুঝিনা, কিংবা গদিত শেখা আমার দ্বারা সম্ভব নয় ।” এমন কথা মনে করা অভ্যাসটা ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ নষ্টিকের সন্নিহিত বিকাশের জন্য যদি যথেষ্ট সময় লাগে তাহলে তোমার না বুঝতে পারার মতো কোনো জিনিসই থাকতে পারে না । আর ভোমার মনকে যদি এক বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ের জন্যও প্রস্তুত করে নিতে পারো, এক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যেতে পারো (যেমন এক ভাষা ছাড়াও অন্য একটি ভাষা শিখে নেওয়া), যদি পর্যায়ক্রমে এক শিক্ষা থেকে আরো করেক রকম শিক্ষার আধারস্থল নিয়ে

বধো গড়ে নিতে পারো, যদি সকল শিক্ষাকেই স্থলবদ্ধ ভাবে নিখের বধো বয়সপূর্বক গুহিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে পারো,—তাহলে প্রত্যেক শিক্ষার জন্যই নতুন নতুন কেন্দ্র গড়ে উঠবে, এবং তার মাধ্যম এতই বেড়ে যেতে পারবে যে তার কোনো নির্দিষ্ট সীমা থাকবে না।

এমন কোনো সীমারেখা দেওয়া যাচ্ছে বা ভেদ করা অতিক্রম করতে অসম, এ কথা আমি মানিনি।

কিন্তু আমি স্পষ্টই দেখি, লোকের মনের গঠন এমন যে কোনো বিষয়ে চেষ্টা করলে গেলেই অমনি তাদের মাঝে আলস্যের জড়তা এসে হাজির হয়, আর তাদের সংকীর্ণ সীমাকে বেশি তারা ব্যাপ্তির মধ্যে অতিক্রম করে। কিন্তু সে ব্যাপ্তিকে ধূর করা যায়, যদি মনের গঠনে কিছু সোম ক্রটি না থাকে, যদি তার ভিত্তিকার কোনো উপাদান “ছাড়” হয়ে গিয়ে না থাকে—কারণ তাহলে সে ক্রটি কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু কঠিন হলেও তা একেবারে অসম্ভব নয়। মহাশা এমনও কেউ কেউ আছে যারা বেশ নিতান্তই দার্প (তাদের বিপদ দেওয়াই উচিত, যদিও চলিত ব্যবস্থা বেরকর নয়, যদিও সাধারণ মানুষ ধারণার তা বলবে না)। কিন্তু তুমি যদি স্বাভাবিক মানুষ হও, তাহলে ঠিক সন্তান চেষ্টা করলে উন্মুক্তি সম্ভাবনা থাকে অসীমেরই মধ্যে।

লোকে বলে প্রত্যেকের হাত হয় আলাদা বকনের, ঝাঁট করনো গাল হতে পারে না, হাত গাছ করনো ভুট্টা গাছ হয় না,—কিন্তু সে হলো স্বভাব কথা। তার অর্থ এই যে তোমার সন্তান পক্ষে যা সত্য তোমার প্রতিবেশীর সন্তান পক্ষে তা নয়। কিন্তু তোমার আপন গঠন অনুযায়ী আপন সন্তানের মধ্যেই যে সম্ভাবনা রয়েছে তাই প্রায় সীমাহীন। কেবল তুমি নিজেকে সীমাবদ্ধ বলে ধরে নিয়েছ বলেই তুমি সীমাবদ্ধ হয়ে যাছো, সীমা ছাড়িয়ে যাবার উপায় সম্বন্ধে তোমার যথেষ্ট অজ্ঞানতা রয়েছে সেই কারণে। নতুবা এমন কিছুই নেই যা তোমার সাধ্যাতীত হতে পারে, কেবল যদি তার সমুচিত উপায়টি তোমার জানা থাকে।

(৫৮)

আবার কাছে প্রশ্ন করা হয়েছে, ইচ্ছা আর ইচ্ছুকতার পাণ্ডা সম্বন্ধে সম্প্রতি যা বলেছিলেন সেই সম্পর্কে। শ্রীমদ্রবিশ্ব তাকেই বলেন ইচ্ছুকতা—যা কোনো উচ্চতর চেতনা হতে এসে সন্তান মধ্যে ক্রিয়া করে না, যে সকল মিনিস যাকে কেবল বাইরের থেকে একটা ঝোক বা প্ররোচনার আকারে।

ইচ্ছা কথাটি দাবার প্রয়োগ করি সেই বিশেষ বৃত্তি সম্পর্কে যা চেতনার মধ্যে আসে ব্যক্তিত্বের অন্তর প্রকৃত সত্য হতে, অর্থাৎ কেন্দ্রস্থ আসা হতে। আর যে অভিনাষগুলি জেনে মিনিস নয়, যা সন্তান মধ্যে আবির্ভূত হয় ঝোকের তড়ানার মধ্যে, তাকে বলি ইচ্ছুকতা

বা ইন্দ্রা। এ কথাও ভোনারদেব বলা হয়েছে যে সম্পূর্ণ অজানিভ্রমে আর কখনো বা জানিতভাবেও যখন ভোবরা বাইরের কিছু প্রভাবে উত্তেজিত হও, অথচ আপোঁ টের পাওনা যে তা কোথা হতে কেনন করে আগলো, তাকেই ভোবরা বলা ভোনারদেব ইচ্ছা হওয়া, এবং তারই বশে কিছু করা বা না করা সবচেয়ে নিষ্ফলত্ব করায়।

আনাকে তাই প্রণয় করেছো যে ঐরূপ প্রভাব কিরূপ আর কি ভাবে তা আভ করে।

তার প্রকৃতি যাতে বিভিন্ন ব্রকনের। বনস্তব্দের দিক থেকেও তার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারো, কিংবা শুধু ব্যতিক্রমের দিক থেকেও পারো,—বস্তুত বনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া থেকেই তা ব্যতিক্রমভে পরিণত হয়, অর্থাৎ আগে বনের মধ্যে ক্রিয়া হয়ে পরে তা স্থল ব্যতিক্রম-রূপে প্রকাশ পায়।

এমন মানুষ যুব কন্যই আছে যাদের মধ্যে গভীরতর ও উচ্চতর সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন ইচ্ছা অভিব্যক্ত হতে পারে, এবং তাদের মধ্যেও তা কন্যই বেশা মেয় ইচ্ছিত কোনো বিবল বৃহত্তে। ব্যক্তিচেতনা বাইরে প্রকাশ পায় তার সেহকে চাপিয়ে। এমন কি আনাদের যে সূক্ষ্মদেহ, যা প্রাণসত্তার তুলনার অনেকটা বাস্তব এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা প্রায় গোচরও হতে পারে, তাও স্থলদেহের সন্নিবিষ্ট শীমারেখাকে ছাড়িয়ে অনেকটা বেরিয়ে আসে। সেই সূক্ষ্মদেহের একরূপ সক্রিয় স্পন্দন থাকে, যা অন্য ব্যক্তির সূক্ষ্মদেহের স্পন্দনগুলির সঙ্গে বোলাবোলা করে, আর সেই পারস্পরিক সংস্পর্শের থেকেই ঐ সকল নানারূপ প্রভাবের সৃষ্টি হয়; তখন তার স্পন্দন এমন জোবালো হয়ে ওঠে যে অপর ব্যক্তিকে তার দ্বারা অভিভূত করতে পারে। যেমন মনে করো—একথাও অনেকবার বলেছি—ভোনার ভিতরকার একটি চিত্রা বেরিয়ে এলো কতকগুলি সূক্ষ্ম স্পন্দন নিয়ে, এবং তা একটি নিজস্ব অস্তিত্ব নিয়ে পৃথিবীর আবহাওয়ার মধ্যে ঘোরাসূত্র করতে থাকলো, বোবানেই স্রবিতা পাবে সেখানেই সে চুকে গিয়ে নিজেস্বক সফল করবে; কিন্তু সেটি তো হলো কত নব্বের মধ্যে একটি; বহুর সঙ্গে জড়িয়ে যাবার ফলে তার এমন এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো যা অপ্রত্যাশিত, যেমন সহজ কল আশা করা যেত তেমন কিছুই নয়।

তুমি যাকে ভোনার আমি বলা, ভোনার বর্তমান চেতনার গভীর দিয়ে ঘেঁষা যে ব্যক্তি-সত্তা, সে অনবরতই আত্মত হচ্চে ঐ সকল বাহ্য স্পন্দনের দ্বারা, এবং সেগুলি প্রায়ই আসছে নানারূপ অভিভাবনের (suggestions) রূপ নিয়ে; ইচ্ছিত ব্যতিক্রম ছাড়া সেগুলি প্রথমে চুকে পড়ে বনের এলাকায়, তার পর সেখান থেকে যার প্রাণসত্তার মধ্যে, তার পরে দ্বিতীয় চেতনার মধ্যে (এখানে শুদ্ধ বনের কথা বলছি না, এ হলো শেহগত বন); বস্তুত সেহচেতনারও নবোব ক্রিয়া প্রাণব ক্রিয়া এবং স্থল সৈনিক ক্রিয়া আছে; ভোনার সেহের ও সেহচেতনার মধ্যে যা কিছু প্রতিক্রিয়া ঘটছে, তা প্রথমে ঘটছে ঐ সকল অভিভাবনের দ্বারা বানসিক স্পন্দন ক্ষেপে ওঠার ফলে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তুমি কিছুমাত্র জানতে পারোনা তার কথা; সেগুলি বাইরের থেকে এসে ভোনার মধ্যে একটা সাদা আগার, তাইপরে চেতনান্তে

এমনভাবে প্রকাশ পায় যেন তা তোমার নিজেই চিত্রা, নিজেই ইচ্ছা এবং জ্যোতি, কারণ হাইরের থেকে তার প্রবেশ সযত্নে তুমি সম্পূর্ণ অজ্ঞান।

এই সব আশঙ্কক অভিভাবন বহু প্রকৃতির ও বহু ধরনের হতে পারে, কিন্তু নোটের উপর তাকে তিনরূপ দিক থেকে দেখা যায়। প্রথমত তাকে বলা যেতে পারে সমষ্টিকৃত অভিভাবন (কেবল যারা আপন সত্তার আভ্যন্তরীণ জিন্মা নিয়ে চিত্রা ও পর্যবেক্ষণ করেছে তারা ব্যতীত সাধারণ চেতনাতে তার সযত্নে জানা যায় না।)

যে সত্তাটি পৃথিবীতে আসবে তাকে কোনো এক নির্দিষ্ট দেশের নির্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যেই জন্মতে হবে তার পিতামাতা বেনন হবে সেই অনুযায়ী সে জন্মাবে কোনো এক বিশেষ ভাষার বিশেষ সনাক্ত ও হয়তো এক নির্দিষ্ট ধর্মের আওতার মধ্যে; ঠিক সেই অনুযায়ী তাকে অভ্যন্তর হতে হবে চিত্রা ও বিচার করতে, ধারণা ও অনুভব করতে; এবং তার বনের অভ্যন্তরগুলি হবে পর্ববসিত হবে প্রাণগত ও মূল সেহগত অভ্যাসে। তেমনি তুমিও জন্মেছ এক নির্দিষ্ট দেশের এক বিশেষ সনাক্ত ও বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে, তাদের সকলের যে দায়ী সকলের ধারণাসমষ্ট রয়েছে তার আওতার মধ্যেই তুমি অবস্থান করছ। প্রথম বাল্যাবধিই অসম্পূর্ণ এ সম্বন্ধে কিছুই তুমি জানোনা, কিন্তু জোয়ার তরিক গঠনের ভিত্তি দিয়ে সেগুলি জনন ক্রিয়া করতে থাকে। অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা এগিয়ে আসতে থাকে বস্তুত্বের পর দানী ও দিনের পর দিন, ধীরে ধীরে তাই নিয়ে গড়ে ওঠে তোমার চেতনা। তুমি যেন হয়ে গেলে কাচের আড়াল দিয়ে তৈরি এক নির্দিষ্ট সেরাটোপের মধ্যে, তাতে যদিও তোমাকে একটি দায়ী আশ্রয় দিনে, কিন্তু সেই সঙ্গে তোমাকে রাখলে নিত্যই গীর্নাবদ্ধ করে। সেই গীর্নার ভিতরকার সকল কিছুকেই তুমি অজ্ঞাতে ও নির্বিবাদে নিজেই নিয়ে নিয়ে গিয়ে, তাই দিয়েই গড়ে উঠল তোমার ব্যক্তিগত অবচেতনের ভিত্তি। সেই ভিত্তি নিয়েই তোমার সারা-জীবনের ক্রিয়াগুলি চলতে থাকবে, তার হাইরে তুমি যেতে চাইবে না। তার গাঠী থেকে নিকৃতি পেতে চাইলে তোমাকে আগে তার সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। সেই প্রধান পর্যবেক্ষণ-চাই সব চেয়ে কঠিন,—কারণ ভিত্তি। গড়া হয়েছিল গোড়া থেকে অতি সূক্ষ্মাত্মক আর তা হয়েছিল এমন অবস্থাতে যখন তোমার কোনো স্মরণোত্তরই ছিল না, যখন অন্য জগৎ থেকে হঠাৎ এখানে পতিত হয়ে হতচেতন হয়ে রয়েছ; তখন তোমার মধ্যে যা কিছু কাজ করেছে তাতে তুমি নিজে কোনো অংশগ্রহণ করে নি। সুতরাং এমন কথা তোমার মনেই উদয় হবেনা যে ওই মধ্যে কিছু বাছাই করার কিংবা বর্জন করার আছে। কিন্তু যদি কখনো কোন বিশেষ কারণে জানতে পারো যে ঐ সমষ্টিকৃত অভিভাবনের প্রভাব জোয়ার মধ্যে কতখানি কাজ করেছে, তখনই চোটা আগবে তার থেকে কাটিয়ে উঠতে, আর তখনই জানবে যে তার জন্য কত নিরন্তরের উদ্যোগ নিয়ে কত গীর্নাকাল হয়ে তার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। কিন্তু তাতেও সকল সমস্যা মিটিবে না। আরো ব্যাপার আছে।

তুমি এই জগৎ সংসারে রয়েছ অনেকের দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে। তাদের চেতনাতে

নিভা স্পষ্ট হচ্চে নানা কারণে নানা ব্যক্তিগত কামনা ও ইচ্ছুকতার ক্রিয়া ও বোঁক। জোনার বাপ, মা, ভাই, ভগ্নী, বড়বাবু, নকলেরই কামনা ও অনুভূতি আলাদা। আলাদা, তারা প্রত্যেকেই জোনার কাছে কিছু প্রত্যাশা করে, আর তুনিও তাদের কাছে তাই প্রত্যাশা করে। তারা যদিও সে কথা প্রকাশে বলে না, কিন্তু তাদের সত্য চেতনার মধ্যে তা একটা গঠন নেয়। সেই গঠনগুলির স্পন্দন তাদের বিভিন্ন চিত্তপ্রাপ্তি ও প্রাণপ্রতি অনুসারে কমনৌ পঙ্ক্তিলালী, কিন্তু তার ক্রিয়া জোনার গৃহবাসমর্থের বাতাসাপেক্ষ; তাদের আশা বা প্রত্যাশা অব্যক্ত হলেও তার স্পন্দন অভিজ্ঞানরূপে জোনার মধ্যে প্রবেশ করে, আর তুনি নির্বিবাহে সেগুলি গ্রহণ করে। তার কমে অনুরূপ কামনা ও ইচ্ছুকতার ও বোঁকের গাড়া অকস্মাৎ জোনার মধ্যে ও মাঝে। সকাল হতে সন্ধ্যা আর সন্ধ্যা হতে সকাল পৰ্যন্ত নিভা এই ব্যাপারই চলেতে থাকে, কারণ ঘুমের সময়েও তার নিবৃত্তি নেই, বরং তখন এম কাছ আরো বেশী বাতায় হর, কারণ তখন সতর্ক হবার মতো আগ্রহ চেতনা বিলুপ্ত হয়েছে।

সাধারণ অবস্থাতে এই জিনিসই হতে থাকে। আর সাধারণ বনেই তা এমন স্বাভাবিক যে বিশেষ কোনো অসাধারণ অবস্থাতে না পড়লে কিংবা তেমন কোনো দেহ উপস্থিত না হলে এর সম্বন্ধে তুনি কিছু জানতেই পারেনা। বলা বাহুল্য জোনার তরফ থেকেও তাই হয়, জোনার কামনা এবং বোঁকগুলিও তাদের জিনিসকে প্রভাবিত করে, তাতে এমন এক অদ্ভুত বিশৃংখ প্রস্তুত করে যার মধ্যে প্রবলতর ভাবটিই জয়ী হয়।

এ ছাড়া আরো কিছু উপপর্ন রয়েছে, নতুবা ঐখানেই যদি সমস্যার শেষ হতো তাহলে ডুবু ঐক্লপ ঘটনতা কালিয়ে ওঠা যেতো। কিন্তু আমাদের এই পার্থিব জগৎ যাবার অন্যান্য পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকেও নিভা যাত্রান্ত হচ্চে সেখানকার নানারূপ পঙ্ক্তি ঘরা, সেগুলি হলো প্রাণের সূক্ষ্ম জগৎ, যা এখানকার চার প্রকার আবহাওয়ার (গেহ, প্রাণ, মন ও মৈত্র্য) বাইরে; সেই প্রাণের জগৎ চৈতন্যের পঙ্ক্তি ও চেতনার অধীন না হওয়াতে সেখানে যত অজ্ঞত ইচ্ছা ও বিপৃথ্বনা ও অসাম্যেরই প্রাধান্য; যত কিছু অদ্বিবারই প্রাদুর্ভাব সেখানে। সেই প্রাণের জগৎ থেকে আমাদের অজ্ঞাতে নিভাই নানারূপ প্রভাব এসে পড়ছে আমাদের মধ্যে, নিভাও অসাধারণ হই একটি মানুষের কাছে ছাড়া। যেগুলি আসে তার প্রত্যেকটিই থাকে বিভিন্ন অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব, সেগুলির উদ্দেশ্যও থাকে বিভিন্ন প্রকার, যেগুলি ছোটোখাটো সত্তা সেগুলি আসে কেবল আনন্দ পাবার জন্য, আর বড়োগুলি আসে আমাদের মধ্য কিছু অনিত্য ও বিপৃথ্বনা ঘটাবার জন্য। তাদের মধ্যেই পঙ্ক্তি থাকে; যেখানেই সেখানে একটু দুর্বলতার ছিদ্র, সেখানেই ঢুকিয়ে দেয় বিপণীত অভিজ্ঞান। এই তাদের খেলা।

আজিছা সেই সকল অজ্ঞত সত্তা যেন বুঝুক হয়ে থাকে মানুষের প্রাণকে উন্মেল করে জোনার জন্য, এতেই তাদের রুচি, এ যেন তাদের একরূপ সুখরোচক ভোজের ব্যাপার। মানুষ উত্তেজিত ও বিপণীত হয়ে অথবা আচরণ করুক, তাদের প্রকৃতির মনের দিকটাই শূন্য

কবে তুলুক, তবেই তাদের সুখ হবে, ব্রহ্মিজেন্না খাবার নত্যা অতি আনন্দে তা উপভোগ করবে। তোমরা প্রকাশ করো তোমাদের মাথা, অনুমাণ, উন্মাদনা, বাসনা, কামনা, তীব্র আবেগ, যাঁর ভাঙনায় কিংবা দ্বন্দ্ব তোমরা হঠাৎ অনেকখানি প্রাণশক্তি নষ্ট করে ফেলবে, এটাই তারা সর্বাধিক পচন করে, এতেই তাদের রসনাভূগ্নি হয়। তাদের কৌশলও খুব গোছা; কাক পে নই মতিভাবনের দ্বারা সাবান্য কিছু ছোঁক বা আবেগের স্পন্দন চুকিয়ে দেওয়া, তারই পক্ষে নাড়া পেয়ে তোমার ভিতরকার অনুরূপ স্পন্দন উঠবে ছেগে, উত্তেজিত হয়ে তুমি প্রাণশক্তির অপব্যয় করবে আর তারা তাই পরমানন্দে গুমে নিজে থাকবে।

এই সব ক্রিয়াগুলিকে অন্যায়সে ধরতে পারা যায়, যদি ঐকান্তিকভাবে অবস্থিত হয়ে তুমি নিজের ভিতরের দিকটা নিরীক্ষণ করে দেখে; স্পষ্ট দেখতে পাবে যে তোমার সমস্ত কোনো অংশ হঠাৎ যেন ভেগে মাথা নাড়া দিচ্ছে উঠল বাইরের থেকে আসা কোনো এক প্ররোচনাতে; কোনো কোনো ধারে নির্ভুল রকমে ছানতে পারবে যে একটা ব্যক্তির ধরনের প্রভাব তোমার মধ্যে প্রবেশ করল এবং একটা চাকুর্যের ভঙ্গ তুলে দিল। যেমন হঠাৎ, তুমি যদি রাগী মানুষ হও আর তোমার ক্রোধটাকে দমন করতে চাও, তখন সতর্ক থাকলেই দেখবে যে কোনো ক্ষুণ্ণ উপস্থিত চলে বাইরের থেকে বা নীচের দিক থেকেই প্রকৃতই একটা কিছুই বেধ এসে তোমার চেতনাকে অধিকার করে ক্রোধটাকে নাড়া দিয়ে জাগাচ্ছে। অবশ্য সকলেই এমনভাবে টের পায় না। আমি বলছি কেনল তাদেরই মধ্যে যারা আপন সমস্তকে চিনে তাকে সংযত রাখতে চেষ্টা করে। এই সকল বিপরীত ধরনের প্রভাব যখন এসে উপস্থিত হয় তখন তাকে চিনতে পারা অপেক্ষাকৃত সচল কিন্তু যখন তা আসে ঠিক তোমারই অনুরূপ প্রকৃতির কোনো অপর ব্যক্তির কাছ থেকে, যখন তার কোনো ইচ্ছা বা কামনার হোঁচক তোমার মধ্যে এসে নাগে, তখন তা যে বাইরের থেকে এলো এ কথা না বুঝেই তুমি তাতে সাড়া দাও, তার থেকে আসা স্পন্দনগুলি এতটাই নিজের ভ্রমিসের নত্যা দেখায় যে খুব নিষ্ঠুর নিরীকার সঙ্গে বন্ধ। না করলে তুমি ধরতেই পারবে না যে বাস্তবিক তোমার নিজের ভিতরকার ভ্রমিল নয়, তা এসেছে বাইরের অন্য একজনের কাছ থেকে।

এই হলো মোট সমস্যা; কিন্তু এর প্রতিবিধান কি? তার বেনাতে সেই একই কথা। চাই কেনল শুভ ইচ্ছা, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, স্বচ্ছ দৃষ্টি, আর বৈরাগ্যবশ,—হাঁ, তাই, পরম অধ্যবসায়ের সঙ্গে বৈধ ধরে থাকতে হবে; বিপুল করতে হবে যে আল যে কাঙ্ক্ষ করতে অক্ষম হচ্ছে একদিন তাতে সক্ষম হবে, আর যতদিন সেই সক্ষমতা না আসতে ততদিন তার জন্য চেষ্টা করে যেতে হবে।

এখানে আবার আনন্দা ফিরে আসছি সেই শ্রীঅরবিন্দের সূত্রাবলীর কথা; আজ যা অসম্ভব মনে হচ্ছে, তার অর্থ এই যে পরে তা একদিন কেবল সম্ভবই নয় কিন্তু প্রকৃতই সকল হবে।

★

প্রশ্ন : কোনো কঠিন রোগে যখন আক্রান্ত হই, তা কি কেবল শরীরের সোম থেকেই হয়, না আধ্যাতিক জীবনের বাধা বিপত্তি থেকেও হতে পারে ?

উত্তর : তা নির্ভর করে বিভিন্ন অবস্থার উপরে। যে ব্যক্তি যোগ যত্নসহ করছে তার যদি ওরূপ হয়, তবে নিশ্চয়ই আধ্যাতিক জীবনের মধ্যে কিছু বিপত্তি ঘটা তার কারণ। আর সাধারণ মানুষ হয়ে সাধারণ জীবন বাপন যে করছে, যোগের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই তার নেই, তার বোনাতে সাধারণ পারীত্রিক বিপত্তিই হবে তার কারণ। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের উপরেই তা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে। বাইরের লক্ষণগুলি দ্রষ্টব্যে একই রকম দেখানো, কিন্তু আভ্যন্তরীণ কারণটি হবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বস্তুত দুটি মানুষের রোগ কখনো তবৎ এক রকমের হয় না, বরং কেন তখনো কেবল এঁটে রোগকে নির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে কোনো প্রত্যেকেই অন্তর্ভুক্ত হয় তার নিজের ধরণে, এবং তা নির্ভর করে তার ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা ও চেতনার অবস্থার উপর।

অন্যায় অনেকবারই এ কথা বলেছি যে রোগ জন্মের সামন্ত্য নষ্ট হলে, কিন্তু সেই অসামন্ত্য আসতে পারে সত্তার ভিতরকার নানারকম ছত্রের বিভিন্ন অবস্থানবোধ থেকে। সাধারণ মানুষের চেতনা তার দেহসত্তাকে নিরেই কেন্দ্রীভূত, সে ফলে তার যা অসামন্ত্য ঘটবে তা সম্পূর্ণই সৈহিক। কিন্তু যেখানে বাধা জীবনের যন্ত্রণাতে একটা আভ্যন্তরীণ জীবন পড়ে উঠেছে, সেখানে অসামন্ত্যও বহুবে গিয়ে অন্য রকমের হয়; সেখানে যে রোগ দেখা দেয় তা হলো সত্তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটা অমিল হওয়ার অভিব্যক্তি; অর্থাৎ একদিকে আভ্যন্তরীণ উন্মত্তি হচ্ছে বা তার জন্য চেষ্টা হচ্ছে, আর অন্যদিকে জীবনের ও দেহের বাধা অবস্থার তরফ থেকে ভ্রান্তে বাধা জন্মাচ্ছে, তার ফলেই ওরূপ হচ্ছে।

সাধারণ বিচারেও বহুকাল থেকে এ কথা সর্বজনানিত যে রোগ জন্মের কোনো নীতিগত ব্যক্তিক্রমে জীবনীশক্তি অবনতি ঘটলে। যতক্ষণ পর্যন্ত দেহের মধ্যে বাতানিক সামন্ত্য বজায় রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত দেহের প্রতিরোধশক্তিও অক্ষুণ্ণ আছে। ততক্ষণ পর্যন্ত মূল দেহের মধ্যেই এমন সূক্ষ্ম নিবারণী স্পন্দন চলাতে থাকে যা রোগকে প্রতিরোধ করতে পারে, এমন কি সংক্রামক রোগকেও (বস্তুত সকল রোগের নিম্নস্ত স্পন্দনই সংক্রামক, যদিও কতকগুলি রোগ বিশেষ রকমে সংক্রামক)। জোনার পারীর ক্রিয়াগুলিকে যদি ঠিক তালে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকো, আর যদি জোনার নৈতিক ভারসাম্য খুঁট থাকে, তাহলে জোনার মধ্যে এতটাই প্রতিরোধশক্তি থাকবে যে কোনো রোগের সংক্রামক জোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু কোনো কারণে যদি জোনার সেই তাল বা সামন্ত্য বিঘুড়ে যায়, যেমন বিষণ্ণতা বা অশান্তির দ্বারা, কিংবা কোনো নৈতিক বিকার বা দারুণ অবগাদ ঘটায় তুমি পূর্ণন হয়ে পড়লে, তখন জোনার সেই প্রতিরোধশক্তি হ্রাস পাবে এবং রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ঘটবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি যোগের পথ নিয়েছে তার কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অর্থাৎ তার ভিতরকার

অসামঞ্জস্যের কারণ ও তার প্রকৃতিও হবে সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। তার বেনাতে বেদে রোগ দেখা দেবে আত্মস্বরূপ বিপত্তি থেকে, এবং তা সারাতে হলে সেই ব্যত্যস্তর বিপত্তিকেই দূর করতে হবে। প্রত্যেককেই তখন নিজের মধ্যে খুঁজে দেখতে হবে যে কেন সেসব রোগ হচ্ছে।

নতুবা সাধারণ জীবনে যা হয়ে থাকে, অবিকার্য কেত্রে ভরই হলো তার কারণ—মনের কিংবা প্রাণের তরফের ভরও হতে পারে, কিন্তু শ্রায়েই তা সৈহিক ভর, সেদিক কোষগুলির অস্ত্রর ভর—তাত্ত্বিক রোগ সংক্রমণ আপন জন্য দরজা খুলে দেয়। মনের ভরকে দূর করা যায় কিন্তু মানবোচিত আত্মসংযম ও আত্মবর্ধনামায়া থাকলে। তার চেয়ে সূক্ষ্মতর প্রাণের ভরকে দূর করতে আরো বেশী আত্মসংযমের দরকার হয়। কিন্তু ঐ সৈহিক ভরকে দূর করতে ঐতিহ্যবাহী যোগ সাধনার দরকার হয়, কারণ সেদিক কোষগুলি রোগ এবং ব্যাধি-বেদনা নাককেই অত্যন্ত ভর করে; সামান্য কিছু স্বল্পবেদেই ভগ্না অস্থির হয়ে ওঠে, অস্থিরি সহ্য করতে নাটো পারে না, সেখানে চাই চেতন ইচ্ছা প্ররোণের শক্তি।

সাধারণত ভরই রোগকে ডেকে আনে। প্রাণ-মনের ভরের কথা বলছি না, কারণ ওগুলি কাপুরুষের নক্ষণ, প্রকৃত যে মানুষ হবে সে অবশ্যই তা ভর করতে পারবে। কিন্তু সৈহিক ভরকে ভর করাই সব চেয়ে কঠিন। সেদিক উপর তোমার যদি কিছুনাঈ আধিপত্য থাকে তাহলে তুমি তার ভোরে ভরকে অনেকটা প্রশমিত করতে পারো, কিন্তু তার থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাও না। সৈহিক ভরে কোষগুলির মধ্যে একতরপ শিথল হতে থাকে, তাত্ত্বিক রোগকে আরো বাড়িয়ে দেয়। এটি না থাকলে অতি দুর্গম রোগকেও প্রতিরোধ করা যায়।

কেউ কেউ এমন আছে যাদের প্রাণের ভারসাম্য সহজে নষ্ট হয় না। তাই তারা সহজে ভর পায় না, এমন কি সৈহিক ভরও নয়; তারা সৈহিক জীবনের একটা ছন্দ বজায় রেখে চলতে পারে, তাই আপনা হতেই তাদের মধ্যে রোগের প্রকোপ খুব কম হয়। কিন্তু সাধারণত অন্যান্যের বেনাতে রোগ হলোই তা পুরোপুরিভাবে শূন্য হয়ে ওঠে, এমন কি নাগরিকও হয়ে উঠতে পারে। সবই নির্ভর করে জীবনস্থানের সামঞ্জস্যের উপর; জীবনের ছন্দ ঠিক থাকলেই রোগের বাহ্য আক্রমণকে ঠেকানো যায়; তার ব্যতিক্রম ঘটলেই ঐ ভরের শিথল হওয়া হয়ে যাবে, প্রতাপিত উৎসে সামান্য রক্তের অধিকারও একটা দগ্ধসাধারণ উৎকট অবস্থার এনে দাঁড় করাবে। মানুষ রয়েছে বিভিন্ন পর্দারের,—যারা প্রচণ্ড মহাকাব্যীয় সময়েও রোগের সংক্রমণ এড়িয়ে বেশ সুস্থ থাকে তাদের পর্দার থেকে ওরু করে যারা সামান্য কারণেই রোগে আক্রান্ত হয় তাদের পর্দার পর্দায়। সুতরাং সবই নির্ভর করে আপন আপন পঠন ও ধাতের উপর; যারা তাকে উন্মুক্ত করে তুলতে চায় তাদের চেষ্টা করতে হয় সেদিক উপর আধিপত্য আনতে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই যেহ উৎসর্গজির নিরত্নবাহ্য যত্নে পরিপূর্ণ না হয়; সেদিক অবস্থার ঘটলে তখন সকল রোগই প্রতিরুদ্ধ হতে পারে।

কিন্তু ভয়কে দূর করলে জোঁরা অনেকটাই নিরাসন হতে পারে। দেখ যে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় আতঙ্কান কি হচ্ছে ; তার মধ্যে শতকরা ৯৯ জন ব্যক্তি আতঙ্ক হচ্ছে ভয়ের ভাঙনাত্তে, তারা সংক্রামণের পক্ষে রোগের প্রাদুর্ভাবের কথা, আর পঁচাত্তনের বুথে পোনে তার সম্বন্ধে নানা অতিশয়োক্তি, এতে তাদের মনের মধ্যে একটা দারুণ বিভীষিকার স্রষ্ট হয়।

*

প্রশ্ন : ওষুধের প্রকৃত কাজ কী ? কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে চেতনা যখন উন্মত্ত রয়েছে আর ভগ্নবৎ-স্বপ্নার জন্য ও যখন আশূয়া রয়েছে, তখনও ওষুধের প্রয়োগ হয়, আর রোগের সময় কিছু ওষুধ পেনে তার ফলও ভালো হয়। তার অর্থ কি এই যে তখন দেহের পক্ষেই ওষুধের প্রয়োগমন, কিংবা মন ও প্রাণের তা একটা বিকার নাকি ?

উত্তর : ওষুধের কাজ ? অবিকার্য ক্ষেত্রে তা দেহকে স্বাভাবিকতার পক্ষে সাহায্য করে, যদি তুমি তা সূচিচিত্তভাবে প্রয়োগ করো, অর্থাৎ তার অথবা অপব্যবহারে নিজেদের ঔষধ-বিষাক্ত করে না তোলে। বস্তুত যেহই নিজেকে আরোগ্য করে, আরোগ্য হতে চাইলেই সে আরোগ্য হতে পারে। দোঁড়া ভাক্সারেরাও এ কথা এখন মানছে। তারা বলে, “হী, আমাদের ওষুধওনি তার কাজ করে বটে, কিন্তু কেবল তাকেই রোগ সাধে না, দেহপ্রকৃতি তার সাহায্যে নিজেই নিজেকে সারিয়ে তোলে।” যেহেতু যখন ওষুধ দিয়ে সাহায্য করো, তখন সে বলে, “এবার তাহলে আমি সেয়ে উঠবো, আর এই কথা বলতে বলতেই সে আরোগ্য হয়ে যার। অপপ্রয়োগ না হলে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ওষুধ কিছু সাহায্য করে। কিন্তু অথবা ব্যবহারে তার ফল খারাপ হয়। এক রোগ সারাতে দিয়ে তুমি তার চেয়েও এক মঙ্গল রোগ আনো।

তথাপি, ওষুধের সাহায্য পেনে বেদের আবিস্মায় কিরে আসে, তখন সে বলে, “এবার ওষুধ খেলান, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।” এতেই যথেষ্ট কাজ হয়। দেহ তখন নিজেকে সারাবে। থির করে নিজেই সারিয়ে তোলে।

এই ব্যাপারেও সঙ্গবন্ধার নানা পর্ষায় রয়েছে। একজন ঘোঁরা পক্ষে এতটাই আত্মতরীণ শক্তি জন্মাতো পারে যে নারাতক বিষ খেয়েও সে হতম করে, তাকে তার কোনো বিযুক্তিয়া হয় না ; আবার এমন ব্যক্তিও আছে যে সাধারণ কিছু হলেই তিলকে তান করে অমনি ভাক্সারের কাছে ছোটে, তার আরোগ্যের দিকে যেতে বর প্রকার ওষুধ দরকার হয়। সুতরাং এই সকল বাহ্য বস্তুর উপর পুরো আধিপত্য স্থাপন করা থেকে ওক করে পুরোপুরি তার দাপট করা পর্ষায় সকল রকমই হতে পারে। বস্তুত সব কিছুই সম্ভব। দেহ হলো বর নাকি, হার্পোনিয়নের নক্সে তার মধ্যে চাবিগুলি রয়েছে সাজানো, তাকে যেমন বাজাবে তেমনি বাজবে।

প্রশ্ন : নন কি নিজের জোরে সেহকে সে কথা বোঝাতে পারে (অর্থাৎ অস্থল হলেও তা বিনা ওণুগে সাবানো যাবে) ?

উত্তর : কেবল তাতেই কাজ হয় না, ননের ইচ্ছাই দেখানো যথেষ্ট নয়। সেহের ভিত্তিকায় শূন্য প্রতিফ্রিাওনি ননের কথা নানো না। তা ছাড়া আরো কিছুর পরিকায়। তার জন্য অন্য দিকে দাত পাড়তে হয়। ননের চেয়ে উচ্চতর শক্তির সাহায্য চাই, কারণ ননের তৈরি জিনিস হলোই ভিতর থেকে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আসবে। তুনি ননের দ্বারা যেমনি কিছু ইচ্ছা চানাবে, অবনি তাতে বাধাও দেখা যাবে, হয়তো সাননাসাননি কোনো প্রতিরোধ আসবে না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা সংশয় এনে যাবে। আর সংশয় সাবানো নাত্র জ্ঞানেনেই অর্ধেক কাজ নষ্ট হয়ে গেল। যেমনি তুনি বলবে, “এইটি হওয়া আনি চাই,” অবনি সঙ্গে সঙ্গে যদি পিছনের দিক থেকে প্রশ্ন ওঠে, “তাত্ত কী এমন লাভ হবে, তাতেই জোনার ননের সংকল্পটি ভেঙে গেল।

ননের কাজগুলি বুঝই শূন্য ধরনের, সাধারণ মানুষ কখনই তাকে পুরোপুরি বশে রাখতে পারে না। যেমন ননে করে, (যাগ যোগ করে এবং সেহকে বশে রাখতে চায় তাদের সকলেরই এটি জানা আছে)—যনেক যোগ অভ্যাসের কলে তুনি জোনার মৈত্রিক এক দুর্বলতাকে ধর করতে পারলে, হয়তো জোনার মধ্যে কোনো অসঙ্গতি ছিল তার কোনো চিত্র যতঃপর অনেক বছর পর্যন্ত আর সেখাই গেল না, কিন্তু যেমনি হঠাৎ একদিন জোনার মাথার মধ্যে এই চিন্তাটি এলো, “হী, এবার যদি আসে।” তার মিনি খানেক পরেই সেখাবে আবার সব ফিরে এসেচে। যে জিনিসকে তাড়াত্তে পেয়েছিলে, তার একটু স্পন্দন যেমনি এসে স্পর্শ করলে জোনার চিন্তার কোনো বিশেষ জ্বরের দুর্বল স্থানটিতে, অবনি পুরানো সোম আবার ফিরে এলো।

যোগের ক্ষেত্রে এমন হওয়া সর্বজনিত। যদি ননের চেতনার বলতে থাকে যে অর করে ফেলেছি, যদি ওণু তাই তাতে শুরু করে, তাতেই জোনার বহু বছরের যোগ করার কন ধুলিসাং হয়ে যেতে পারে। সেক্ষপ হওয়া নিবারণ করতে হলে জোনােকে এমন মানসিক দীর্ঘতা আনতে হবে যাতে বাইরের কোনো স্পন্দন তার মধ্যে ঢুকে কাজ করতে না পারে। সেক্ষপ অবস্থা আনা অবশ্য বুঝই কঠিন, জাই শ্রীমদ্রবিশ্ব যাকে বলেন অজিতের “নিম্ন গোলাধ” তার এলাকা ছেড়ে উর্ধ্ব গোলাধে অর্থাৎ আধ্যাতিকের এলাকাতে চলে যেতে হবে—অবশ্যই তার থেকে পুরো নিকৃতি নিলাবে।

না না, ননের রাজ্যে থেকে কোনো অরলাভ হয় না। ননের উপর সর্ব বকয়ের বিরুদ্ধ প্রত্যাবের চেউ এসে লাগতে পারে। প্রত্যেক ননের পঠনের মধ্যেই রতছে তার বিশপীত ভাবের জিনিসগুলো। তুনি তাকে দমন করে রাখতে পারো, তাকে নির্বোধ বিবিধ করে রাখতে পারো, কিন্তু তু তা টিকেই থাকবে আর সাবানো দুর্বলতা বা অসঙ্গততার

সুযোগ পেলোই অবনি ভোনার সকল চেই। পও করে সেবে। মনেন বাবা কোনো। পুরো সাক্ষ্যো পো'হনো যায় না, কেবল নিশ্চিত ফলই নিমতে পারে। কিন্তু তার চেয়ে আরো ভোগালো কিছু নরকার। তাই মনের রাজ্য ছাড়িয়ে ভোয়াকে শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের মাছো কিংবা উচ্চ চেতনার রাজ্যে যেতে হবে, তবেই নিরাপদে অগ্রসর হতে পারবে।

সেহের উপর সব চেয়ে ভোগালো ক্রিয়া করতে পারে শ্রদ্ধা। মাসের দল্লর সরল, মনের বধো কোনো মারপাচ নেই, যারা সামান্যিধা মানুষ, অথচ বুদ্ধির দিকে খুব উন্মত না হলেও শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের জোর আছে, তারা বেহ সম্পর্কে সহজেই বখেই সাক্ষ্যো লাভ করতে পারে। তাই সেবে লোকে আশ্চর্য হয়ে বলে, "কেমন ক'রে তা হলো? অন্য লোকটি অসাধারণ মানুষ, এলিকে বেশ দিচ্ছিলাত করল অথচ ছোটোখাট সৈহিক দুর্বলতার দাশ হয়ে রইল,—কিন্তু এই লোকটি নিতান্ত বোকাসোকা সরল মানুষ, শুধুই তার বিশ্বাসের জোরে সমস্ত সৈহিক বাধাকে বীরের মতো অর করে যাচ্ছে।"

উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিপ্রবর মানুষের মনে শ্রদ্ধা আসতে পারে না এমন কথা আমি বলছি না, কিন্তু সেখানে তা হওয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন; কারণ তার মন সেখানে বিরোধিতা করবে, তর্ক করবে, বখে দেখতে চাইবে, প্রমাণ পেতে চাইবে, কাজেই তাকে শ্রদ্ধার বশে আনা খুব কঠিন হবে। শ্রদ্ধা এলেও ততটা বিস্তৃত জিনিস হবেনা। অর্থাৎ সে কেনে তাকে বিবর্তনের গণিল পথ বেয়ে মনের এলাকা অতিক্রম করে আধ্যাতিকের এলাকাত চলে যেতে হবে; সেখানকার শ্রদ্ধা চলে খুব উচ্চতরের অন্য জিনিস। কিন্তু আমি বলছিলাম সাধারণ মৈনলিন্দী জীবন নিয়ে, তার মধ্যে যারা সরল মানুষ, শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের উপর বখেই নির্ভর করে থাকে, তারা তেহকে সম্পূর্ণ বশ করতে না পারলেও অস্ততপক্ষে বুদ্ধিপ্রবর শিক্ষিত ব্যক্তিদের চেয়ে আপনা হতেই অনেকটা সকল হতে পারে।

প্রশ্ন না, আমার এক ব্যক্তিগত প্রশ্ন আছে: আপনার কপার জোনে খুব দুবারোণা একটা আতিক (organic) ব্যাধি সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে গেল, অথচ সেট একই দেহের সামান্য একটা লাকদিক (functional) ব্যাধি সারছে না, তা কেন হ'ল?

উত্তর: ওটা নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার; ওর কোনো সঠিক উত্তর দেওয়া যায় না। কারণ প্রত্যেকের মন্যায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন; তার আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা না জেনে কোনো-জন ক্রিয়ার হেতু নিরূপণ করা যায় না।

আর প্রত্যেক জিনিসের সম্পর্কেই এই কথা যে চেতনার যেমন অনেকগুলি স্তর আছে, ক্রিয়ারও তেমনিত ভেতগুলি হেতু আছে। বোটের উপর বলা যায় যে সেহগত, প্রাণগত, মনোগত আধ্যাতিক প্রভৃতি হেতুগুলি সব পৃথক পৃথক। একই ব্যাপারের পক্ষে অসংখ্য ভরের অসংখ্য প্রকার হেতু থাকতে পারে। একটিনাত্র হেতুই সম্পূর্ণ সত্য নয়, তা আংশিক সত্য মাত্র।

আর শেষ কথা, হেতু পূজিতে গেলে জোনাকে এক ভিনিস দিয়ে অন্য ভিনিসের অর্থ করতে বাধ্য হতে হবে, আর তাই করতে গিয়ে জোনাকে সকল প্রকার হেতুর ভিতর দিয়েই ঘুরে বেড়াতে হবে, শেষ নীবাংসা কিছুতে নিমেষে না।

বোট কথা, নূলের দিক থেকে যদি সবগ্রুভাবের দৃষ্টি নিয়ে বলতে হয়, তাহলে সব চেয়ে সেরা জবাব হবে এই, "ঐতপই ওখানে হবার কথা, তাই ঐতপ হয়েছ।"

*

ঐশ্বর্যবিশ্বের "Thoughts and Aphorisms" অবলম্বনে

৫২

"বার্তার ধর্মগুলির এক নতুন সুবিধা এই যে তাতে ভগবানকে ধরে কখনো কখনো বেশ উত্তর বধান দেওয়া যায়। প্রার্থনা নতুন না হলে স্বর্ষর মানুষরা তাদের আগ্রহা সেবতাকে ধরে প্রচার করে, তাই সেবে অন্য লোকেরা তাদের বোকা বলে বিত্বপ করে; কিন্তু যারা এখন বিত্বপ করে তারাই হলো বোকা ও স্বর্ষর।"

প্রশ্ন : এ কথার অর্থ কি? ভগবানকে কেন ক'রে প্রচার করা যায়?

উত্তর : সকল ধর্মই ভগবানকে গড়েছে মানুষেরই ছাঁচে, কেবল আকারে অনেকটা বড়ো ক'রে, কিন্তু তলে তলে তার মধ্যে মানুষেরই গুণগুলিকে আরোপ করেছে। তাই মানুষে শত্রুতা করলে তার মধ্যে যেমন ব্যবহার করা হয়, ভগবানের বেরাঙেও তাই করা হয়। কোনো কোনো দেশের ধর্মে তাদের যে পূজা সেবতা থাকে তার কাছে প্রার্থনা নতুন না হলে সেই সেবতাকে তারা তুলে নবীর জলে ফেলে দেয়।

প্রশ্ন : কিন্তু সেই সব "সেবতা" কি মানুষেরই ইচ্ছানুসৃত পড়া, তাদের প্রকৃত অস্তিত্ব নেই?

উত্তর : সেই সব সেবতার বাহ্য নৃতি বেবনই হোক (যাকে আমরা মৃধা ক'রে "পুতুল" বলি), এমন কি তা যদি ভগবত্ব বিকট নৃতিও হয়, তথাপি যে সেবতার নামে সেই নৃতি তিনি তার মধ্যে অবস্থান করেন। আর সেখানে কেউ না কেউ এমন থাকে, সে পরোহিত বা ভক্ত, পুজক বা সাধু সন্ন্যাসী বেই হোক,—যে সেই নৃতির ভিতরকার উপস্থিতিকে বা তার পক্ষিকে আগ্রহ করতে পারে (যা পুজকেরই কাজ)। আর এ কথাও বাস্তব ভাবে সত্য যে সেই উপস্থিতি তার মধ্যে থাকেই, আর নোকে জাকেই তাদের ভক্তি নিবেদন করে (প্রতিমা গড়ার কাঠ পাথর বা ছাত্তকে নয়)।

কিন্তু ইউরোপের মানুষদের মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ চেতনা একেবারেই নেই। তাদের কাছে বা বাহ্যদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে কেবল তাই আছে, তার অন্তরালে অন্য কিছু নেই,

সেদিক দিয়ে তাদের কোনো বোঝাই যাবে না। কিন্তু প্রকৃত দেবতার উপস্থিতি যে পূজ্য প্রতিমার মধ্যে পাক্কেট সে সময়ে আমি গান্ধাশী নিতে পারি।

প্রশ্ন : অনেকের এই বত যে শ্রীঅরবিন্দ এক নতুন রকমের ধর্ম পরিচয়তেন। আপনি কি তাই বলেন?

উত্তর : নিতান্ত সূর্য্যগাই ওকথা বলে, আর অর্থ তারা নিজেরাই জানে না। তাঁর লেখা বইগুলি পড়লেই বোঝা যায় যে তাঁর শিক্ষাকে ভিত্তি করে কোনো ধর্ম গড়ে তোলা অসম্ভব; প্রত্যেক রকমের প্রশ্ন ও প্রত্যেক সমস্যাকে নিয়ে তার সর্বাঙ্গিক দিয়ে বিচার করে তার ভিতরকার সত্যটিকে উদ্ঘাটিত ক'রে তিনি বলেছেন যে সত্যো পৌঁছতে চলে যাবার সকল রকমের ধারণা'ক চাড়িয়ে যেতে হবে, চিহ্নের সকল সীমা চাড়িয়ে উপরে উঠতে হবে।

সুতরাং তোমার প্রশ্নের দ্বিতীয় কথাটা বলাই উচিত হয়নি। থ্রু বারের বুলেটিনে (Bulletin) যদি পড়ে দেখতে তাহলে যখন প্রশ্নই করতে না।

যাই হোক, শ্রীঅরবিন্দের সময়ে আবার সেই কথা বলি, তিনি যা আশ্বাসের দিয়েছেন তা শিক্ষাও নয়, অনুশাসনও নয়, ধর্মতত্ত্বও নয়, তা স্বয়ং ভগবৎ ক্রিয়া তার উপর কোনো ধর্ম রচিত হয়না।

কিন্তু মানুষ এমন বাড়ুন যে কিছু একটা পেলেই তাকে ধর্ম রূপান্তরিত করতে ছোটে, তাদের সংকীর্ণ চিন্তা ও সীমাবদ্ধ ক্রিয়া আর মধ্যে খাপ খেয়ে যেতে পারে এমন কিছু এক বাঁধা মিনিসের কাঠামো তাদের চাইই। বতকণ না বলতে পারছে যে এটা ঠিক আর ওটা ভুল, ততকণ তাদের হস্তি নেই; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের লেখাগুলি যে পড়েছে এবং বুঝেছে সে জানতে পেরেছে যে যখন কোনো সিদ্ধান্ত তার থেকে করাই অসম্ভব। ধর্ম আপ যোগ কখনো এক দ্বারের মিনিস নয়। আর মানসিক সব কিছু গোড়াবি একেবারে ত্যাগ করলে তবেই বিশুদ্ধ আধ্যাতিক জীবন হতে পারে।

৬০

"নৃত্য বলে কিছু নেই। অমর যে সেই নৃত্য বরণ করতে পারে; নশ্বর যে তার জন্মও নাই নৃত্যও নাই।"

প্রশ্ন : তাহলে যারা নশ্বর তারা কি জীবন থেকে জীবনান্তরে তাদের দেহ-প্রাণ-মনের যারা অক্লান্ত অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে থাকে?

৬১

উত্তর : সে প্রশ্ন প্রত্যেকের বোঝাতেই ব্যতীত। সত্তার বিভিন্ন অংশে কার কতটা উন্নতি হয়েছে আর তাদের চৈতন্য-কেন্দ্রকে ঘিরে কেননভাবে তার স্থায়িত্ব ও পরিপতি এসেছে তারই উপর সব কিছু নির্ভর করে। সত্তা যত স্বপরিপত হতে থাকবে ততই তার চেতনার স্থায়িত্ব বাড়বে। সাধারণভাবে বলা যায় যে প্রত্যেকেই বর্তমান জীবনে তার পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতার কিছু ফলাফল সঙ্গে নিয়ে আসে, কিন্তু তার কোনো স্মৃতি থাকেনা। দুই একটি আনন্দিক ব্যতিক্রম ছাড়া, কেবল যখন তুমি আপন চৈতন্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবে তখনই পূর্ণ-চেতনা আসাতে বিগত জীবনগুলির স্মৃতিও কিরে পাবে, কারণ চৈতন্যের চেতনার মধ্যে সবই সংকীর্ণ হয়ে থাকে।

নতুবা যাদের চেতনা খুব সূক্ষ্মজ্ঞানশীল হয়েছে তাদের মধ্যেও পূর্বস্মৃতি ভেগে উঠতে পারে, কিন্তু তা প্রায়ই হয় অনিদিষ্ট এবং এদোনেলো, তার থেকে শুধু একটি অশ্লীল আভাস ছাড়া বিশেষ কিছু বলেনা। তবু যাত্রা উপস্থিত অবস্থাসিদ্ধির পিছনের দিকটা দেখতে পার, তারা জীবনের ঘটনা-পরম্পরা থেকে ত্রৈমিক অগ্রগতির এক রূপ যন্ত্রণা করে নিতে পারে।

৬১

“সীমা বলে কিছু নেই। বিনি অসীম তিনিই শুধু পারেন নিজের জন্য সীমার সৃষ্টি করতে। সীমার কোনো আরম্ভ বা শেষ থাকেনা, কারণ আরম্ভ ও শেষের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রগতির চরিত্র গোলটে তখন প্রকাশ হয়ে যায় যে তার পিছনে রয়েছে অসীমের অসীমতা।”

প্রশ্ন : সেই অসীমের সম্বন্ধে অনুভূতি কেমন ক’রে পেতে পারি ?

উত্তর : তার একমাত্র উপায় হলো সীমার চেতনা থেকে বেরিয়ে আসা। তারই জন্য যত রকমের যোগ-পদ্ধতি ও তার সাধনা চলে আসছে মনোবাস্তব কাল হতে। এ বিষয় নিয়ে লেখাও হয়েছে বিস্তর, কিন্তু কাজে করা হয়েছে কম; তার মধ্যেও খুব কম লোকে সীমার সত্য ছাড়িয়ে অসীমের সত্যে যেতে পেরেছে।

তথাপি শ্রীঅরবিন্দ নিখোঁজেন কেবল অসীমেরই প্রকৃত অস্তিত্বের কথা, যদিও আমাদের বাস্তব ও স্বাভাবিক বোধভঙ্গিতে বসে হয় যে কেবল সীমারই প্রকৃত অস্তিত্ব আছে।

৬২

“একজন বৃদ্ধ নিজের পাগলের মতো যা তা বলে যাচ্ছে দেখে ভাবনায় ভগবান কেন

৬৩

এমন স্বষ্টি করলেন ; কিন্তু পরে ভেবে দেখলেন যে ওটি হলো সত্য এবং জানেনই বিকৃত বুঝোশ ।”

*

প্রশ্ন : পাগলামি কেন্দ্র করে সত্যের বুঝোশ হতে পারে ?

উত্তর : শ্রীমদ্রবিশ্ব পাগলামি জিনিসটার প্রকৃত বর্ন নিরূপণ করলেন । বুঝোশ মানে এমন কিছু আদরণ বা ভিতরকার আসল বস্তুকে অশুভা করে দেয় ; আর যে বুঝোশ বিকৃত তা কেনল অশুভাই করে না, অধিকন্তু তার প্রকৃতিকে পূর্ণত্ব বহুনে দেয় । সুতরাং বুঝোশ পাগলামি এখানে সত্যকে অজ্ঞান ও করছে এবং বিকৃত ও করছে, সব কিছুর নুলের সত্যকে আসলো চেনাই যাচ্ছে না ।

*

প্রশ্ন : শ্রীমদ্রবিশ্ব কি বলতে চান যে সবই সত্য, অসত্য বা মিথ্যা বলে কিছু নেই ?

উত্তর : নিজক অসত্যের অস্তিত্ব নেই । বস্তুত তা অসত্ত্ব, কারণ সব কিছুই পিছনেই আছেন ভগবান । ভোমার এ প্রশ্নটিও সেই ধরনের, যাতে জিজ্ঞাসা করা হয় যে বিশ্বের ভিতরকার কোনো কিছু লোপ পায় কিনা । বিশ্ববস্তুর ধ্বংস, একধাপ মানে কি ? বাস্তব কথা ভেঙে দিয়ে, ধ্বংস আমরা কাকে বলি ? কোনো বস্তুর আকার প্রকার লুপ্ত হয়েযাওয়া,— বস্তুত সকল জিনিসেরই আকার প্রকার পরে পরে লুপ্ত হয়ে যায় । এমন কি একথাও বলা হয়েছে (এবং অনেক লেখাও হয়েছে) যে বিরোধী শক্তির পূর্ণত্ব তাদের আত্মপ্রবীণ নিবান-নুলের কারণে পাশ্চাতে থিয়ে দিয়া হয়ে উঠবে অথবা বিনষ্ট হয়ে । এই বিনষ্ট কথটির অর্থ কি ? তার আকৃতি বা চেতনার প্রকৃতি বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হতে পারে, কিন্তু “বস্তু” বা আছে তার অস্তিত্বের মধ্যে, সেই বস্তুটি যাবে কোথা ? তেমনি এই বিশ্ব হলো সেই পাশ্চাত্য চেতনা বা এখানে হয়েছে রূপান্তরিত বা আকৃতিসূত্র । সুতরাং যা নুলে সেই চিরন্তন বস্তু, তার অস্তিত্বের অনগ্রহ হতে কেন্দ্র করে ? বা অনন্ত ও পাশ্চাত্য, যার কোনো দিকে সীমা নেই, তার থেকে কোনো কিছু বাধ সেওয়া যাবে কেন্দ্র করে ? বাধ মিটে গেলে তা যাবে কোথা ? সেই পাশ্চাত্য অনন্ত তিনু যে আর কোথাও কিছু নেই ।

আর বর্নন আমরা বলি, “এখানে কেবল তাই আছে”, তাও হয় বোকার মতো একটা স্বান নির্দেশ । কারণ ওখান থেকে কিছু কি বাইরে কোথাও যানো যায় ?

যে অভিব্যক্তি বিদ্যমান তার থেকে আরো এক বিশ্ব উদ্ভূত হলো এমন কল্পনা করতে পারো, বিশ্বের পর বিশ্ব স্বষ্টি হচ্ছে তাও কল্পনা করতে পারো, পূর্ণবর্তী বিশ্বে বা ছিল পরবর্তী বিশ্বে তার চেয়ে নতুন কিছু হলো এও বলতে পারো । শুধু কিছু মিথ্যা ও অসত্যের

হাটনা স্থপাকানে এখন দেখা যাচ্ছে তা আর পরবর্তী জগতে আসে থাকবে না, তাও বলতে পারো ; এই ধরনের কথা বললে তবু যোঝা যায়, কিন্তু কিছু “ঋংস চণ্ডার” কথা বলবে কেমন করে ? যা ঋংস হবে তা যাবে কোথায় ? ঋংসের কথা যখন বলি তখন তাকে আকৃতির ঋংস বনেই বাপা কবি (তা বস্তুরও হতে পারে কিংবা চেতনারও হতে পারে, কিন্তু সে তার আকৃতিরই বিলোপ)। কিন্তু যার কোনো আকৃতি নেই তার বিলোপ হবে কেমন করে ?

স্রুতবাং নিষ্কার বিলোপ হয়েছে যখন বলি, তার অর্থ এই যে তা হয়ে গেল অতীতের ডাঙরে আগামী অভিব্যক্তিতে তা আর দেখা যাবে না । কিন্তু তাকে অস্তির হতে যাব নিতে পারো না ।

*

প্রশ্ন : তা কি থেকেই যাবে অতীতের মধ্যে ? তাও কি অস্তির ?

উত্তর : আবার সেখেনি যে চেতনার এমন এক অবস্থা আসে—যখন অস্তির ও অনস্তিরের বা নির্বাণের দুই অবস্থাকেই অভিক্রম করে তার চেয়েও উপরের অবস্থাতে গিয়ে পড়া যায় (কারণ অন্যতর মধ্যে অস্তির ও অনস্তির দুই অবস্থাই রয়েছে)—সেখানে গিয়ে দেখা যায় যে সকল বস্তুই অবস্থাই পাশাপাশি রয়েছে,—সেখানে থেকে চরিত্রো ধারণা করা যেতে পারে (জানিনা এমন বলা বোকানি হচ্ছে কিনা)। যে, অনস্তিরের মধ্যে যা কিছু ঘটছে তাকেই আমাদের চেতনা ঋংস বা বিলুপ্তি বলে বোঝ করছে ।

এমন কি সম্ভব ? ঠিক বলতে পারি না । ঋংস ভগবানকেই জিজ্ঞাসা করে দেখতে হয় । কিন্তু তিনি আবার এমন প্রশ্নের জবাবই দেন না । কেবল মুচকে হাসেন ।

এমন একটা সময় আসে যখন তুমি কোনো কথাই বলতে পারো না, যাই কেন বলতে যাও তাকেই নম্র চয় বোকানি কিংবা প্রায় তাই, তখন চুপ করে যাওয়াই সব চেয়ে ভাল কাজ । এই হলো রহস্য । শ্রীমদ্রবিশ্বের ঐ সব সূত্রাবলী পড়ে চঠাং তোমার ধারণা হবে যে তিনি এমন কোনো তিনিদের নাগাল পেয়েছেন যা তোমার চিন্তার মাথানের অনেকখানি উঁচুতে, তখন তুমি কি বলবে ?

(নীরব থেকে)

অবশ্য আবার যখন সাধারণ চেতনাকে ফিরবে তখন আবার অনেক কথাই বলবে ।

একটু ভাবাশা করার চলে যদি বলি (ভাবাশা সকল সময়েই করা যায়, কিন্তু লোকে সেটা না বুঝে গম্ভীরভাবে নিলেই তখন একটু ইতস্তত করতে হয়)—যদি বলি যে বুদ্ধিমান ব্যক্তির হিসাবী কথাবার্তার চেয়ে পাগলের কিংবা বোকা লোকের বেহিসাবী কথাবার্তা থেকে কখনো কখনো অনেক জিনিস শেখা যায়, তাহলে কথাটা নিতান্ত নিখা বলা হবে না । বুদ্ধিবৃত্তির উপদেশের চেয়ে অস্তরক-তুকিয়ে নীরস করে দেবার মতো জিনিস আর কিছু নেই ।

৬২

“বুসদিনেরা বলে যে ভগবানট সৰ চেয়ে বড়ো। তাঁ, তিনি এতই বড়ো যে দরকার হলে তিনি জোটাও হয়ে দুৰ্বলও হতে পারেন।”

৬৪

“ভগবান প্রায়ই তাঁর কাছে অকৃতকার্ণও হয়ে থাকেন; এও তাঁর অপরিণীত ভগবন্তারই একটা লক্ষণ।”

৬৫

“ভগবান অপরাহ্নের শক্তির অধিকারী বলেনই তিনি দুৰ্বলও হতে পারেন; তিনি অতি বিজ্ঞ এবং অপারবিদ্ধ বলেই অনায়াসে পাশে বসিনও হতে পারেন; তিনি শিশুভঙ্গিতে আনন্দময় বলেই নিরানন্দ বেদনার মধ্যেও আনন্দ পেতে পারেন; তাঁর প্রজা অপরিমিত বলেই অজ্ঞতাকেও তিনি স্থান দিতে পারেন।”

প্রশ্ন : ভগবানের দুৰ্বল চরার দরকার হবে কেন ?

উত্তর : শ্রীঅরবিন্দ এমন কথা বলেন নি যে ভগবানের দুৰ্বল চরার দরকার আছে। তিনি বলেছেন যে সবপ্রভাবে যদি দেশ ভায়ে দেশে যে শক্তির দীনা সব দিক থেকে সেবার জন্য শক্তির সঙ্গে অশক্তির ক্রিয়াকেও দেখানো হতে পারে। তাই তিনি একটু হেঁয়ালি করে বলেছেন যে ভগবান যেহেতু সর্বশক্তিস্থান, তাই তিনি তাঁর অসীম শক্তির জোরে দুৰ্বলও হতে পারেন, যদি তাঁর ইচ্ছা হয়।

অমন ভাবের কথাটা তিনি বলেছেন নৈতিক আত্মপর্যায়ীদের চোখ ফুটিয়ে দেবার জন্য, যারা বলে যে ভগবান কেবল সঙ্গুণেরই আধার, সঙ্গুণের রাস্তা চেড়ে তিনি অন্য কোনো রাস্তার চলতেই পারেন না।

যাকে আনন্দের বলি শক্তিসত্তা আর যাকে দুৰ্বলতা, দুইই হলো প্রকৃত ভগবৎ-সত্যের অপলাপ, কারণ সেই সত্তা সকল রকম অভিযান্ত্রিকই পিছনে লুকিয়ে আছে।

প্রশ্ন : ভগবান কি প্রকৃতই দুৰ্বল হয়ে পরাভব ও বার্ষতা বেনে নেন ? কিংবা তাও এক দীনা রাত ?

উত্তর : কথাটা নোটাই এ ধরনের নয়। গতানুগতিক ভাবে পাশ্চাত্যের লোকেরা বলেন উল্টো অর্থে দেখে, এও হলো সেই ধরনের কথা। “জীবৎ সকল কিছুই যে একবার ভগবান, এটা কিছুতেই পাশ্চাত্যের মন বাস্তব ও প্রাপ্যভাব ভাবে নিতে পারে না।

তারা খ্রীষ্টান ধর্মের মতটাকেই পুরোপুরি ভাবে ধরে থেকে বলেন যে ভগবান হলেন হৃষ্টকর্তা—অর্থাৎ এদিকে বইল তাঁর হৃষ্ট আর ওদিকে তিনি বইলেন শূণ্য ভগবান হয়ে। কথারা বলেন তলিয়ে ডেবে বেশ তখন এক্সপ ধারণা তোনরা পরিত্যাগ করো, কিন্তু তবু তো তোনাদের ভিতরে ভিতরে বোধ এক অনুভবের মধ্যে গোট। থেকেই যায়। তাই তোমরা স্বতঃই নিঃসংশয়ের প্রবৃত্তি ও অবচেতনতা থেকে ভগবানের উপর এটিই আশ্রয় নক্সো যে তিনি এক তাঁর কাছগুলি চলে সব চেয়ে ভালো ও সব চেয়ে সুন্দর ; আর বিশেষ করে সেই সুন্দর ও কান্না জিনিষ চলে তোনাদ নিজেদের মনের ধারণা অনুযায়ী (প্রত্যেকেই আপন আপন চেতনা অনুযায়ী ভগবানের উপর গুণগুলি আরোপ করে, যার কাছে যে গুণি সব চেয়ে ভালো বোধ হয়)। তেমনি আবার সেইরূপ ধারণা অনুসারেই তোমরা স্বতঃই অস্বাক হয়ে যাও, বলেন শোনো যে তোনরা যেমন হওয়া চাও না কিংবা যেমন হওয়াকে সব চেয়ে ভালো মনে করো না, ভগবান তেমনও হতে পারেন।

এটা আমি ইচ্ছা করেই বলছি কতকটা শিশুদের মতো করে তাদের তরফ থেকে, যাতে তোনরা পদাঙ্গুলি জিনিষটা দেখতে পাও। কিন্তু কথারা খুবই বশার্ণ, কারণ আমি নিজের মধ্যেই এমন ভাব হওয়া বহুকাল পর্যন্ত লক্ষ্য করেছি, বাল্যকালের পরিবেশ ও শিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা আনারও অবচেতন ঐ ভাবেই গঠিত হয়েছিল। কিন্তু চেষ্টা করে তোনাদের ঐ সেহেরই মধ্যে এনে ফেলতে হবে এককের চেতনা, যা ভগবানের নিঃশেষ ও নির্বিশেষ একত্ব। নির্বিশেষ বলছি এই হিসাবে যে এমন কিছুই নেই যার দ্বান সেই এককের মধ্যে নেই, এমন কি যা আমাদের চোখে ধারণা থেকেই জাও পর্যন্ত।

শ্রীঅরবিন্দ ঐরূপ মনোভাবের বিরুদ্ধেই যখন কথা বলছেন, কারণ খ্রীষ্টান মতের দ্বিকা তাঁকেও নিতে হয়েছিল, তাঁকেও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল ; তারই ফল ঐ সূত্রাবলী, ভিতর থেকে পুনোদ্গমের মতো—ঐরূপ অবচেতন যাতে গঠিত না হয় তারই বিরুদ্ধে কিছু জোর করে বলবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা। এমন কথা লিখেছিলেন বলেই তোনরা এখন প্রশ্ন করছে, “ভগবান কেনন করে বৃষ্টি হতে পারেন ? কেনন করে নির্বোধ হতে পারেন ?” ইত্যাদি। কিন্তু ভগবান ছাড়া যে কোনো কিছুই হয় না। এমন কিছুই হতেই পারে না যা তাঁর বাইরে। আবার যেটা লেখছি কুৎসিৎ যার অস্বাক্ষরীয়, তাও তিনি হওয়াতে চেয়েছেন বলেই হয়েছে। তিনি ক্রমশ এমন জগৎ গড়ে আনছেন যেখানে এমন অভিব্যক্তি আর ঘটবে না, ওর চেয়ে অন্যরকম কিছু হবে। আবার যে সেগুলো পছন্দ করছি না বিরক্তির সঙ্গে চাইছি যে তা বস্তুত হোক, তাতেই বোধা যায় যে সেগুলি এক সময় অভিব্যক্তি ভিতর থেকে দূর হয়ে যাবে।

কিন্তু তথাপি সবই সেই তিনি, তিনি ছাড়া কিছু নেই, তিনি ছাড়া কিছুই অস্তিত্ব নেই। সর্ব অস্তিত্বের একমাত্র তিনি।

তোমাদের ঐরূপ প্রশ্ন করার মানেই এই যে তোমরা এখনও মনে ভাবছো কোনটা

ভগবানের আর কোনটা ত্রা নয়, অর্থাৎ ওটা তিনি আর এটা তিনি নয়। আমি এমন প্রশ্ন করলেই পারি না যে, “তিনি কেনন করে দুর্বল হতে পারেন?”

প্রশ্ন : তা বুঝি, কিন্তু সবাই বলে ভগবানের লীলার কথা ; তার অর্থ তাহলে এই ঠাণ্ডায় যে তিনি সমস্ত লীলার পিছনে থেকে সেই লীলা করছেন, অতএব নিজেকে তার মধ্যে জড়াচ্ছেন না, লীলার অভ্যস্তরে তিনি স্বয়ং নেই।

উত্তর : হাঁ হাঁ, তাও আছে, তিনি নিজেকে লীলা। লীলা মানেই স্বয়ং তিনি।

ভোমরা যখন ভগবানের কথা বলবে তখন মনে রাখবে যে তাঁর চেতনার বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে ; যখন বলি কিছু ভগবান তখন তার অর্থ হবে সকল অভিযান্ত্রিক জড়িয়ে তাঁর পরাংপর চেতনার অবস্থা, আর যখন বলি তাঁর লীলা তখন অর্থ হবে তাঁর মত কিছু বাস্তব অভিযান্ত্রিক অবস্থা। তখন তার অর্থ হবে সেই পরাংপর ভগবানই এখানে তাঁর লীলার মধ্যে নিজেকে দেখছেন, বিভিন্নরূপে প্রকট হয়ে নিজেকে উপভোগ করছেন—এই তাঁর বাস্তব যবার লীলা।

কিন্তু যে ভাষাতে এই কথাগুলি বলবার তা হচ্ছে অজ্ঞানের ভাষা। এই ভাষাতে বাই কেন বলি আর যেমন ভাবেই বলি, সবশেষেই হবে অজ্ঞানতার দ্বারের কথা। এই কারণেই বাঁটি সভাকে বাঁটি ভাবে ব্যক্ত করা কঠিন হয় ; তারও আবার ব্যাখ্যার প্রকার হয়, তার মধ্যে চুকে পড়ে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি, কিংবা বুঝিরে বলতে গিয়ে কথাটা অনেক বেশী লম্বা হয়ে পড়ে (সেই কারণেই অজ্ঞানের ভাষাকে সব দিক থেকে বাঁচিয়ে বলতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের লেখার লাইনগুলি অত লম্বা লম্বা হয়েছে)।

এমন কি আমাদের চিন্তার ধারাটাই ভুল হয়। যারা শ্রদ্ধাবান ও বিশ্বাসী তারা যখন ভগবানের কথা বলে (বিশেষত পাশ্চাত্যে), তখন মনে ভেবে নেয় যে তিনি স্বতন্ত্র প্রকার কিছু, যার মধ্যে নক্ষ বা দুর্বলতা বা অপূর্ণতা থাকতে পারে না—এবনি একটি স্বাভাবিক ভাবে গেলেই ভুল করা হয়। চিন্তাটা করা হয় অবচেতনের মধ্যে, সহজাত প্রবৃত্তির বলে। যেমন, তারা যখন বলে “পূর্ণতা”, তখন ধরে নেয় যে যা কিছু হৃদয় ও দ্বিবা ও পূর্ণনর ও অপূর্ণতায় ভাই একত্রিত করে একটা কিছু—কিন্তু সে তো দিক কথা নয়! পূর্ণতা মানে যার থেকে কোনো কিছুই বাপ রইল না। ভগবানের পূর্ণতা মানে তাঁর সমগ্রতা, যার মধ্যে কোনো জিনিসেরই অভাব নেই, যার থেকে কোনো কিছুই বাপ দেবার নেই। যদিও তা নীতিবাদীদের উদ্ভূত কথা হয়ে গেল। তারা বলবে যে ভগবানের পূর্ণতার মধ্যে নিবিশেষে কেবল ওগুলিই থাকবে।

কিন্তু প্রকৃত পূর্ণতা তাই যার মধ্যে সকল কিছুই অন্তর্ভুক্ত (না দুই হাতে একটি বৃত্ত রচনা করে দেখানো), এর বাইরে কোনো কিছুই নেই। কিছুমাত্রও তার থেকে বাপ

পড়া অসম্ভব, কারণ তার মধ্যে যার অংশ নেই এমন কিছুই অস্তিত্বই অসম্ভব। তার মধ্যে যা নেই তা কোলোখানেই নেই। আরো একটু বুঝিয়ে বলি—বিশুবৃষ্টি এমন হতে পারে যার মধ্যে সমস্ত কিছু নেই, কারণ বিশ্ব এক ব্রহ্মের অভিব্যক্তি মাত্র, তেমনি আরো বিভিন্ন ব্রহ্মের বিশ্ব রয়েছে। সুতরাং; আরার সেই কথাতেই কিংবদন্তি; এমন কিছু নেই যা পূর্ণের মধ্যে নেই।

সুতরাং পূর্ণের মধ্যে সব কিছুই ঘণাবধ ঘানে আছে, পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিক বজায় রেখে।

কিন্তু পূর্ণতার ধারণাও ভগবানের দিকে যাবার একটি দিক মাত্র, তেমনি তার আরো অসংখ্য দিক এবং দৃষ্টিকোণ এবং পথ রয়েছে—যেমন তাঁর ইচ্ছা, সত্য, বিগ্ৰহতা, পূর্ণতা, ঐক্য, অমরতা, চিরন্তনতা, অমিত্য, নীরবতা, শান্তি, অজিহ্বা, চেতনা—এর কোনো শেষ নেই; নিজের মধ্যে ঐকান্তিকতা থাকলে তুমি ওর কে-কোনো দিক ধরেই ভগবানের কাছে পৌঁছতে পারবে, আর পৌঁছলে সেখানে যে বাইরের পার্থক্য থাকলেও আসল জিনিসের স্পর্শটি হবে একই ব্রহ্মের। যেমন বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে তুমি নানা দিকের নানা বৈচিত্র্য দেখছ, কিন্তু যেমন সেই স্পর্শটি গেলে অনিন্দিত সমস্ত এক হয়ে গেল।

অর্থাৎ পূর্ণ ভগবানকে দেখতে হবে পূর্ণ বৃত্তের দৃষ্টিতে; অর্থাৎ তাঁর মধ্যে সবই আছে এবং সবই “পাকা চাই”—অর্থাৎ তা পূর্ণ স্বরূপ; এমন কি “তাঁর ইচ্ছা” এ কথাও বলা যাবে না, কারণ তাতে যোগ্য হবে “ইচ্ছা” জিনিসটি তাঁর ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো।

বলতে পারো যে তিনি তাই, তিনি যেমন হতে চান ঠিক তেমনই,—কিন্তু “হতে চান” বললেই কয়েক ধাপ নেবের আশা হলো! কেবল পূর্ণতার একটা ধারণা আনবার জন্যই ও-কথা বদলান।

তা ছাড়া ভগবানের পূর্ণতা বলার সঙ্গে সঙ্গে মেনে রাখতে হবে যে তিনি অনন্ত ও শাশ্বত, অর্থাৎ সবই আছে স্থান-কালের মধ্যে এবং সেই সঙ্গে স্থান-কালের বাইরে।

যেমন ধরো “বিগ্ৰহতা”; দিব্য বিগ্ৰহতা ও সাধারণ বিগ্ৰহতায় কি তফাৎ তাই নিয়ে অনেক আলোচনা করা যায়। দিব্য বিগ্ৰহতা হলো গভীর মতনের কথা, যেখানে সবজই দিব্য। আরার সেই জিনিসই একটু উপরে দেখা দিলে তা অনাস্রপ; কিন্তু যেখানে দিব্য বিগ্ৰহতা সেখানে ভগবান ছাড়া কিছুই নেই—শাশ্বতরূপে বিগ্ৰহ ভগবান। জিনিসটাকে এই ভাবেই দেখতে হবে।

৬৬

“পাপও এককালে যথাস্থানেই অবস্থিত ছিল, কিন্তু সেখানে থাকতে থাকতে এমন তার স্থানচ্যুতি হয়েছে; তা ছাড়া পাপ বলে অন্য কিছু নেই।”

৬৮

প্রশ্ন : কিন্তু মানুষের নিষ্ঠুরতা, তাও কি কথায় বোঝানো চলে ?

উত্তর : ঠিক বলেছে, আমার চোখের সামনে এই প্রশ্নটাই ভেঙ্গে উঠেছিল, তোমাদের নানারূপ প্রশ্ন শুনে শুনে এখন আমি আপনার থেকেই জানতে পারি।

নিষ্ঠুরতার কারণে হত্যা করা ? নিষ্ঠুরতার কারণে মানুষকে কষ্ট দেওয়া ? অথচ জাগ্রতগতাবস্থার জিনিস, সবই যখন তাই, কেবল বিকৃত অভিব্যক্তি। এর পিছনে কি আছে আসলো ?

শ্রীমদ্রবিশ্বের কাছে নিষ্ঠুরতা ব্যাঘ্রই বুঝাই ছিল, তথাপি তিনি বলতেন যে ও কোনো জীব্র আবেগের বিকার ; এমন কি প্রেমের বিকারও হতে পারে, যা কোনো নাথানাত্মিক রকম করতে চায় না, চুড়ান্ত কিছু চায়, সোচ্চার জাবে তা হতে না পারলে তখন ঐক্লপ ধাক্কা আকার নেয়।

আমিও তাই বুঝতাম যে নিষ্ঠুরতা ধর্মবিশ্বাসের মতো জিনিস, যা তীব্রতার অনুভূতির একটা চূড়ান্তে গড়ে উঠে, যোদ্ধা তনয়ের পুরু চামড়াকে ভেদ করে তবুই তার অনুভূতি বিনতে পারে, বেহেতু অতি তীব্র না হলে কোনো কিছু অনুভবই হয় না তনয়ের মধ্যে। নিষ্ঠুরতার হেতু ঐশ্বর্যেরই রয়েছে।

কিন্তু তথাপি ঐ প্রশ্ন অসীমসীমাই থেকে যায় “তাই বা কেন ? কেন ? কেন ?” একদম বিকৃতি এলো কেননা করে ? সোচ্চার জিনিস এমন করে দুহড়ে বেঁকে দাবান কারণ কি ? ওর পশ্চাতে আরো কত স্তরের বকনের অনুভূতি রয়েছে যার তীব্রতা এতই বেশী হতে পারে, যা আমাদের ধারণাসীমার বাইরে, কিন্তু এ জিনিস এমন ভয়াবহ হয় কেন ?” সূত্রটি যখন পড়ি, এ প্রশ্ন তখনই আমার মনে জেগেছিল।

পাপের অনুভূতি কেননা হয় তা আমি জানি না, কখনই বোধ করিনি মূলতঃ পাপ জিনিসটাকে বনে কবেছি মানুষের ধারণাতে যতদূর পর্যন্ত বীভৎসতা আসতে পারে সেইরকম কিছু,—পাপের সঙ্গে কখনই আমার পরিচয় হয়নি ; স্তম্ভাঃ শ্রীমদ্রবিশ্বের সঙ্গে আমিও সম্পূর্ণ এ মত যে পাপ বলে কিছু নেই। এ কথা বুঝলাম, কিন্তু.....

নিষ্ঠুরতা প্রকৃতিক বলা যায় “পাপ”, কিন্তু তা যে তীব্রতায় অনুভূত হতে পারে আমাদের গ্রহণের জন্য একরূপ বিকৃতি, এইরূপ ব্যাখ্যা করা ঠিক। নিষ্ঠুর ব্যক্তিরে কার্যকলাপ আমি লক্ষ্য করে দেখছি, ওতে সেই সবর জালা একটা দৃষ্টি পায় ; ঐক্লপ হৃদয়ের তীব্রতা আনাই তার হেতু ; তাই বিকৃতির অবস্থাটাই বিস্ময় হয়ে ওঠে।

আর ঐ মূল অর্থ থেকে দানচ্যুতি দ্বারা কথা, তাও আমি জানতে পেরেছিলাম আমার ছোট্টো বেলোডেই। পরে আমি তার বিংশ ব্যাখ্যা ওনলান এক ওরোদের কাছে যিনি আমাকে জ্যোতিষ্মা (occultism) শিখিয়েছিলেন। তাঁর জানা স্মৃতিতেই এই কথা বলে যে পরে পরে অনেক বিশ্বের স্মৃতি হয়েছে এবং একে একে তা বিনীত হয়ে গেছে ; প্রত্যেকটিই

সেখা দিয়েছিল ভগবানের অভিযান্ত্রিক এক এক দিক নিয়ে এবং প্রত্যেক দিকই তাঁর মধ্যেই তা বিনীত হয়েছিল (প্রত্যেকটিরই সংখ্যা বর্ণনা করে তিনি স্বাভাবিক বৃত্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে কোন ব্যারে কোন বক্তনের অভিযান্ত্রিক সেখা দিয়েছিল, সেগুলি আরি নির্দেশও তেবেছিলেন, কিন্তু এখন কোথায় হারিয়ে ফেলেছি)। তিনি নির্দিষ্ট করে আরো বলেছিলেন যে এবারকার বিশ্ব হলো অসংখ্য সংখ্যার (ঠিক কোন সংখ্যা তাও এখন বলে নেই)। কিন্তু অতঃপর এ বিশ্ব আর সম্যক হতে না, অকুরাণ সত্ত্বতির ভিত্তি দিয়ে উত্তরোত্তর এগিয়েই যেতে থাকবে। এ বিশ্ব এমন এক স্থিতির অবস্থার পৌঁছেছে যা একভাবে স্থায়ী নয় কিন্তু নিত্য প্রগতিশীল, অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিস তার স্বভাব পেয়ে যাচ্ছে ; প্রত্যেক স্মরণ ও ক্রিয়া তার স্বাধীন স্বাভাবিক করে ; নীচের দিকেও যত নামবে তত দেখাবে সেখানেও প্রকৃতি এবং ক্রিয়া সবত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলছে।

একথা আবারও বলে দিয়েছিল, এবং শ্রীঅরবিন্দও পরে তাই বললেন যে মন বলে কিছু নেই ; কেবল অনেক জিনিস তার স্বাধীনভাবে নেই, কেবল স্বাভাবিক নয় কিন্তু কালেও নেই। সকল বস্তু জগৎ ও প্রচলনক্রমের বিশেষ স্বাভাবিক নির্দিষ্ট স্থান আছে। স্বাভাবিক অস্তিত্বই থেকে অতিক্রম পর্বত সব কিছুই আপন আপন স্থান পাবে, তখন সব কিছুকে মিলিয়ে ভগবানের উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটতে থাকবে, তখন আর নতুন করে বিশ্বসৃষ্টিই হলো প্রলয়ের দরকার হবে না। এই সত্যকে ভিত্তি করেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে এই বিশ্বেই দিব্যের পূর্ণ অভিযান্ত্রিক ঘটবে—যাকে তিনি বলেছেন অভিযান্ত্রিক। বর্তমান স্বর্গের মূলে আছে সামঞ্জস্য ও স্থিতি, তাই এরই স্বাভাবিক পূর্ণতার উপলব্ধি হতে পারবে।

প্রশ্ন : এখানে একটি কথা জানতে চাই যে সেই অভিযান্ত্রিক শক্তি আবির্ভূত হলে প্রথমে এখানকার কোন কোন জিনিসকে অপ্রয়োজনীয় করে সরিয়ে দেবে বা তার চেষ্টা করবে, যাতে বাকী সব কিছু সত্ত্বিপূর্ণভাবে স্বাধীনভাবে চলতে পারে ?

উত্তর : সরিয়ে দেবে কেন ? কোনো কিছুকে তা সরিয়ে যাবেই বা কেন ? শ্রীঅরবিন্দ কেবল এই কথাই বলেছেন যে সবসময় স্বাধীনভাবে স্থান পাবে, এই পর্বত।

একটা জিনিস অবশ্য নিশ্চয়ই থাকবে না, তা এই বিকৃতি অর্থাৎ সত্যের মধ্যে চাপা দেওয়া নিষাধ পদার্থ-স্টা মুখোশ, কার্য বা কিছু আত্মা এখন হতে সেখি তার জন্য একমাত্র ওটাই নষ্ট। সে পদার্থ হতে গেলেই তখন সব কিছুকেই সম্পূর্ণ অন্যরকম দেখাবে ; আবার স্বাভাবিক এই বর্তমান চেতনা থেকে বেরিয়ে যাই তখন কোন কোন ঠিক সেইরকম দেখাবে। এই চেতনা থেকে বেরিয়ে স্বাভাবিক সত্য চেতনাতে কেউ প্রবেশ করে তখন এমন এক স্থানে সে গিয়ে পৌঁছতে যাচ্ছে হতে সে ভাবে যে যুগ্ম স্বাভাবিক সত্য প্রকৃতি জিনিসগুলো এখানে রয়েছে কেমন করে ; চেতনার এপার থেকে ওপারে গেলেই তখন ওজনোর কোনো অর্থ নেই

পাওয়া যায় না। তেমন অনুভূতির অবস্থা এলে তখন এই অগত্যাতে অবান্তর বাহা বলে বোধ হতে থাকে,—কিন্তু শ্রীঅবদিলের মূল বক্তব্য এই যে অতিমানস চেতনায় যেতে চলে তাও বোধ করবার প্রয়োজন নেই,—বস্তুত ভগৎ অসামান্য মন, ওর নিখ্যাতিই অসামান্য। সেই বিখ্যাতকে হাক দিয়ে দেখলে অগত্যা নিজস্ব দাস্তবত্তা করেছে।

অতিমানস চেতনা এলে তার প্রথম অভিব্যক্তি চলে ব্যক্তির মধ্যে, কারণ ব্যক্তির মাধ্যমেই তার কাজ শুরু হবে।*

* Bulletin of S. A. I. C. E.—অনুবাদক—পঞ্চমি ভট্টাচার্য

"One who has given himself to the Divine has no longer any other duty than to make that consecration more and more perfect."

The Mother

For all sorts of glasses for Buildings, Furniture and Cars,
please send your enquiry to:—

B. K. SHAW & CO.,

P - 20, Radha Bazar Street,
CALCUTTA - 1

Cable: BIKEGLAS

Phone: 225613



Regarding : —

TEA CHEST
FERTILISER
TEA GARDEN STORES
FELSPAR & QUARTZ

Enquire to : —

EASTERN SALES PRIVATE Ltd.

35, CHITTARANJAN AVENUE,

CALCUTTA — 12

PHONE 23-5824



প্রসিদ্ধার তৈল



১, ২, ৪ ও ১৬০০ কে. জি. টিন
এবং ৪০ কে. জি. লীল করা
ড্রামে পাওয়া যায়।

এখন হইতে ৫০০ গ্রাম লীল
করা বোতলেও পাওয়া যায়।

গণেশ প্রসিদ্ধার তৈল

শ্রী অয়েল মিলস্ · আলীগড়।

শ্রীঅন্নবিন্দু মন্দির বস্তিকা

শ্রীঅন্নবিন্দুর আদর্শ ও ল্পন বিবরণ ত্রৈমাসিক পত্রিকা

শ্রীঅন্নবিন্দু মন্দির প্রকাশনা

হাস্যরস ও সামাজিক অভিযুক্তি	শ্রীঅন্নবিন্দু	৩০
শ্রীঅন্নবিন্দুর বোধ ও বর্তমান অবস্থা	শ্রীঅন্নবিন্দু	২১
কবির নীতি	শ্রীঅন্নবিন্দু	২০
রবীন্দ্রনাথ (হরীশ্চন্দ্রের উপলক্ষ্যে)		
পরিচিতি ও সংগ্রহ		
সাধনার জীবন	শ্রীঅন্নবিন্দু	২১

: শ্রীঅন্নবিন্দু :

: শ্রীমা :

বিবিধ রচনা

উত্তম রহস্য

মূল বাংলায় লেখা পুরাতন বাতাপত্র

[একাদশ নটিকা]

হইতে সংগৃহীত ও প্রথম মুদ্রিত

স্বাভাবিক, লেখক, চিত্রকর, বৈজ্ঞানিক,

মূল্য ১১

ব্যবসায়ী ও ব্যাবসায়ী হ'লনের হইতে

ভারতের নবজন্ম ১৪০

আত্ম-কাহিনী ও তাঁর উপলক্ষ্যে

কর্মবোধ ১৪০

মূল্য ১১

ভগবানের কথ ১১

ছোট্ট গল্প ১৪০

স্বভাবের কথিকা ২১

পুরাতন লেখা ১৪০

শ্রীঅন্নবিন্দুর পত্র ১১

শিক্ষা ১৪০

পত্রাবলী ১৪০

যারের আলো ২৪০

বিদ্যা-জীবন (দুই খণ্ডে সমাপ্ত) ১৪ ৫০ ৮১ ; ২৪ ৫০ ১৪

1. Loving Homage Rs. 10/-
2. The Golden Book of The Mother „ 100/- (De Luxe Edn.)
60/- (Ord. Edn.)